দিনগুলি মোর

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

দিনগুলি মোর

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

এই বই আমার অসুস্থতার মধ্যে লেখা। শ্রুতিলিখনের কাজ সুদীপ্তা মিত্র করেছেন। সবটাই শুনে লেখা। ডঃ বেলা দত্তগুপ্ত পাণ্ডুলিপি পড়ে আমার দু'একটি ত্রুটি সংশোধন করেছেন। শ্রীশোভন বসু পাণ্ডুলিপি থেকে যত্ন করে প্রেসকপি করে দিয়েছেন। বইয়ের নামকরণ করেছেন শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রেসের জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরি করাবর সময়ে তাঁর কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার তখন সাত-আট মাস বয়স। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার শেষ হয়ে এসেছে। দুই ভাঙা বাংলা আবার এক হয়েছে। কিন্তু দেশের মাটি থেকে উত্তাপ তখনও যায়নি। কলকাতা থেকে রংপুর আসছিলাম। রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমাদের বাড়ি মাইলখানেক দূরে। বড় রাস্তা থেকে ডানদিকে মোড় নিয়ে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তা। মোড়ের একটু পরে বোসমশায়দের বাড়ি, তারপর মজুমদারদের। আর একটু গেলে আমাদের বাড়ি। এই অঞ্চলকে বলে গুপ্তপাড়া। বড় রাস্তা থেকে গুপ্তপাড়ায় ঢুকবার সময় মা'র চোখে পড়ল আমার গলায় একটি বিদেশী জিনিস ঝুলছে। বাচ্চাদের গলায় তখন একটি 'বিব্' ব্যবহার করা হত। ভাল জিনিসমাত্রই সে সময় বিলিতি। মা'র মনে হল আমাদের বাড়িতেও তো স্বদেশী উত্তেজনা কম নয়। আমার গলা থেকে 'বিব্'টি খুলতে চেষ্টা করলেন। সহজে খুলছে না দেখে সেটাকে গলা থেকে ছিঁড়ে গাড়ির জানালা দিয়ে ফেলে দেওয়া হল। আমি চেঁচাতে লাগলাম। এইভাবে আমার গৃহপ্রবেশ হল।

এই গল্প আমি আমার মা'র মুখে অনেকবার শুনেছি। অল্প বয়সের কোনো কোনো ঘটনা শ্রুতি কিংবা স্মৃতি মিশিয়ে হয়। উপরের অবশ্য সবটাই শ্রুতি। অত পুরনো কথা কারুর মনে থাকতে পারে না। তবে কোনো-কোনো ঘটনার আবছায়া মনে থাকে। সেই গল্প বহুলোকের মুখে শুনতে শুনতে তার চেহারা বদল হয়। আর একটি ঘটনা। আমার যখন খুব অল্প বয়স তখন পদ্মার উপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ তৈরি হয়নি। কলকাতা থেকে রংপুর আসতে হলে স্টিমারে খুব ভোরে পদ্মা পার হতে হত। সে আমলে স্টিমারে ভাল চায়ের ব্যবস্থা ছিল। আমি একবার স্টিমারে উঠেই চায়ের পেয়ালার শব্দ শুনে এবং ওয়েটারদের ধোপদুরস্ত পোশাক দেখে খুশি হয়ে একটি শব্দ উচ্চারণ করেছিলাম, 'চা'। সেই বোধহয় মানবভাষায় আমার প্রথম শব্দের উচ্চারণ।

এই কাহিনী যখন আরম্ভ হয়েছে তখন আমার পাঁচ-ছ' বছর বয়স। তারপর থেকে বালক বয়সের কথা আমার মোটামুটি মনে আছে। পাঁচ বছর বয়স কিংবা তার আগে থেকে রংপুরে আমার ঠাকুর্দা এবং ঠাকুমার কাছে বড় হয়েছি। বাবাকে কাজের জন্য কলকাতায় থাকতে হত। কখনও কখনও আমিও কলকাতায় এসেছি কিন্তু তখনকার কথা টুকরো টুকরো ছাড়া কিচ্ছু মনে নেই। মনে পড়ে বাবা যখন রংপুরে আসতেন, খুব ভোরে আমাকে বিছানা থেকে তুলে

দিতেন। শোবার ঘর থেকে একটু দূরে বড় হরীতকী গাছ এবং তার কাছে দুটি বড় বড় কুলগাছ ঝাঁকড়া হয়ে আছে। তার তলায় অনেক রকম পাখি এসে জড়ো হত। দোয়েল, টুনটুনি, শালিখ, চড়াই, বাবা তাদের চিনিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। একটু বড় হলে যখন একটু একটু লিখতে পড়তে পারি তখন আমাকে 'সন্দেশ'-এর গ্রাহক করে দেওয়া হল। বোধহয় সেটা সন্দেশের দ্বিতীয় বছর। 'গুপী গায়েন ও বাঘা বায়েন' ধারাবাহিক বের হচ্ছে। প্রত্যেক সংখ্যায় লেখার শেষে পরের লাইনে ছাপা হত 'ক্রমশ'। প্রথম প্রথম ক্রমশর মানে বুঝতে পারতাম না। মনে হত আগের লাইনের কোনো শব্দ পরের লাইনে চলে এসেছে। অল্প বয়সে আর দুটি বই হাতে পেয়েছিলাম, একটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বটতলায় ছাপা। কাঠের ব্লকে ছাপা অনেকগুলি যুদ্ধের ছবি। তখনকার যা নিয়ম ছিল—চার কোনায় চারটি স্ক্রুপ দিয়ে ব্লক আটকাতে হত। ব্লক ছাপবার সময় সেই চারটি স্ক্রুয়ের ছবিও উঠত। তাইতে আমার কাছে ছবিগুলির মনোহারিত্ব বেড়েছে। আর একটি বই হাতে এসেছিল কিছুদিন পরে। কাশীরাম দাসের মহাভারত, একটু পরিমার্জিত সংস্করণ।

প্রথম লিখতে শিখে ভাঙা ভাঙা অক্ষরে বাবাকে চিঠি লিখতাম। পড়তে শিখবার পরে মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে বই আসত। সব বই তখন ভাল করে বুঝতে পারতাম না। পরে অনেকদিন পর্যন্ত জমিয়ে রেখে পড়েছি। রংপুরে তখন পুজোর আগে ছোট ছেলেদের নিয়ম করে জ্বরে ভোগার রীতি ছিল। জ্বরের মধ্যে কোনো মাসিক পত্রিকায় একটি ছবি দেখেছিলাম জয়দেব ও পদ্মাবতীর। জয়দেব স্নান করে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। পদ্মাবতী লাল শাড়ি পরে থালায় ভাত-ব্যঞ্জন নিয়ে খেতে বসেছেন। অর্থাৎ গীতগোবিন্দর একটি বিখ্যাত শ্লোক রচনার কাহিনী। ছবিটিতে রংয়ের প্রাচুর্য আমার মন হরণ করেছিল। ছেলেবেলায় যে বিশেষ আব্দার করেছি মনে পড়ে না, কিন্তু খুব জ্বরের মধ্যে মা'কে বলেছিলাম গল্পটা বল। মা জয়দেবের গল্প বলেছিলেন। সে গল্প এখনও ভাসা ভাসা মনে আছে।

আরও দু'এক বছর গেল। তখন আমি সাবালক হয়েছি। বাড়ির আশেপাশে নিজেই ঘুরে বেড়াই। আমার প্রিয় বেড়াবার জায়গা ছিল বাড়ি থেকে একটু দূরে অনেকটা জায়গা জুড়ে খানিকটা নিচু জমি। বর্ষার সময় তাতে জল জমে থাকে, তারপর জল কমে যায়। রংপুরের মাটি কখনোই একেবারে শুকনো হতে জানে না।

উত্তর বাংলার রংপুর শহর। শহরের উত্তরে অনেকটা নিচু জমি খালি পড়ে আছে। তার নাম মৌলাবক্স মিঞার মাঠ। বর্ষার সময় সেখানে জল জমে থাকত বলে খানিকটা জায়গার উপর একটি কাঠের সাঁকো। কেউ কেউ বলত মৌলাবক্স মিঞার ব্রিজ। সেখানে প্রায় সাত বছর বয়সের একটি ছেলে অশোকচন্দ্র গুপ্ত রেলিং ধরে নীচের দিকে তাকিয়ে ছিল। এইটি গুপ্তপাড়ার ছেলেদের বেড়াতে যাবার প্রিয় জায়গা। নীচে জল, কোথাও কোথাও জলের তলায় মাটি দেখা যাচ্ছে, যেখানে জল শেষ হয়েছে সেখানে মাটির ধারে ছোট ছোট গাছ, তাতে হলদে ফুল। সন্ধ্যা হবার আগেই ছেলেটি বাড়ির দিকে রওনা হল। বাড়ি খুব

বেশি দূরে নয়। কয়েক মিনিট হাঁটলেই ডাইনে নগেন্দ্রনাথ সেন থাকেন, সে বাড়ির এক ছেলের নাম গোপালচন্দ্র সেন। আর দু'পা গেলে সত্যেন্দ্রনাথ সেনেদের বাড়ি। পরে এই দু'জনের নাম এত পরিচিত হবে তখন জানবার কোনো উপায় ছিল না। আরো মিনিট তিনেক হেঁটে যেখানে গুপ্তপাড়ার রাস্তা অর্ধচন্দ্রের মত বেঁকে গিয়েছে সেখানে রাস্তা পার হয়ে আমাদের বাড়ি ঢুকলাম। তখনকার দিনে বর্ধিষ্ণু লোকের বাড়ি মফঃস্বলে যেমন হত সেইরকম বাইরের দিকে তিনটি বড় বড় ঘর, উপরে টিন কিংবা খড়ের ছাউনি। একটি বাবার ব্যবহারের জন্য, কিন্তু বাবা কলকাতায় থাকতেন, সেটি বন্ধ থাকত। আর একটি সেরেস্তা। সেখানে লোকনাথ মুহুরির সিগারেটের গন্ধ। সিগারেটের বাক্সের রাংতার লোভে আমরা মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম। আর একটি বড় ঘরে আমার ঠাকুর্দা, উমেশচন্দ্র গুপ্ত, মক্কেলদের নিয়ে বসতেন। এই তিনটি ঘর পেরিয়ে পেটানো সরু সুরকির রাস্তা দিয়ে বাড়ির ভিতরে যেতে হয়। বাড়িতে ঢুকতে প্রথমে তিনটি স্থলপদ্মর গাছ এবং বাগান ঠিক আমার ঠাকুর্দার বসবার ঘরের পিছনে। ভিতরের বাড়িতে উঠতে গেলে একটি নিচু খোলা বারান্দা, সেটি নানা কাজে ব্যবহার করা হত। তার একদিকে দুটি বাতাবী লেবুর গাছ। শরতের প্রথম থেকে সন্ধ্যাবেলা বাতাবী ফুলের গন্ধ বাড়ি ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যেত। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় আছে যে, যে ভ্রমর কুর্চিফুলের জন্য পদ্মফুলকে তুচ্ছ করেছে, রবীন্দ্রনাথ সেই ভ্রমরের দলে। আমিও সেই বাতাবী লেবুর ফুলের জন্য কুর্চি এবং পদ্ম দুই ফুলকে তুচ্ছ করতে রাজি আছি, কবিরা যাই বলুন না কেন। ছেলেবেলায় একথা নিশ্চয় তলিয়ে বুঝতাম না।

এই বারান্দা পার হয়ে আর একটি ঢাকা বারান্দা, সেটি পার হয়ে একটি ছোট ঘর। বারান্দার এককোনায় লণ্ঠন, টেবিলল্যাম্পের চিমনি পরিষ্কার হচ্ছে এবং তেল ভরা হচ্ছে রাত্রের জন্য। ছোট ঘরে ঢুকলাম, সে ঘরে দুটো টেবিল। বড় টেবিলে নৃপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী বলে আমাদের একজন আত্মীয়, তাঁকে সবাই সুটুদা বলে ডাকত, পড়তে বসবার উদ্যোগ করছিলেন। তিনি স্কুলের ফুটবল টিমের গোলকিপার ছিলেন, ছবি আঁকতে পারতেন। ছোট টেবিলটি আমার। আমি তার কিছুদিন আগে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। আমি সুটুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী পড়ছ ?' তিনি বললেন, 'আমি রচনা লিখছি।' বলে তিনি কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে লিখতে হয় ?' তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'আগে বড় হও, তারপর বুঝতে পারবে।' আমি পাশের টেবিলে বসে বই ঘাঁটতে আরম্ভ করেছি, টেবিলল্যাম্প হাতে করে আমাদের পুরাতন ভৃত্য হালখড়ি প্রবেশ করল এবং সেদিনের বাজারের হিসাব লিখাতে লাগল। হালখড়ি খুব বিশ্বাসী এবং কর্মঠ লোক ছিল কিন্তু বাজারের হিসাব কখনো মিলত না। প্রথমবার যে হিসাব দিল, তাতে দেখা গেল প্রায় পাঁচ পয়সা তার কাছ থেকে ফেরত আসার কথা। তখন হালখড়ি বলল, হিসেবে গলতি আছে। এই বলে বাড়ির ভিতরে গিয়ে এখন আমরা যাদের কাজের লোক বলি তাদের কারুর সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন হিসাব ঠিক করে নিল। দেখা গেল সে-ই আমাদের কাছে দশ পয়সা পাবে। হালখড়ি, তাকে আমরা হালখড়িদাদা বলতাম,

সোজাসুজি সুটুদাকে বলত, বাজারে আর ক'পয়সা থাকে, মাছেই যা দু'এক পয়সা থাকে, তা নিয়ে আবার কেন ! আমার ঠাকুর্দা মক্কেলের কথা ছাড়া কোনো কথায় কান দিতেন না, আর ঠাকুমা কোনো কারণে ক্রুদ্ধ না হলে এইসব বিষয়ে কোনো কথা বলতেন না। কাজেই হালখড়ি ও অন্য সবাই মনের সুখে ছিল।

একটু আগে বলেছি আমি কিছুদিন আগে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। স্কুলের কথা কিছু বলে নিই। এখন স্কুলে ভর্তি হওয়া খুব ঝামেলার ব্যাপার। শুধু ভাবী ছাত্রকে নয়, ছাত্রের পিতামাতাকেও নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, তবে পিতামহ-পিতামহীরা প্রায়ই তাদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকেন না, তাই তাঁরা এযাত্রায় বেঁচে যান। আমাদের সময় সমস্ত জিনিসটাই খুব নীরবে হত। কোনো কোনো বাড়িতে অবশ্য তার আগে হাতেখড়ির ব্যাপার ছিল। আমাদের বাড়িতে তাও ছিল না। বোধহয় কারুর মনে হল আমাকে স্কুলে দেওয়া দরকার। শহরে দুটি বড় স্কুল। ভাল স্কুলটি কিন্তু সরকারি স্কুল, রংপুর জেলা স্কুল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের পর সেখানে ভর্তির কথা ভাবাই যেত না। আমার বাবা সেখান থেকে এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন, অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের অনেক আগে। অন্য স্কুল হচ্ছে কৈলাসরঞ্জন হাই ইংলিশ স্কুল। তার মান অত ভাল ছিল না। যদিও সরকারি সাহায্য পাওয়া যেত তবুও সরকারি স্কুল নয়। যে বাড়িতে স্কুল বসত সেই বাড়িতে একসময় ন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, বাংলার প্রথম ন্যাশনাল স্কুল। আমার ঠাকুর্দা সেই স্কুলের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তখন অবশ্য এত সব কথা বুঝবার বয়স ছিল না। কিন্তু ভর্তি হবার সময় দুটি বিভ্রাট ঘটে গেল। প্রথমত, আমার নাম হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল। গিয়েছিলাম অশোকচন্দ্র গুপ্ত বলে, ফিরে এলাম প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত নামে। প্রতুলচন্দ্র এমন কিছু সুখশ্রাব্য নাম নয়, কিন্তু যিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর হয়তো মনে হল প্রতুলচন্দ্র নাম হলে বাবার নামের সঙ্গে মিল দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক, অশোক নাম তাঁর পছন্দ ছিল না। একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, রংপুরে দু'একজন আমাকে প্রতুল বলে ডাকতেন এবং আত্মীয়টি সেকথা মনে রেখে প্রতুল নামকেই আঁকড়ে ধরলেন। আমার নামকরণ করেছিলেন আমার মামা কিরণশঙ্কর রায়। শুনেছি তিনি পরে নামবদলের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এ আবার কী হল। অহিরাবণের পুত্র শ্রীমহীরাবণ ?' আমার বাংলা জন্মতারিখের সঙ্গে ইংরেজি তারিখের মিল হল না। জন্মতারিখ দোসরা মাঘ হিসাবে পনেরই জানুয়ারি হওয়া উচিত, ভুল করে লেখা হল দশই জানুয়ারি। অর্থাৎ জীবন থেকে পাঁচদিন চুরি গেল। আমাকে যে ক্লাসে ভর্তি করা হল, তখনকার দিনে সেটাকে বলা হত ক্লাস থ্রি। ইংরেজি কী বই পড়তাম কিছু কিছু মনে আছে। কলকাতার স্কুলে পড়ানো হত প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক অফ রিডিং কিংবা সেকেণ্ড বুক। রংপুরে ইংরাজি পাঠ আরম্ভ করেছি ক্রিং'স প্রাইমার, ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত, ফার্স্ট বুকের তুলনায় সহজপাঠ্য। সাহায্য না পেলেও হয়তো পড়া চলে। বাংলা কী পড়তাম মনে নেই, তবে বইটি গদ্য এবং পদ্যের একটি সঙ্কলন। অঙ্ক যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ। ভূগোল পড়তে হত, তার হলদে রঙের মলাটের কথা কেবল মনে আছে।

এই ভূগোলে বাংলা দেশের অনেক জায়গার নাম শিখতে পেরেছি। লেখক বোধহয় গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত। ইতিহাসের বইয়ের নাম মনে নেই। কিন্তু বাড়িতে দুটি ইতিহাসের ছোট বই ছিল, কোনো সময় আমার ঠাকুর্দা মা'র জন্য কিনেছিলেন। সেই বই দুটি সর্বদা আমার সঙ্গী ছিল। একটি বই ভারতবর্ষের ইতিহাস, লেখক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই খণ্ডে পাওয়া যেত। আর একটি, ঝরঝরে ভাষায় লেখা রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ভারতবর্ষের ইতিহাস। যুদ্ধের সময় বেরিয়েছিল বলে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি ছবি ছিল পঞ্চম জর্জের, ভারতীয় সৈনিকের পোশাকে। এই বই দুটি ঠিক ক্লাস থ্রি বা ফোরের পাঠ্য নয়, কিন্তু এই বই দুটির কাছে আমার অনেক ঋণ। তখনকার দিনে ট্রেনিং পাওয়া মাস্টারমশায় ছিলেন না বলে হয়তো আমাদের বেশি করে শিখবার মানা ছিল না। ক্লাস ফোরে কিছু কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি ইত্যাদি শেখানো হয়েছিল। অনেক দিন পর্যন্ত সে সব আমার কাজে লেগেছিল।

কৈলাসরঞ্জন স্কুলের মাস্টারমশায়রা, যাঁদের কাছে পড়েছি, তাঁদের সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। তখন হেডমাস্টার ছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র বাগচী। খুব ভাল লোক। গান্ধীজির আন্দোলনে যোগ দিয়ে চাকরি ছেড়েছিলেন এবং পরে কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে চাকরি করতেন। তাঁর কাছে আমরা পড়িনি, তবে কখনও কখনও শেষ পিরিয়ডে তিনি ক্লাসে আসতেন হাতে একটা ইংরেজি চটি বই নিয়ে। বলতেন, স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের আপিস থেকে এই বই পাঠিয়ে দিয়েছে, তোমাদের এর থেকে গল্প বলবার জন্য। কী গল্প মনে নেই, কিন্তু একথা মনে আছে যে গল্পগুলো এত কাঁচা যে শোনবার যোগ্য নয়। সরকারি দপ্তর হলেই সব সময় তার বিবেচনা অদ্ভুত রকমের হয়। এর বদলে 'মুকুল', পুরনো 'সখা ও সাথী' এবং তখন সদ্য বেরিয়েছে 'সন্দেশ' পত্রিকা পড়ে শোনালে অনেক উপকার হত। রামায়ণ মহাভারতের কথা তুললাম না। কারণ সে সময়, যত খারাপ ছেলেই হোক, রামায়ণ মহাভারতের গল্প তাদের জানা ছিল। আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ছিলেন নগেন্দ্রনাথ সেন। তিনি খুব আশ্চর্য লোক ছিলেন, আমরা তাঁকে জ্যাঠামশাই বলতাম। তার কারণ শিশু বয়স থেকে আমার ঠাকুমা তাঁকে মানুষ করেছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত জানতাম না যে, তিনি আমার আসল জ্যাঠামশাই নন। তাঁর অনেক রকম কাজ করবার ক্ষমতা ছিল। একবার তাঁর মনে হয়েছিল ডাক্তারি ওষুধের দাম অনেক বেশি, গরিবের পক্ষে কেনা সম্ভব নয় এবং বাজারে কবিরাজী ওষুধেও ভেজাল থাকে। নিজে কিছু কবিরাজী জানতেন, সংস্কৃতও জানতেন। বড় রাস্তার উপরে কবিরাজী ওষুধের দোকান খুললেন, নিজে ওষুধ তৈরি করতেন, নাম দিয়েছিলেন চিপ ফার্মাসি। মাঝে মাঝে গিয়ে পড়লে কখনও কখনও চ্যবনপ্রাশ খাওয়াতেন, তার স্বাদ এখনও আমার জিভে লেগে আছে। পরিণত বয়সে একবার আমাদের সঙ্গে পুজোর ছুটিতে রাঁচি গিয়েছিলেন। সে অনেক দিনের কথা, আমার তখন বছর দশেক বয়স। তখন দেখেছি কাসেলের ডিকসনারির সাহায্য নিয়ে জার্মান পড়বার চেষ্টা করছেন। অল্প বয়সেই আমার মনে হয়েছে সংসারের জন্য তাঁকে অনেক খাটতে হত। খুব বেশিদিন বাঁচেননি। আর একজন মাস্টারমশায় ছিলেন বঙ্কুবিহারী গুপ্ত, তাঁকেও

জ্যাঠামশাই বলতাম, কারণ একই। যাঁদের কাছে পড়েছি তাঁদের মধ্যে শশীবাবু বলে একজন মাস্টারমশায়ের কথা মনে আছে। ভূগোল পড়াতেন। দুটি কারণে তাঁকে ভোলা আমার সম্ভব হয়নি। একটি কারণ যে, তাঁর হাতে সব সময় একটা ছুরি থাকত, সেটা সরু হতে হতে মুখের কাছটায় প্রায় ছুঁচের মত সরু হয়ে গিয়েছিল। কী করে হল, এনিয়ে আমরা ক্লাসে অনেক আলোচনা করেছি, কিন্তু আজও সদুত্তর পাইনি। তখনকার দিনে গ্রীষ্মের সময় কাঁচা আম খাবার জন্য প্রায় সব ছেলের পকেটে ভোঁতা ছুরি, ফুটো করা শামুকের খোলা ইত্যাদি অস্ত্র থাকত। মনে হত শশীবাবুর মত অস্ত্র পেলে সব আমগাছের ফল নিঃশেষ করে ফেলা যেত। শশীবাবুর হাতে একটি বেত থাকত, সেটি বোধহয় টেবিলের উপর আছড়াতে গিয়ে ফেটে গিয়েছিল। কাজেই সুতো দিয়ে বেঁধে রাখা হত। এই বেত দিয়ে তিনি ম্যাপ পয়েন্টটিং-এর কাজ করতেন। আস্ফালন করতেন, কিন্তু কারুর পিঠে পড়তে দেখিনি। তাঁকে আরও একটি কারণে মনে আছে, এখন মার্বেল খেলা অনেক কমে গিয়েছে, তখন সর্বত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু কলকাতায় চলিত কয়েকটি ভাষা, যেমন 'পিলিয়ে গাব্বু' কিংবা 'নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু' এই সব শব্দ উত্তরবঙ্গে শোনা যেত না। সব খেলাতেই কিছু তুক্‌তাকের ব্যবস্থা থাকে। আমরা যখন রংপুরে মার্বেল খেলেছি তখন একটি তুকমন্ত্র ছিল—কন্দর্পেশ্বরের লালবাড়ি। এটি বলতে পারলেই প্রতিপক্ষের হাতের টিপ খারাপ হয়ে যেত। শশীবাবু একটি বড় দোতলা কিংবা তিনতলা বাড়িতে থাকতেন। বাড়িটির অধিকারী কন্দর্পেশ্বর কবিরাজ। এর পরেও কি শশীবাবুকে ভোলা কারুর পক্ষে সম্ভব?

খেলায় কখনও ভাল ছিলাম না, কোনো খেলাতেই নয়। তাহলেও মণ্টুদের বাড়ি বিকালে খেলতে যাওয়া একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। মফঃস্বল শহরে অনেক সময় এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেতে হলে তিন-চারটে বাড়ির ভিতর দিয়ে যেতে হয়, রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক ঘুর। পরিচিত লোক হলে কেউ আপত্তি করত না, বাচ্চাদের তো কথাই নেই। মণ্টুর ভাল নাম ছিল বীরেন। আমরা এক ক্লাসে পড়তাম, কিন্তু এক স্কুলে নয়। একটা জিনিস ভাবলে আশ্চর্য মনে হয়—এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগসূত্র কখনও ছিন্ন হয়নি। মণ্টু অবশ্য নেই, ১৯২৭/২৮ সালে তার মৃত্যু হয়। মণ্টুর দাদা জয়পুরে ডাক্তার ছিলেন। অবসর নেবার পরে শান্তিনিকেতনে বাস করতে থাকেন। তিনি চার-পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত ছিলেন। মণ্টুর বাবা সত্যেন্দ্রকুমার সেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে চাকরি করতেন। এক সময়ে অনেক নবীন বাংলা উপন্যাস মফঃস্বল শহরের পটভূমিকায় লেখা হত। এর মধ্যে দু'একটি বাড়ি আধুনিক ধরনের, ছিমছাম। এই সব উপন্যাস পড়লে অনেক সময় মণ্টুদের বাড়ির কথা আমার মনে হয়েছে। বাড়ি কী করে রাখতে হয়, সত্যেনবাবু জানতেন। তাঁর স্ত্রীকে আমি দিদিমা বলে ডাকতাম। এঁদের দু'জনেরই বাগান করার শখ ছিল। ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রিন ফিঙ্গার, এঁদের তাই। মণ্টুর বাবা বাড়ির আসবাব বানাবার সময় মিস্ত্রির কাজকর্ম তদারক করতেন এবং সাহায্য করতেন। বাড়িতে অনেক বই ছিল, সে সবেরও নিয়মিত পরিচর্যা হত।

মণ্টুদের বাড়িতে যখন খেলতে আসতাম তখন বেলা পড়ে গিয়েছে। যে সব বাড়ি দিয়ে আসতাম তখন সেই বাড়ির গৃহকর্ত্রী বা একজন বৃদ্ধা দুপুরের খাবার গুছিয়ে নিয়ে খেতে বসেছেন। সামনেই নানা আকারের কাঁসার কিংবা সাদা-কালো পাথরের বাসন সাজানো। প্রায় প্রত্যেক জায়গায় দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে প্রশ্নের জবাব দিতে হত। যেমন, কলকাতায় না গিয়ে রংপুরে পড়ছি কেন, মা বাবার জন্য মন কেমন করে কিনা, এখানে কে পড়া বলে দেয়। বলা বাহুল্য এসব প্রশ্নের উত্তরও তাঁরা জানতেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিক। ছেলেদের খেলনার মধ্যে মেশিনগান, এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি আসেনি। কিন্তু আমরা কোমরে তরোয়াল ও কাঁধে একটি বন্দুক নিয়ে খেলতে যেতাম। তরোয়ালের উপর এমন মমতা ছিল যে, সেটি ব্যবহার করা যেত না। মনে হত ব্যবহার করলেই বাঁকা হয়ে যাবে। তরোয়ালটি ছুটির দিনে নারকেল তেল দিয়ে পরিষ্কার করতাম যাতে ঝকঝকে থাকে। মণ্টুর দোষ ছিল এই যে, বন্দুক ও তরোয়ালে সজ্জিত হলেই সে শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে শুরু করত। আমরা খুব ডাকাতির গল্প শুনতে পছন্দ করতাম। সব ছেলেই বোধহয় শিশুর 'বীরপুরুষে'র মত নিজেকে কল্পনা করে। মণ্টুর এই রকম ভাব হলে কখনও 'ডাকাত' বলত না, 'ডাকাইত' বলত, 'তিনজন ডাকাত' না বলে 'তিনজন ডাকাইত' বলত। আমরা দল বেঁধে যখন খেলতাম মণ্টুর দিদি আমাদের উপর চোখ রাখতেন। তাঁর ভাল নাম কখনও জানতাম না, আমরা 'পাকুদি' বলে ডাকতাম। মফঃস্বল শহরের সবার বাড়িতে আলাদা বসবার ঘর থাকে না, মণ্টুদের ছিল। পাকুদির একটি অর্গান ছিল। ১৯১৬/১৭ সালে অর্গান খুব সুলভ ছিল না। পাকুদির কাছে আমি রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান প্রথম শুনেছিলাম। আমার রংপুর ছাড়বার অল্পদিন পরেই পাকুদির বিয়ে হয়ে গেল। তারপর ষাট বছরের উপর তাঁর কোনো খবর জানতাম না। কিছুদিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ বেলা দত্তগুপ্ত, তাঁকে আগে থেকেই চিনতাম, আমাকে ডেকে বললেন, 'আপনার রংপুরের কথা মনে পড়ে ? আমার মামার নাম মণ্টু, তাঁর কথা মনে আছে ?' একমুহূর্তে যবনিকা সরে গেল। ষাট বছরের মধ্যে একবারও পাকুদির নাম মনে পড়েনি। আমি তাঁকে বললাম, 'তুমি তাহলে পাকুদির মেয়ে।' বেলা দত্তগুপ্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, 'পাকুদির কথা এখনও মনে আছে !'

সেই পাকুদির সঙ্গে একদিন দেখা হল বছর তিনেক আগে। গ্রীষ্মের অপরাহ্ন, আমি কোনো কাজে বাইরে বেরোচ্ছি, এমন সময় বসবার ঘরে পর্দা ঠেলে বেলা দত্তগুপ্ত এলেন, তাঁর ঠিক পিছনে—আমার চিনতে দু' সেকেণ্ড দেরি হল—পাকুদি। বেলা দত্তগুপ্ত না থাকলে হয়তো চিনতে আর একটু দেরি হত। ভাল করে দেখলাম চেহারা বেশি বদলায়নি। চুল সামান্য পেকেছে, কিন্তু সেরকম ঋজুই আছেন। কণ্ঠস্বর একটু বদলিয়েছে, এতদিন পরে হওয়া স্বাভাবিক। আমারও সময় ছিল না, উনিও তার পরদিন ফিরে যাচ্ছেন, কাজেই বেশি কথা হল না। আমি যে-কোন অবস্থাতেই তাঁকে চিনতে পারতাম, কিন্তু তিনি পারতেন না। একটি মালকোঁচা দেওয়া ধুতি, ধনুক-বাণ হাতে কিংবা

হাফপ্যান্ট ও তলোয়ারে সজ্জিত ছোট ভাইয়ের বন্ধুর জায়গায় এক পলিতকেশ বৃদ্ধকে চিনে নেওয়া কঠিন।

মণ্টুর সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠতা ছিল, এক স্কুলে যাদের সঙ্গে পড়েছি সে রকম ঘনিষ্ঠতা তাদের কারুর সঙ্গে হয়নি। যাদের সঙ্গে ভাব ছিল, যেমন সত্যেন সেন, তাকে খুব অল্প বয়সে রংপুর ছেড়ে খুলনা চলে আসতে হয়েছিল। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় তার সঙ্গে নতুন করে ঘনিষ্ঠতা হয়। গোপালচন্দ্র সেন আমার এক ক্লাস নিচে পড়ত। কয়েক বছর পরে রংপুর যখন ছেড়ে গেলাম তখনও গরমের ছুটিতে রংপুর এসেছি অনেকবার। মাঝে মাঝে অভিনয়ের আয়োজন হত। রংপুরে একটি থিয়েটার হল ছিল। আমরা একাধিক কারণে রংপুর সম্পর্কে বিশেষ গর্ব বোধ করতাম, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই নাট্যশালা। আর একটি ছিল বড় রাস্তার ধারে আধ মাইল লম্বা ফুটপাথ। উত্তরবঙ্গে কোথাও তখন ফুটপাথ ছিল না। ফুটপাথ দেখিয়ে আমরা নবাগতদের লজ্জা দেবার চেষ্টা করতাম। এর পরে রংপুরে কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। সেটি আর একটি গৌরবের কারণ।

রামমোহন রায়ের সঙ্গে যে রংপুরের যোগ ছিল একথা অল্প বয়সেই শুনেছি। কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্যারিস্টারি পাস করে এসে রংপুরে কিছুদিন আইন ব্যবসা করেছিলেন একথা অনেক দিন পর্যন্ত জানতাম না। প্রভাতকুমার তাঁর একটি ছোট গল্প 'বাজীকরে' রংপুর ও সেখানকার থিয়েটারবাড়ির হল ও তার বর্ণনা ব্যবহার করেছেন। তখনকার দিনে ছেলেরা যে নাটক অভিনয় করত তাতে স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত না হলে অসুবিধা হত। যে নাটক সর্বত্র অভিনীত হত, তা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট'। তখন সুরেলা অভিনয়ের যুগ। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কিছুদিন আগে গত হয়েছেন, দানীবাবু নাট্যসাম্রাজ্যের অধীশ্বর। আমরা যখন স্টেজ রিহার্সাল আরম্ভ করেছি তখন একজন শ্যামবর্ণ অল্পবয়সী যুবক এসে বসলেন। মহলা হচ্ছিল। আমি ইন্দ্রকুমার সেজেছি। তিনি আমাকে বললেন, 'কথায় কোনো সুর থাকবে না, যেমন করে লোকে কথা বলে সেইরকম করে বলবে।' শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। স্টেজে চেঁচামেচি করা বারণ, যদি নাই চেঁচালাম তবে অভিনয় করে কী হবে? এই ভদ্রলোক অভিনয়ের দিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাদের ভেলভেটের উপর জরির কাজ করা রাজপোশাক পরতে দিলেন না। থিয়েটারের ভাষায় যাকে রয়েল ড্রেস বলা হত। ধুতি, পাঞ্জাবি, সিল্কের রঙিন চাদর এবং তার উপর সামান্য কিছু কারুকার্য, এই নিয়ে আমাদের সাজিয়েছিলেন। তিনি পরে কলকাতায় শিশিরকুমার ভাদুড়ির দলে যোগ দিয়ে অভিনেতা বলে নাম করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রমোহন রায়। এর পরের বছর আমরা যে বই করেছিলাম তার নাম 'চিতোর গৌরব'। বইটি 'মেবার পতন'-এর অনুকরণে লেখা—অনুকরণ বললে অবশ্য কম বলা হয়। তখন রবীন্দ্রমোহন রায় ছিলেন না। এই অভিনয়ে আমরা খুব চেঁচামেচি করে কথা বলার ও সুর করে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলাম। 'চিতোর গৌরব' যারা অভিনয় করেছিলেন, পরে তারা অনেকেই নানা কারণে বিখ্যাত হয়েছিলেন। যেমন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেন,

বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করেছিলেন এবং বহুদিন বিদেশে ইউনেস্কোর উচ্চ পদে ছিলেন। বর্তমানে শান্তিনিকেতনে বসবাস করেছেন। আর একজনের নাম জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। রোগা ছিপছিপে চেহারা, কিন্তু ডাকনাম ভীম, এখন ভাল ডাক্তার। আর একবার সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' অভিনয় করা হয়েছিল। দলে কে কে ছিল ঠিক মনে নেই। তবে আমার ভাই অমল অভিনয় করেছিল মনে আছে।

ছেলেবেলায় আমার খুব বেশি বন্ধু ছিল না, কিন্তু তার অভাব বুঝিনি। চিরকালই দেখেছি আমার চেয়ে যাদের বয়স অনেক বেশি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সহজে হয়। এখন স্বভাবতই তাদের সংখ্যা খুব কমে এসেছে, তাই অসুবিধা হচ্ছে। সুটুবাবুর কথা আগেই বলেছি। কিছুদিন পরে তাঁর দাদা সুরেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী রংপুরে এসে আমাদের সঙ্গে থাকতেন, রংপুর কলেজে পড়তেন। তিনি ছবি আঁকতে পারতেন, বই পড়ার অভ্যাস ছিল, কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাঁর কাছে আমার অনেক ঋণ আছে।

খুব বড়দের মধ্যে আরও কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বলা যায়। তাঁদের একজনের নাম ক্ষিতীশচন্দ্র রায়। তখন অবশ্য জানা ছিল না যে ভবিষ্যতে তিনি আমার খুড়শ্বশুর হবেন। তিনি ওকালতি করতেন, কিন্তু ওকালতির চেয়ে ডুয়ার্সের চা বাগানে তাঁর বেশি উৎসাহ ছিল। আমার যখন অল্প বয়স, তখন তিনি আমাকে তাঁর সাইকেলের সামনে রডের উপর বসিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করতেন। কিন্তু তাঁর যে ক্ষমতায় আমি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলাম সে হচ্ছে রংপুর ড্রামাটিক ক্লাবের তিনি উৎসাহী সভ্য ছিলেন। অভিনয় হলে তিনি স্টেজ ম্যানেজারের কাজ করতেন। তিনি ঘণ্টা দিলে তবে ড্রপ সিন উঠত কিংবা নামত। এই ক্ষমতা দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কখনও কখনও তিনি আমাকে স্টেজের ভিতরে নিয়ে যেতেন। আমার কাছে একেবারে রহস্যপুরী। একবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে' অভিনয়ের সময় তিনি আমাকে গ্রিনরুমে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'পরপারে' আজকাল আর কেউ অভিনয় করে না। কেন করবে, তার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই। তবে কারুর কারুর মনে থাকতে পারে যে, এই নাটকে বিশ্বেশ্বর বলে একটি চরিত্র আছে, খুব ভাল মানুষ ও নায়িকার দাদামশাই। তাঁকে সবাই মিলে ঠকাতে আরম্ভ করল। নাটকের শেষে তিনি বুকে ছুরি মেরে আত্মহত্যা করলেন। আমি গ্রিনরুমে যখন গেলাম তখন দেখলাম দাদামশাই বিশ্বেশ্বরকে স্টেজে যে রকম মনে হয়েছিল সেরকম নন। গায়ের জামা খুলে ফেলেছেন, একটি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে মাংস রান্না কেন ভাল হয়নি সেকথা তুলে থিয়েটারের ভৃত্যকে বকছেন। গ্রিনরুমে যে লুচি-মাংস খেতে পাওয়া যায় এটা আমার কাছে খুব লোভনীয় মনে হল। তারপরের দৃশ্যে তিনি যখন বিছানায় বসে গেঞ্জির উপর ছোরা মেরে তাকিয়ার উপর উপুড় হয়ে পড়লেন এবং স্পঞ্জ কিংবা লালকালি মেশানো ন্যাকড়ার সাহায্যে গেঞ্জির একাংশ রক্তাক্ত হয়ে গেল তখন আমার আর ভয় ও বিস্ময়ের অবধি রইল না। যিনি ঐ নাটকের নায়ক ও বিশ্বেশ্বরের নাতজামাই সেজেছিলেন তাঁর নাম উপেন্দ্রনাথ সেন। তাঁকে সবাই পাঁচুবাবু বলে ডাকত, তিনিও ওকালতি

করতেন। তিনি ভাল অভিনেতা ছিলেন। কিন্তু যে জন্য এই সূত্রে তাঁর কথা বেশি মনে পড়ছে সে হচ্ছে তিনি দু'হাতে দুটি রিস্টওয়াচ পরে রঙ্গমঞ্চে নেমেছিলেন কেন জানি না। বোধহয় একটি ঘড়ি খুলতে ভুলে গিয়েছিলেন।

রংপুরের বাড়িতে দুটি ঘরে এত বই বোঝাই করা ছিল যে, আমার কোনো সঙ্গীর দরকার হত না। প্রায়ই বন্ধ থাকত বলে দরজা জানালা খোলা হলেও ভ্যাপসা গন্ধ একেবারে যেতে চাইত না। সেই ঘরে জানালার পাশে বসে আমি প্রথমবার 'রাজর্ষি' পড়েছিলাম। কাছে বাঁশের বেড়ার ওপারে আম, কাঁঠাল ও লিচুর বাগান। উত্তরবঙ্গের মত কাঁঠালের ফলন বোধহয় আর কোথাও হয় না। নীচ থেকে গাছের প্রায় মাথা পর্যন্ত অজস্র কাঁঠাল। লোকে বলত নীচের কাঁঠাল শেয়ালে খায়, উঁচুতে যে কাঁঠাল ফলত তাই মানুষের জন্য। গ্রীষ্মের সময় যখন লিচু হত, তখন পুরো গাছটা লাল হয়ে থাকত। এই ছোট ঘরে স্বল্প আলোতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বই পড়তাম। যখন ভাল করে পড়তে জানতাম না তখন 'চিত্রে চন্দ্রশেখর' দেখেছিলাম। সেসব ছবি এখন আর কারুর মনোহরণ করবে না। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমচন্দ্রে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হয়তো নয়, কিন্তু চন্দ্রশেখরের প্রতি প্রথম দর্শনের যে দুর্বলতা, সে আমার এখনও যায়নি। এখানে রবীন্দ্রনাথের বই তো বটেই এবং যাঁরা খ্যাতনামা কিংবা অল্প পরিচিত তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই বই ছিল। সেসব এখন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও অনেক মাসিক পত্রিকা খোলা এবং বাঁধানো অবস্থায় ছিল, যেমন 'প্রদীপ', 'ভারতী' ও 'প্রবাসী', ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ'। তাছাড়া 'গৃহস্থ' ও 'নব্যভারত', ছেলেদের পত্রিকা 'সখা ও সাথী', 'মুকুল'। কোনো ছোট ছেলের পক্ষে এর চেয়ে ভাল সঙ্গী আর কী হতে পারে?

রংপুরে বৃষ্টি এখন শুনছি কমেছে। আমার ছেলেবেলায় বর্ষার যে দৃশ্য দেখেছি স্পষ্ট মনে আছে। লিচু ও আমকাঁঠালের বাগানের উপর ঘন কালো মেঘ নিচু হয়ে এসেছে। সমস্ত রাত্রি মেঘের ডাকে ভাল ঘুম হত না, ঘন বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনতাম। তখন জানতাম না, এখন বুঝতে পারি, এই ধরনের বৃষ্টি বৈষ্ণব কবিদের প্রিয় ছিল। সকালে উঠে দেখি চারদিকে জল, বারান্দার ধাপ পর্যন্ত জল উঠেছে। খুব মজা লাগত সন্দেহ নেই। তার চেয়েও মজা লাগত যখন দেখতাম সমস্ত উঠানে মাছ খলবল করছে। মাগুর, কই, খলসে। দু'একটা হেলে সাপও যে দেখা যেত না তা নয়। পাড়াসুদ্ধ লোক যার যা অস্ত্র, খালুই বা ঐ রকম কিছু জিনিস, নিয়ে মাছ ধরবার চেষ্টা করছে। ধরতে খুব কষ্ট হচ্ছে না। রংপুরে তখন অনেক খড়ের বাড়ি, ভিত নিচু। আমার মা শ্বশুরবাড়ির উপর রাগ হলে বলতেন, নিশ্চয়ই রংপুরের লোকের বুদ্ধি কম, নাহলে এই রকম জায়গায় অত নিচু ভিতের বাড়ি করে। যাই হোক, সেসব বাড়ির ঘরে জল ঢুকেছে, রান্নাবান্না বন্ধ। দেখেছি, আমাদের বাড়ি থেকে এবং অন্য দু'একটি বাড়ি থেকে যারা বলবান যুবক মাথার উপর একটি বারকোশ কিংবা পরাতে নানারকম বাসনপত্রে খাবার সাজিয়ে সেই সব বাড়িতে ভাত নিয়ে যাচ্ছে। এরকম অবস্থা দু'একদিন চলত। তারপর জলের টান ধরত, উঠানের জল শুকিয়ে কাদা হয়ে যেত। তার মধ্যেও যে মাছ পাওয়া

যেত না তা নয়। আমাদের বাড়ির বাইরের দিকে দুটি খুব নিচু জায়গা ছিল। সেখানে অনেকদিন পর্যন্ত জল জমে থাকত। তার পাশে রাস্তার ধারে কয়েকটা জিকা গাছ। বর্ষার জলে তারা পাতাবিহীন ডাল মেলে মাছধরার ভঙ্গিতে জলের দিকে হেলে থাকত। জিকা গাছ থেকে ভাল আঠা হয়, যার জন্যে ছেলেমহলে এই গাছ খুব প্রিয় ছিল, ঘুড়ি মেরামত করার কাজে লাগত।

জল শুকিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের জ্বর দেখা দিত, হয়তো জলে দাপাদাপি করবার ফল। এদিকে আমাদের বাড়ির সামনে কচুগাছ জল থেকে উপরে মাথা তুলত, মরা ব্যাঙ চিত হয়ে ভেসে উঠত, বাতাসে খুব দুর্গন্ধ। আমরাও খুব দুর্গন্ধযুক্ত মিক্সচার খেতাম। যে বার পুজো আগে পড়ত, তার আগে পর্যন্ত জ্বরে ভুগতাম।

অনেক দূর চলে এসেছি। আগেকার কাহিনীতে ফিরে যাই। প্রথমে যাঁর বাড়ি তাঁর কথা একটু বলি। আমাদের পিতৃপুরুষের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমায়। অনেকে হয়তো লক্ষ করেছেন ঢাকা, বিশেষ করে বিক্রমপুরের কথা যথেষ্ট পূর্ববঙ্গীয় হলেও শুনতে মিষ্টি, মেয়েদের হাতের রান্নাও সেরকম চমৎকার। এখন অবশ্য দুইই লোপ পেতে বসেছে। ঢাকার গ্রামগুলির নামও শ্রুতিমধুর। টাঙ্গাইলের গ্রামের নাম সেরকম নয়। যে গ্রামে আমাদের বাড়ি ছিল সে গ্রামের নাম ছোটবিন্যাফৈর। বড়বিন্যাফৈর বলেও হয়তো কিছু ছিল। কিন্তু বড় বাশালিয়া ও ছোট বাশালিয়া নামে কাছেই দুটি গ্রাম ছিল জানি। বিক্রমপুরের কোনো কোনো গ্রামের নাম কবিতায় দেখেছি কিন্তু ছোটবিন্যাফৈর, কিংবা বড় বাশালিয়ার নাম আধুনিক কবিতায় পর্যন্ত ঢোকানো যাবে না। আমার যিনি প্রপিতামহ তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মীকান্ত গুপ্ত। ন্যায়শাস্ত্রে আছে নামবাচক বিশেষ্যর কোনো অর্থ হয় না। একথা লক্ষ্মীকান্ত গুপ্ত সম্বন্ধে খুব বেশি ঠিক, লক্ষ্মী তাঁকে কৃপা করেননি। তিনি এবং আমার প্রপিতামহী অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিলেন। আমার পিতামহ উমেশচন্দ্র গুপ্তর কোনো নিকট আত্মীয় ছিলেন না। কিছু জমিজমা, পুকুর ইত্যাদি ছিল, কিছু হয়তো পরবর্তীকালে তিনি নিজেও করেছিলেন। ছোটবিন্যাফৈর থেকে তিনি সন্তোষ স্কুলে পড়তে যেতেন। সে স্কুলও খুব কাছে ছিল না। শুনেছি তাঁর যখন এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার সময় হয়, তখন তিনি পরীক্ষার ফি এবং আনুষঙ্গিক খরচ জোগাড় করতে পারেননি। জ্ঞাতিদের অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু সেখান থেকে সাহায্য পাননি। কখন তিনি রংপুরে এসেছিলেন এবং বি· এ· ও আইন পাস করলেন সে খবর আমার জানা নেই। ছোটবিন্যাফৈর ও তার আশেপাশে অনেক বর্ধিষ্ণু তাঁতির বাস ছিল সেদিন পর্যন্ত। তাঁদের কাছ থেকে ধার নিয়ে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষার টাকা জোগাড় করেছিলেন। শুনেছি কলকাতায় আইন পড়বার সময় আমার মাতামহ হরশঙ্কর রায়চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। টাঙ্গাইলের তাঁতিরা তাঁর প্রতি যে ভাল ব্যবহার করেছিলেন, সেকথা উমেশচন্দ্র গুপ্ত কখনও ভোলেননি এবং নানাভাবে এই ঋণ পরিশোধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। লক্ষ্মী আগে যে পরিবারকে পরিত্যাগ করেছিলেন, কয়েক বছর পরে তার প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। আমার পিতামহী মোক্ষদাদেবীর যখন বিয়ে হয়েছিল তখনকার রীতি অনুসারে তাঁর বয়স

দশ-এগারোর বেশি হবে না। লেখাপড়া তখন কিছু জানতেন না, জানবার কথাও নয়। কখনও স্কুলে পড়েননি, কিন্তু আমাদের বাড়িতে আধুনিক কাল পর্যন্ত যেসব মেয়েরা বউ হয়ে এসেছেন তাঁদের সবার চেয়ে শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি বলতেন বিয়ের পরে ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে তিনি রান্নাঘরে বই নিয়ে বসতেন, এই করে লেখাপড়া শিখেছেন। ইংরেজি বিশেষ জানতেন না। বলতেন প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত পড়েছিলেন। আর এগোয়নি কারণ পড়া বুঝিয়ে দেবার লোক কেউ ছিল না। বাংলা ভাল জানতেন। শুধু গল্প উপন্যাস নয়, প্রবন্ধের বই, দর্শনের বই, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র সবই মন দিয়ে পড়তেন। স্মরণশক্তি ভাল ছিল। যখন তাঁর আশি বছর বয়স হয়েছে তখন 'রাজা ও রানী' থেকে মুখস্থ বলতে পারতেন। তাছাড়া নবীন সেনের 'প্রভাস', ও 'কুরুক্ষেত্র' কিংবা 'রৈবতক', এসব বইয়ের অনেক জায়গা মুখস্থ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধের কথা মাঝে মাঝে উল্লেখ করতেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের কলকাতায় তখন বড় বইয়ের দোকান। তাদের জানানো ছিল, কোনো নতুন বই বের হলে তাঁর কাছে গুপ্ত ফ্যামিলি লাইব্রেরির নামে যেন পাঠানো হয়। তাঁর একটি শখ ছিল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা। একটি প্রাচীন হোমিওপ্যাথির বই চন্দ্রশেখর কালীর লেখা, উনি সাধারণত ব্যবহার করতেন। আজকাল আর এসব বই দেখা যায় না। সব চিকিৎসারই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আর একটি অভ্যাস ছিল, যাকে এখন বলা হয় সোশ্যাল ওয়ার্ক। সকালে ঘুম থেকে উঠে মাঝে মাঝে দেখতাম তিনি বাড়ি নেই। একটু পরে ঘুরে এসে বলতেন, 'আমি স্নান করতে যাচ্ছি।' অর্থাৎ রাত্রে তিনি কোনো রোগীকে দেখতে গিয়েছিলেন।

বাবা, মা কলকাতায় থাকতেন, ছুটিতে বাড়ি আসতেন। আমার ঠাকুর্দা ও বাবা দু'জনেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যাঁরা তখন স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন যে প্রথম ন্যাশনাল স্কুল রংপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাবা সেখানে কিছুদিন পড়িয়েছেন। এই আন্দোলন একসময় জুড়িয়ে এল। বাবা অল্পদিন রংপুর আদালতে আইনের ব্যবসা করেছিলেন, পরে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হাইকোর্টে চলে এলেন। আমি রংপুরে থেকে গেলাম। ছুটিতে মা-বাবার সঙ্গে দেখা হত। স্কুলে ভর্তি হবার আগে মাঝে মাঝে কলকাতায় এসেছি।

বাড়ির ঠিক লোক বলতে তিনজন কিংবা আড়াইজন। তাহলে কী হবে, খাবার ঘরে অনেক লোক। বড় রান্নাঘর সবার জন্য, তার মধ্যে বেশির ভাগ হচ্ছে বাইরের লোক। বাইরের দিকে অনেকগুলি খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর ছিল ছাত্রদের জন্য। যারা বলত যে, তারা পড়তে চায় কিন্তু সঙ্গতি নেই কিংবা থাকবার জায়গা নেই তাদের জন্য অবারিত দ্বার। ঠাকুর্দার হয়তো তাঁর নিজের ছাত্রজীবনের কথা মনে হত। এরা যে সবাই সব সময় ছাত্র ছিলেন একথা হলপ করে বলতে পারব না। তবে একজনের কথা আমার মনে আছে—কামিনীকুমার মৈত্র। তিনি কলকাতায় কলেজে ভর্তি হবার পূর্ব পর্যন্ত ওখানে ছিলেন, পরে রাজশাহীতে গিয়ে ওকালতি করেন। হয়তো একটি লোকের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা

সার্থক হয়েছিল। বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স এতদিনে প্রায় নব্বই হত। দেশভাগের পর তাঁর আর কোনো খবর জানা নেই। তাঁর পলগ্রেভ'স গোল্ডেন ট্রেজারির একখণ্ড, সর্বাঙ্গে তাঁর হাতে লেখা নোট, কলকাতার বাড়িতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আমার খুব কাজে লেগেছিল। স্কুল কলেজের ছাত্র ছাড়াও আরও কেউ কেউ দিনের বেলায় খেতেন, তাঁদের মধ্যে সংসারীও কিছু ছিলেন। বাবা রংপুরে এলে ওখানেই খেতেন। শুধু একজন খেতেন না, তিনি আমার পিতামহ। তাঁর জন্য আলাদা রান্নাঘর, সেটা বাড়ির ভিতরে, সেখানে আমার ঠাকুর্দার জন্য রান্না হত। আর একটা ঘরও ছিল, সেটা শুধু নিরামিষ রান্নার জন্য। বাড়িতে বিধবা আত্মীয়ারা কেউ কেউ থাকতেন, তাঁরাই রান্না করতেন। কাছেই তাঁদের পুজোর জায়গাও। পাশের নিচু বারান্দায় গেলে চন্দনের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, নিরামিষ রান্না ও ডালের সম্বরার গন্ধ সব একসঙ্গে আসত। পিতামহ কোনো ঠাকুরের হাতে রান্না খেতেন না। ঠাকুমাই বেশি রাঁধতেন, তিনি না পারলে কোনো বউকে রাঁধতে হত। তিনি রোজ রাত্রে মাংস খেতেন, কখনও কখনও পায়রার মাংস। আমার পিতামহ লম্বাচওড়া ছিলেন না, চুল কোঁকড়া এবং শক্ত। আমার ভাই অমলের সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল পাওয়া যেত। বাতের জন্য স্নান বেশি করতে পারতেন না। অসুখে খুব ভুগতেন, যাকে এখন অ্যামিবিসিস বলে। তখন জানা ছিল না যে অ্যামিবিসিসের ওষুধ মাংস। সব সময় ল্যাভেণ্ডার মাখতেন এবং নস্যি নিতেন। নস্যি নিতেন বলা হয়তো ভুল হল, নস্যি তাঁর হাতে থাকত, নাকে বেশি পৌঁছত না। তাঁর জামায়, কাপড়ে, ফরাসে, টেবিল-চেয়ারে দোলের দিনে আবিরের মতো নস্যি পড়ে থাকত। 'নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে কাহার সাধ্য দাঁড়ায়।' ১৯১৭ সালের শেষদিকে ঠাকুর্দা অসুস্থ হয়ে কলকাতায় চলে এলেন, তার পরে আর রংপুর ফিরে যেতে পারেননি।

ছেলেবেলায় রংপুর থেকে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতাম একথা আগে বলেছি। কলকাতায় বাবা ভবানীপুরে থাকতেন, পদ্মপুকুর রোডে ১৬ নম্বর বাড়ি। এখন সেটি শিখদের স্কুল ও গুরুদ্বার হয়েছে। বাড়িটির সব ভাল, পাথরের মেঝে, উঁচু দেয়াল, ঘরে খুব আলো বাতাস, একফালি জমিও ছিল, কিন্তু পাড়ায় বাড়ির দুর্নাম ছিল। তখন কোনো কোনো বাড়িতে পুরনো কুয়ো থাকত, এই বাড়িটিতেও ছিল। একটি গল্প শুনেছিলাম যে আগে এই বাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের এক আত্মীয় মত্ত অবস্থায় ঐ কুয়োয় পড়ে মারা গিয়েছিলেন, তারপর থেকে তাঁর প্রেতাত্মা কুয়োর পাশে একটি গাছে এবং নানা ঘরে বিচরণ করে। এই গুজব শোনামাত্র বাড়ির কাজের লোকেরা রোজ রাত্রে ভূত দেখতে আরম্ভ করল। তখন কলকাতায় পুরনো বাড়ি অনেক বেশি ছিল, রাস্তায় আলো কম ছিল, কাজেই ভূতের সংখ্যাও অনেক ছিল। বাঘকে ক্যানেস্তারা পিটিয়ে তাড়ানো যায় কিন্তু ভূতকে তাড়ানো আরও কঠিন। আমরা অবশ্য সে বাড়িতে বছরখানেক ছিলাম। দেখা গেল আমরা ছাড়া আর সবাই ভূতকে ভয় পাচ্ছে। এই বাড়িটি এক সময় আমাদের কেনবার কথা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কেনা হয়নি।

কলকাতায় আমার মামার বাড়ি ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনে, জোড়াগির্জার কাছে। তখন ঐ পাড়ায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের লোক খুব বেশি ছিল। এখন প্রায় লোপ পেয়েছে। এখনকার আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড থেকে গলিতে ঢুকে বাঁদিকে বড় গেটওয়ালা বাড়ি। আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি বাড়িতে মোটামুটি চার ভাগ। আমরা বলতাম চার ব্লক—এ বি সি ডি। মামাদের জমিদারি যিনি পত্তন করেন চার পুরুষ আগে, তাঁর নাম শ্যামাশঙ্কর রায়চৌধুরী। তামাকের ব্যবসা করে ধনী হয়েছিলেন। ব্যবসার টাকায় জমিদারি কিনলেন। 'রাজা' খেতাব পেয়েছিলেন। তিনি যখন এখানে বাড়ি করেন তখন এটি একটি মেমসাহেবের সম্পত্তি ছিল। এখন যে ধরনের বড় বাড়ি হয়েছে, তখন সে ধরনের ছিল না। একটা বড় হাতার মধ্যে একতলা ছোট বাড়ি, একশো বছর আগে যাকে কটেজ কিংবা ভিলা বলা চলত। বাড়ির নতুন মালিকরা সেই বাড়ি ভেঙে সেকেলে জমিদারবাড়ির মতো তৈরি করে নিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ির পিছনে অনেকটা খোলা জায়গা রেখেছিলেন। আমার মাতামহ হরশঙ্কর রায়চৌধুরী 'এ' ব্লকে থাকতেন। বাড়ির পিছনে খোলা জায়গার একাংশে তাঁর বাগান ছিল এবং পূর্বদিকে ছেলেদের খেলবার জন্য ফুটবলের মাঠ। বাগানে দেশী এবং বিদেশী ফুলের গাছের মধ্যে কিছু দুষ্প্রাপ্য গাছও ছিল। আর ছিল গাছপালা সম্বন্ধে কিছু বইয়ের সংগ্রহ। যাকে হর্টিকালচার বলে তাতে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। অল্পদিন আগে বাড়ি সংস্কার করবার সময় তাঁর একটি ডায়েরি পাওয়া গিয়েছিল, সেকালে হর্টিকালচারিস্টরা যেমন রাখতেন। তাঁর আর একটি শখ ছিল পাখি পোষা। নীচের বারান্দায় নানা রকম পাখি থাকত। দেশের বাড়ি, মানিকগঞ্জের তেওতা গ্রামে, তাঁর নিজের বড় লাইব্রেরি ছিল ; তাতে এলিয়ট ও ডসনের ভারতবর্ষের ইতিহাসের পুরো সেট দেখেছি। এখন পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, পূর্বে একেবারে দুর্লভ ছিল। কলেজে পড়বার সময় এই খণ্ডগুলির উপর আমার লোভ ছিল। দেশ ভাগ হয়ে যাবার পর অন্য বইয়ের মতো হয়তো নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

হরশঙ্কর রায়চৌধুরীর তিন ছেলে। বড় চারুশঙ্কর, তিনি জমিদারির কাজ ভাল বুঝতেন শুনেছি। তাঁর শিকারের শখ ছিল, অভিনয়েও উৎসাহ ছিল। কিন্তু আমি যখন থেকে তাঁকে দেখছি তখন থেকে প্রতি শীতকালে তিনি হাঁপানিতে ভুগতেন। দোতলার বারান্দায় কিংবা ঘরে বালিশ ঠেস দিয়ে উপুড় হয়ে থাকতেন—সে দৃশ্য আমার খুব পরিচিত। তাঁর আর একটি গুণ ছিল—কলকাতার দোকান এবং জিনিসপত্রের দর তাঁর নখাগ্রে। বাড়ির সবার সুখ-দুঃখ তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন। বেশি বয়স পর্যন্ত বাঁচেননি। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স পঞ্চাশও হয়নি। তাঁর একমাত্র ছেলে ব্রতিশঙ্কর কলকাতা সায়েন্স কলেজে অধ্যাপনা করতেন। পরে অস্ট্রেলিয়া গিয়ে অধ্যাপনা করেন, অবসর নিয়ে সেখানেই বসবাস করছেন।

হরশঙ্করের দ্বিতীয় পুত্র কিরণশঙ্কর রায়। তাঁকে রাজনীতির লোক হিসাবে লোকে চেনে। অক্সফোর্ডের কিংস কলেজ থেকে ইতিহাসের ডিগ্রি নিয়েছিলেন। কিছুদিন সরকারি কলেজে চাকরিও করেছিলেন, কলকাতার সংস্কৃত কলেজ এবং

৪৭. ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেন

প্রেসিডেন্সি কলেজে। বিলেতে থাকার সময় ব্যারিস্টারিও পড়েছিলেন, কিন্তু শেষ করেননি। কয়েক বছর পরে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে হাইকোর্টে নাম লেখালেন বটে, কিন্তু কংগ্রেসের কাজ নিয়ে মেতে উঠলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর তখন খুব বন্ধুত্ব ছিল। কিরণশঙ্কর রায়কে শুধু রাজনীতির লোক মনে করা বোধহয় ঠিক হবে না। ইতিহাস এবং সাহিত্যে জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। 'সবুজপত্র'-এর দলে প্রধান সদস্যদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তাঁর একটি ছোট গল্পের বই আছে, তা থেকে কিছু বোঝা যাবে না। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে কেউ কয়েকটি গল্পের ভাষা নিজের মতো করে বদলিয়েছেন, তার ফল ভাল হয়নি। প্রায় ষাট বছর আগেকার প্রবাসীতে তাঁর দুটি ছোট গল্প বেরিয়েছিল, তাতে তাঁর ক্ষমতা খানিকটা বোঝা যেতে পারে।

আমার ছোট মামা দেবশঙ্কর রায়। তিনি বহুদিন বিদেশে ছিলেন। যখন স্কুলে পড়ি তখন তাঁকে দেখেছি, এডিনবরা থেকে একবার এসেছিলেন। তারপর যখন বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে কলকাতার বাড়িতে বাস করতে লাগলেন তখন বাড়ির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর একমাত্র পুত্র সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেন। আমার মাতামহের চার মেয়ে, এখন কেউ বেঁচে নেই। আমার মা সাবিত্রী দেবী তাঁর তৃতীয়া কন্যা।

পাশের বাড়ি অর্থাৎ বি ব্লকে হরশঙ্করের ভাই পার্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী থাকতেন। তাঁর দুই ছেলে—কুমারশঙ্কর রায় ও কুমুদশঙ্কর রায়। দু'জনেই বিলেত গিয়েছিলেন, একজন ব্যারিস্টারি পড়তে, আর একজন ডাক্তারি পড়তে। পার্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী ভাইয়ের তুলনায় অনেকটা সেকেলে ছিলেন। সনাতন হিন্দু ধর্মে গাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর চেহারা আমার ভাল মনে নেই। কিন্তু তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আমার দিদিমার চেহারা আমার খুব মনে পড়ে। তার কারণও স্পষ্ট। তিনি অনেকদিন বেঁচে ছিলেন এবং বেশি বয়সে, আমার মনে হত, তাঁর চেহারা আস্তে আস্তে মহারানি ভিক্টোরিয়ার পরিণত বয়সের চেহারার মত হয়ে যাচ্ছে। তিনি অবশ্য ভারতেশ্বরীর মত স্থূলকায়া ছিলেন না। অনেক সময় দেখেছি সেকালের লেস-বসানো জ্যাকেট ও শাল জড়িয়ে চেয়ারে বসে আছেন, একটু দূর থেকে রোগা ভারতেশ্বরী মনে হওয়া আশ্চর্য ছিল না। তিনি কথা কম বলতেন এবং রাশভারী ছিলেন।

আমার মাতামহ হরশঙ্কর রায় প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করেছিলেন। প্রথম দিদিমাকে আমরা দেখিনি। নীচে একতলায় মাতামহের বসবার ঘরে তাঁর একটি বড় অয়েলপেন্টিং ছিল, কোনো বিদেশী চিত্রকরের আঁকা হতে পারে। জমকালো জামদানি শাড়ি পরা খুব জীবন্ত ছবি। যখন বয়স অল্প ছিল তখন কখনও কখনও একা ওঘরে ঢুকতে ভয় পেতাম। মনে হত ছবির চোখ কথা বলছে। যাঁকে দিদিমা বলে জানতাম, তিনি যে আমার নিজের দিদিমা নন, একথা খুব বড় হবার আগে বুঝতে পারিনি। ছবিতে যাঁকে দেখেছি তাঁকে এ-বাড়ির কেউ নয় বলে মনে হত। পরে দ্বিতীয় দিদিমাকে আসল দিদিমা মনে হয়েছে। তাঁর নাম ছিল বিনোদিনী দেবী। তিনি আমাকে একটি অমূল্য জিনিস উপহার দিয়েছিলেন, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'র প্রথম

সংস্করণ। দোতলার বারান্দায় তাঁর নিজের বালিকা বয়সে পাওয়া একটি কাঠের আলমারিতে সেকালের অনেক বই ছিল, তার অনেকগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। এই আলমারি থেকে নিয়ে এক ছুটির দুপুরে 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' পড়তে আরম্ভ করেছিলাম।

হরশঙ্কর রায়চৌধুরী অধিকাংশ সময় কলকাতায় কাটাতেন। শীতের সময় কয়েক মাস তিনি থাকতেন জমিদারি মানিকগঞ্জের তেওতা গ্রামে, পদ্মা নদীর উপরে। ম্যালেরিয়ার উৎপাত না হলে এই সময়টা খুব ভাল। যে বছর বেশি বৃষ্টি হত, সে বছর ম্যালেরিয়ার ভয় কম থাকত। বাড়ির পাশেই পদ্মা। সৌভাগ্যের কথা, পদ্মার এপার ভাঙত না। কলকাতায় যখন থাকতেন তখন সকালে বড় কাঁচি নিয়ে বাগানে গাছের পরিচর্যা করতেন, পাখিদের দেখাশোনা করতেন। বই পড়ার অভ্যাস ছিল। বাড়ির একেবারে পশ্চিম দিকে এক সারি ঘর বোধহয় এখনও আছে। সেটা ছিল অনেকদিন আগে সব শরিকের এজমালি রান্নাঘর। বাড়ির সকলের জন্য সেখানে রান্না হত। খরচ এত কম ছিল, এখন কেউ বিশ্বাস করবেন না বলে লিখলাম না। মেয়েদের খাবার যার যার বাড়িতে পৌঁছে দিত। চার ব্লকের কর্তারা সবাই এখানকার রান্না খেতেন না। তবে দু'বেলা বাড়িতে হাঁড়ি না চড়ালেও চলত। হরশঙ্কর রায়ের জন্য আলাদা রান্না হত। তাঁর খাওয়া, এখন বুঝতে পারি, সাধারণ বাঙালি-পছন্দ খাওয়া ছিল না। একটা বড় থালায় খুব পাতলা ডালপুরি কিংবা পরোটা কিংবা অল্প পোলাও। ফ্রায়েড রাইস তখনও ওঠেনি, উঠলেও কেউ তাকে হয়তো পাতে দেবার উপযুক্ত বলে মনে করতেন না। খুব কম খেতেন। ডায়েবিটিস ছিল। তখনও ডায়েবিটিসের ওষুধ বের হয়নি। মিষ্টান্নে তাঁর রুচি ছিল না একথা বলা যায় না।

১৯১৮ সালে আমার ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর কলকাতায় এসে আমি পাকাপাকি থাকতে লাগলাম। খুব ছেলেবেলায়, মনে পড়ে, নাকি বারে বারে শুনে শুনে মনের মধ্যে ছবি তৈরি হয়েছে জানি না, তারও আগে একবার উপেন্দ্রনাথ সেন, তাঁর কথা আগে বলেছি, আমাকে ও মাকে রংপুরে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। তখনও পদ্মার উপর সারা ব্রিজ, এখন যার নাম হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, তৈরি হয়নি। আমাকে তিনি পরে বলেছেন, আমি তখন কথা বলতে শিখিনি, স্টিমারে যখন উঠেছি তখন ভোর হয় হয়, স্টিমারে উঠে বললাম, 'চা'। একথা বইয়ের প্রথমে বলেছি। তারপর মাঝে মাঝে রংপুর-কলকাতা করেছি। তখন রংপুরের স্কুলে কেবল ভর্তি হয়েছি। একবারের কথা মনে পড়ছে। তখনক.র দিনে ছ'সাত বছরের ছেলেদের একরকম পোশাক পরানো হত, বহুদিন হল দেখা যায় না। প্যান্টের সঙ্গে একটি সুতির জামা, তাকে বলা হত ব্লাউজ, দেখতে অনেকটা এখনকার ব্যাটল্-ড্রেসের মত। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের সময় থেকে সে দেশে প্রচলিত ছিল। ব্যাটল্-ড্রেসও আজকাল প্রায় অন্তর্ধান করেছে। তবে সিমলা, দিল্লি অঞ্চলে এখনও দেখা যাবে। আগের দিন সন্ধ্যায় রংপুর ছেড়েছি। বেলা হয়েছে, শীতকাল। জানালার পাশে পদ্মা নদীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় ভেড়ামারা স্টেশন ছাড়িয়ে উচ্চকিত ধ্বনি করে ট্রেন সারা ব্রিজের

উপর উঠল। গাড়ির চাকার শব্দ বদলে গেল। সারা ব্রিজের দু'দিকে উঁচু গার্ডার, ভাল করে কিছু দেখা যায় না। দু'দিকে বহুদূর পর্যন্ত জলরেখা আকাশের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ছেলেবেলায় সব সময় মনে হত এত ভাল জিনিস এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, উপভোগ করা যায় না। যখন শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছলাম, দুপুর হয়েছে। ছেলেরা শার্টের উপর ওপ্‌ন ব্রেস্ট কোট গায়ে দিয়ে বই হাতে কলেজে চলেছে। দেখে খুব আশ্চর্য মনে হয়েছে। মনে হয়েছিল এই বুঝি সংস্কৃতির শেষ সোপান।

প্রত্যেকবারের মতো বাড়ি না এসে কেন মামার বাড়ি গিয়ে উঠলাম, ঠিক মনে পড়ছে না। দুপুরবেলায় খেয়েদেয়ে দোতলার বারান্দায় বসে আছি। বাড়ির উপর দিক নিস্তব্ধ। বারান্দা থেকে দক্ষিণে লালচাঁদের ছাপাখানার দেওয়াল চোখে পড়ছে। এমন সময় নীচ থেকে কে 'গোলাপির মা' বলে চিৎকার করে ডাকল এবং তারচেয়েও তীক্ষ্ণসুরে গোলাপির মা জবাব দিল। গোলাপির মা এখানকার পুরনো দাসী। তার চেহারা আমার এখন কিছু মনে নেই। একটি লোকের কথা বলা দরকার, তার নাম লক্ষ্মণ। সে বাবুদের খাসভৃত্য। বাবুদের মাথায় ফুলেল তেল মাখানো, কাপড় কোঁচানো এবং সাধারণভাবে সব জিনিসের তদারক করা তার কাজ। একতলায় বাড়ির ভিতর একটা ছোটঘরে থাকত। রাত্রে ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলত। বেঁটে, রোগা দুর্বল দেখতে, কিন্তু অত্যন্ত সবল প্রকৃতির লোক। গল্প শুনেছি একবার সে অভিমান করে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তার নতুন মনিব নিজের হাতে বাজার করেন দেখে ধিক্কারে চলে এসেছিল। মনে হয় লর্ড কর্নওয়ালিস এদেশে শুধু ভাল জমিদারি সৃষ্টি করতে চাননি, অজ্ঞাতসারে কিছু জিভ্‌সও সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

অল্পদিন আগে অসুখের সময় তন্দ্রার ঘোরে মনে হল লক্ষ্মণ আমার বিছানার পাশে হাঁটু উঁচু করে বসে আছে। আগেকার মতো সামনে লণ্ঠন জ্বলছে। অনেকবার হাত নেড়ে তাকে সরিয়ে দিতে চাইলাম, কিন্তু লক্ষ্মণ গেল না, বসে রইল।

ইয়োরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনের বাড়িতে আমার জীবনের একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। সেটা বোধহয় ১৯১৭ সাল, রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখলাম। তিনি 'ডাকঘর' পড়ে শুনিয়েছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে তার আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু তাঁর কিছু লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, ও বয়সে যা সম্ভব।

ইংরাজি স্কুলের আকর্ষণ তখন মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে ছিল না বললেই হয়। বাংলা স্কুলও যে রবীন্দ্রনাথকে মাথায় করে রাখত সে কথা সত্যি নয়। তখন কোনো কোনো বাড়িতে, যেখানে লেখাপড়ার চর্চা ছিল, ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথের লেখা কিছু কিছু পড়ত। অল্প বয়সে 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ প্রায় মুখস্থ করেছিলাম, দু'একটি কবিতা ছাড়া। 'দেবতার গ্রাস' আমার খুব নিষ্ঠুর মনে হয়েছে। ঐ পাতাগুলো প্রায়ই না পড়ে উল্টে যেতাম। অল্প বয়সে বাবা আমাকে কবিতা মুখস্থ করতে বলতেন। একটির কথা মনে আছে, 'কথা ও কাহিনী'র

শ্রাবস্তীপুরের দুর্ভিক্ষ ও ভিক্ষুণী সুপ্রিয়ার কবিতাটি মুখস্থ করেছিলাম. কিন্তু তার সৌন্দর্য তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। আর তিনি মুখে মুখে শিখিয়েছিলেন বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি। সেটি প্রথম থেকেই আমার মনোহরণ করেছিল। কিছুদিন আগে 'ডাকঘর' প্রকাশিত হয়েছে। ডাকঘর আমার পড়া ছিল। কিন্তু সবই যে বুঝেছিলাম, এমন কথা কী করে বলব ? তবে গল্প বুঝতে তো অসুবিধা হয়নি।

শুনে কী মনে হল সে সম্পর্কে বেশি কিছু বলবার দরকার নেই। একথা অনেক সময় ভুলে যাই এখন যাঁদের বয়স পঞ্চাশের নীচে তাঁদের রবীন্দ্রনাথের পাঠ সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। গ্রামোফোনের রেকর্ডে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা যথেষ্ট নয়। আর তখন এত ভাল ভাবে রেকর্ড করবার কৌশলও জানা ছিল না। এই সব রেকর্ড যখন হয়েছে, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ষাট বছরের বেশি। একথা অনেকেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ যখন নাটক পড়তেন তখন কথা বলবার সময় অভিনয়াংশের উপর জোর দিতেন। এতদিন পরে আমার যা মনে আছে সে হচ্ছে নিমেষের মধ্যে কবি অমল বা পিসেমশাই হয়ে গেলেন, কিংবা সুধা কিংবা মোড়ল কিংবা রাজকবিরাজ । পড়া শেষ হয়ে গেলে পাশের ঘর থেকে মহিলারা, তখন সর্বত্র যে রকম হত, গানের জন্য অনুরোধ জানালেন। রবীন্দ্রনাথ দু'একবার আপত্তি করে অবশেষে গাইলেন। কী গান, আমার স্মরণ নেই। পড়বার আসরে উপস্থিত ছিলেন এমন একজনের কাছে পরে শুনেছি গানটি হচ্ছে 'ধীরে বন্ধু ধীরে, চলো তোমার বিজনমন্দিরে'।

•

রংপুর বাসের সময় ফুরিয়ে এসেছিল। ১৯১৮ সালে আমার পিতামহ খুব অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। তখন আমরা পদ্মপুকুর রোডের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি। বেলতলা রোডের মোড়ের কাছে ল্যান্সডাউন রোডে একটি বাড়িতে থাকি। সব জিনিস তখন ভাল করে বুঝবার বয়স হয়নি, তবে লক্ষ না করে উপায় ছিল না যে, তাঁর চলাফেরা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বছরখানেক আগে তিনি কখনো কখনো সকালে আমাকে নিয়ে ল্যান্সডাউন রোডে বেড়াতে বের হতেন, পরের বছর থেকে আর পারতেন না। বিছানা থেকে উঠতেও পারতেন না। তাঁর অসুখের সময় বাড়িতে মাঝে মাঝে অল্পবয়স্ক একজন ডাক্তার, নাম বিধানচন্দ্র রায়, এবং প্রৌঢ়বয়স্ক নীলরতন সরকারকে দেখতাম। ডাক্তার নীলরতন সরকার সম্বন্ধে একটি কথা মনে আছে। তিনি খুব ধীরে ধীরে কথা বলতেন এবং অনেকক্ষণ রোগীর কাছে বসে থাকতেন। ১৯১৮ সালের শেষের দিকে কলকাতায় বেশ শীত পড়েছে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় দেখলাম আমার পিতামহের ঘরের মেঝেতে একটা ফ্রেমের মতো জিনিসে অনেকগুলো বালব জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। তখন ঘর গরম করবার আর কোনো উপায় ছিল না। শেষ রাত্রে তিনি মারা গেলেন। সকালে অনেক লোক এসেছিলেন। তাঁরা 'বেঙ্গলি' কাগজে কী বেরিয়েছে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। মেয়েরা যাঁরা এসেছিলেন আমাকে নানারকম গল্প করে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পিতামহের আমি খুব প্রিয় ছিলাম। তাঁদের মনে

হয়েছিল আমার মনকে অন্য বিষয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত। তাঁরা ভাল ভেবেই করেছিলেন। কিন্তু ছোটছেলেদের মন যতটা নাবালক মনে করা হয় তা সবসময় নয়। যাকে সাধারণত শোক বলে, আমার বোধহয় তা হয়নি, কিন্তু সমস্ত মনে কী রকম নিরাসক্তি ভাব এসেছিল। মনে হচ্ছিল বছর দুয়েক আগে তিনি কলকাতা এসে বৌবাজার থেকে আমার ও আমার ভাই অমলকে ট্রাইসাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। আর একদিন সন্ধ্যায় নিউ মার্কেট পাড়ায় একটি সিনেমায় যাওয়া হল। তার নাম এখন 'মিনার্ভা' হয়েছে। সেখানে 'লাস্ট ডেজ অব পম্পেই' দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ছবির নির্বাক যুগ, ভিসুভিয়াসের কাণ্ডকারখানা দেখে ভয় পেয়েছিলাম।

প্রায় এক বছর আমার লেখাপড়ায় খুব ব্যাঘাত হল। তারপর কলকাতার স্কুলে ভর্তি হলাম। তখন ল্যান্সডাউন রোডে থাকি। তখন দক্ষিণ কলকাতায় দুটি বড় স্কুল ছিল। একটি মিত্র ইনস্টিটিউশন, হরিশ মুখার্জি রোডে, অন্যটি সাউথ সবারবান স্কুল। দুটি স্কুলেরই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি শোনা যেত। মিত্র ইনস্টিটিউশনের অখ্যাতি ছিল যে, সেখানে শুধু বড়লোকের ছেলেরা পড়ে। তাদের ভাল করে পড়ানো হয়। মাইনের অবশ্য খুব বেশি তারতম্য ছিল না, আট আনা কি এক টাকার তফাত ছিল। সাউথ সবারবান স্কুলে বাবা আমাকে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলেন। তখন ঐ পাড়াকে চাউলপট্টি বলত। রাস্তার দু'ধারে স্কুলের দুটি বাড়ি। উত্তরের ছোট বাড়িটি নিচু ক্লাসের ছেলেদের জন্য। আমাকে সিক্সথ্ ক্লাসে, যাকে এখন ক্লাস ফাইভ বলা হয়, ভর্তি করা হল। দুটি জিনিস আমার মনে আছে। ভর্তি হবার সময় দু'একজন শিক্ষক আক্ষেপ করতে লাগলেন 'ডি' সেকশন ছাড়া আর কোথাও জায়গা নেই। পরে বুঝতে পারলাম 'ডি' সেকশনকে মাস্টারমশায়রা একটু হীন চোখে দেখতেন। 'ডি' সেকশন সবচেয়ে ওঁচা ছেলের জায়গা। পরে দেখেছি কথাটা সত্য এবং সত্য নয়। আর একটি জিনিস মনে আছে। ভর্তি হবার সময় একজন শিক্ষকের কথা আমার কাছে খুব অশিষ্ট মনে হয়েছিল। সেদিন স্বভাবতই আপিসে ভিড়। অন্য স্কুল থেকে একটি ছেলে অভিভাবকের সঙ্গে ভর্তি হতে এসেছে। ট্রান্সফার সার্টিফিকেটে লাল কালিতে হেডমাস্টারের সই দেখে এখানকার শিক্ষকটি একটু চেঁচিয়ে বললেন, 'কী দিয়ে সই করেছে, কালি না আলতা ?' এই কথা শোনামাত্র সেই শিক্ষকের উপর আমার অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব হল। মনে হল এখানকার মাস্টার মশায়রা খুব অভদ্র তো। সাউথ সবারবান স্কুলে আমার ছয় বছর কেটেছে। লেখাপড়ার ব্যবস্থা যে বিশেষ ভাল ছিল তা নয়, কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল ভাল হত। ছাত্র অনেক, তার মধ্যে ভাল ছাত্র কিছু থাকবেই। পরীক্ষার ফল হিন্দু, হেয়ার স্কুলের মতো না হলেও ভালই হত বলব।

কয়েকজন মাস্টারমশায়ের কথা নানা কারণে মনে পড়ছে। তাঁদের কথা বলছি। তাঁদের কেউই আর এতদিন পরে বেঁচে নেই। তখনকার স্কুলে মাস্টারমশায়দের মাইনে কত কম ছিল তা এখন ধারণা করা যাবে না। তাঁদের প্রায় সবাইকেই একাধিক টিউশানি করতে হত। অনেকে যখন স্কুলে আসতেন

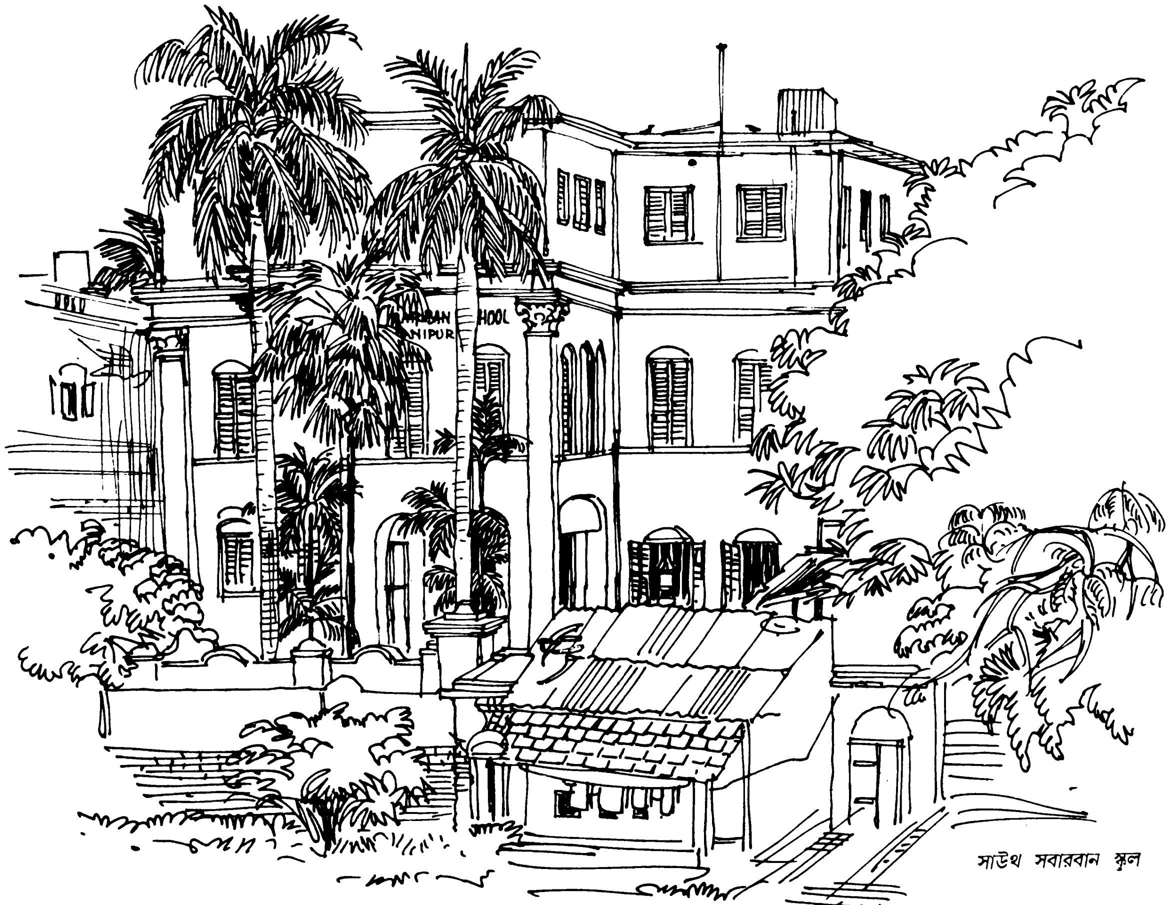

সাউথ সবারবান স্কুল

তখন আগেই ছাত্র পড়িয়ে মন ক্লান্ত এবং মেজাজ খারাপ। প্রেমেন্দ্র মিত্র একসময় সবারবান স্কুলে পড়েছেন। তাঁর অল্পবয়সের লেখায় সবারবান স্কুলের একজন ক্লান্ত শিক্ষকের কাহিনী আছে, গল্পটি প্রথমে 'কালি কলমে' বেরিয়েছিল। নিচু ক্লাসে দু'একজন শিক্ষক ছিলেন, তাঁদের কাছে সৌভাগ্যবশত আমি পড়িনি। একজনের সম্বন্ধে গল্প প্রচলিত ছিল যে, তিনি ছোটছেলেদের পকেটে হাত দিয়ে লোভনীয় জিনিস, যেমন লজেঞ্চুস, আমসত্ত্বর টুকরো, রঙিন চক প্রভৃতি পেলে বাজেয়াপ্ত করতেন। ছেলেরা বলত তাঁর বাড়ির জন্য নিয়ে যান। আর একজন ছিলেন কেদারবাবু। তাঁর সম্বন্ধে প্রবাদ ছিল যে, হেডমাস্টারমশায় রোঁদে না বেরলে তিনি নেপোলিয়নের গল্প বলে ক্লাস জমিয়ে রাখতেন। আমার দুর্ভাগ্য তাঁর কাছে কখনও পড়িনি। আর একজন শিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম জ্ঞানবাবু। তাঁর খুব সুনাম ছিল। তিনি আমাদের প্রধানত অঙ্ক কষাতেন। যারা অঙ্ক ভাল জানত তাদের পক্ষে তিনি নিশ্চয়ই ভাল ছিলেন, কিন্তু আমার মত মাঝারি ধরনের ছেলেদের জন্য নয়। এক মিনিটও সময় নষ্ট করতেন না। ক্লাসে চৌকাঠ পেরনোর আগেই বলতেন, 'রিজল্ভ ইনটু ফ্যাক্টরস', এবং ঝড়ের বেগে অঙ্ক কষিয়ে যেতেন। আমরা অনেকে যে কিছু বুঝতে পারতাম তা নয়। হরিপদ নাগ বলে একজন ছিলেন, তিনি সাধারণত মেকানিক্স পড়াতেন। আমাদের কয়েকদিন অঙ্ক কষিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল ইনি আমাদের অঙ্ক করালে বোধহয় কিছু শিখতে পারতাম। জ্ঞানবাবু কিছুদিন সেকেণ্ড ক্লাসে আমাদের ইতিহাসও পড়িয়েছিলেন। তাঁর পড়াবার রীতি একটু অদ্ভুত ছিল। মনে করা যাক, নাদির শাহর ভারত আক্রমণ পড়ানো হচ্ছে, তখন সর্বত্রই অধর মুখোপাধ্যায়ের ভারতের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি ক্লাসে ঢুকে একটি ছেলের দিকে আঙুল দেখাতেন, সে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চকণ্ঠে সেদিনকার পড়া আবৃত্তি করতে লাগল। তিনি একটি সেণ্টেন্সের মাঝখানে হঠাৎ অন্য একটি ছেলের দিকে আঙুল দেখালেন। তাকে তৎক্ষণাৎ অর্ধসমাপ্ত বাক্য যেখানে প্রথম বক্তা শেষ করেছে সেখান থেকে বলে যেতে হত। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একজন ছাত্র হয়তো বলতে আরম্ভ করল—'দি ইয়ার ১৭৬১ ইজ এ টার্নিং পয়েণ্ট ইন দি হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া ...তৎক্ষণাৎ তাঁর আঙুল ঘুরে যাওয়ায় অন্য ছাত্র বলতে শুরু করল—থার্ড ব্যাটল অফ পাণিপথ'এতে অবশ্য ছেলেদের স্মৃতিশক্তি ও অভিনিবেশের পরীক্ষা হত, কিন্তু ইতিহাসের জ্ঞান হত কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। জ্ঞানবাবুকে সবাই এত ভয় করতাম যে, তাঁর ছাত্রদের শাসন করবার দরকার হত না। তাঁর ভ্রূকুটি দেখলেই ছেলেদের হয়ে যেত, আমার একবার যেমন হয়েছিল। সেদিন বোধহয় তাঁর মন ভাল ছিল। বিনা বাধায় পড়া বলে গেলাম। তারপরেই বললেন, 'গিবনের নাম কেউ শুনেছিস ?' সে ফাঁড়াও উতরে গেলাম। তিনি বোধহয় বিশ্বাস করলেন না। বললেন, 'গিবনের বই কী রঙের বল দেখি।' আমাদের বাড়িতে 'এভ্‌রিম্যান' সিরিজের লাল কাপড়ে বাঁধানো গিবনের এক সেট বই ছিল, এখনও আছে। তিনি উত্তর শুনে খুব খুশি হয়ে বললেন, 'হল না, হল না।' গিবনের যে একাধিক সংস্করণ থাকতে পারে, এটা তাঁর খেয়াল ছিল না। যাই হোক, তাঁর বিজয়ে খুশি হয়ে তিনি এত অট্টহাস্য করতে লাগলেন যে,

আমার শারীরিক কিংবা মানসিক নির্যাতনের কথা খেয়াল করলেন না।

আর একজন মাস্টারমশায় গুরুদাসবাবুও ইতিহাস পড়িয়েছিলেন আমাদের ক'দিন। গুরুদাসবাবু যে খুব ভাল পড়াতেন তা নয়। ছাত্রমহলে দুর্নাম ছিল যে, তিনি সবসময় কর্তৃপক্ষের মন জুগিয়ে চলবার চেষ্টা করেন। তিনি ক্লাসের ছাত্রদের কয়েকটিকে ভাল ছেলে বলে বেছে নিতেন এবং তাদের স্নেহে অভিষিক্ত করে পড়াতেন। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করায় উত্তর দিতে অসুবিধা হলে সঙ্গে সঙ্গে নিজেই উত্তর দিয়ে দিতেন এবং বলতেন, 'বেশ ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে।' আমার বন্ধু চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হয়েছিল এবং গবেষণায় নাম করেছিল। তার সঙ্গে গুরুদাসবাবুর এইরকম কথাবার্তা হত। মাস্টারমশায় প্রশ্ন করলেন, 'চারু, বল তো বাবা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কোন সালে হয়েছিল?' চারু উত্তর দিতে একটু ইতস্তত করছে দেখে তিনি বললেন, 'কেমন, ১৭৬১ সালে না? দেখলে তো কেমন পড়া শিখে এসেছে।' বলা উচিত তাঁর এই স্নেহ থেকে আমিও বঞ্চিত হইনি। ভাল ছেলে ও খারাপ ছেলের তফাৎ আর একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতেন। যেমন, চারুর বাবা কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে বললেন, 'চারু, আজ তুমি বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিও না। তোমার বিয়ে, তোমাকে দেখতে আসবে।' চারু বললে, 'যে আজ্ঞে।' চারুর উত্তর অনেকটা দেবী চৌধুরানীর ব্রজেশ্বরের মতো। আর অন্য দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য প্রিয়মোহন নামে একটি 'খারাপ' ছেলেকে দাঁড় করিয়ে বলতেন, 'প্রিয়মোহন, তুমি বাড়ি থেকে বেরিও না। তোমাকে দেখতে আসবে।' প্রিয়মোহন বললে, 'কেন বাবা, আজ আমার খেলতে যাবার কথা আছে।' গুরুদাসবাবু নিজের মুখে প্রিয়মোহনের এই কাল্পনিক উত্তর দিয়ে ক্রুদ্ধচোখে প্রিয়মোহনের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তবে একটি কারণে গুরুদাসবাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয়েছিল। কেন বলছি। গুরুদাসবাবু থাকতেন এখন যেখানে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ হয়েছে তার কাছে। একদিন গিয়ে দেখি একটা ঘরে ঠাসাঠাসি ইতিহাসের বই। সে বই কে পড়তেন জানি না। মনে আছে তাঁর বাড়ি থেকে 'হোয়েন কিংস রোড টু দিল্লি' নিয়ে এসেছিলাম। বড় সাইজের বই, বড় অক্ষরে ছাপা। তখন এই বই অনেকেই পড়তেন। ভূধর মুখোপাধ্যায় নামে একজন মাস্টারমশায় ছিলেন। তিনি সাধারণত বাংলা পড়াতেন। তাঁর নিজের সাজপোশাকের উপর খুব নজর ছিল। ইচ্ছা হলে ভাল গল্প করতে পারতেন, ভাল অভিনয় করতেন। তখন নির্বাক ছায়াছবির যুগ। কিছু টাকা তুলে তাঁর নিজের লেখা একটি বই, 'পাপের দংশন', ছবি করতে শুরু করেছিলেন। ছবি শেষ করতে পারেননি। সাউথ সবারবান স্কুল থেকে অবসর নিয়ে ভবানীপুরের অন্য একটি স্কুলে হেডমাস্টার হয়েছিলেন। আরও দু'একজন মাস্টারমশায়দের কথা বলি। যেমন, অধরবাবু—পুরো নাম ভুলে গেছি। তাঁর বয়স হয়েছিল, চুল দাড়ি পেকে গিয়েছে, ঋষিতুল্য চেহারা। অধরবাবু আমাদের বেশিদিন পড়াননি। পড়ানো ছাড়া আরও অন্য কথা জিজ্ঞাসা করতেন। সাউথ সবারবন স্কুলে তখন একটি প্রাচীন প্রথা নিচু ক্লাসে প্রচলিত ছিল, ক্লাসের ছেলেদের তাদের যোগ্যতা অনুসারে বসানো হত। ভাল পড়া বলতে পারলে অনেকে হয়ত থার্ড বেঞ্চি

থেকে প্রথম বেঞ্চে গিয়ে বসল, আবার পরের ঘণ্টায় অঙ্ক ভুল করলে তাকে হয়তো শেষের বেঞ্চিতে গিয়ে বসতে হত। একদিন অধরবাবু ক্লাসে এসেই জিজ্ঞেস করলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে কী করা উচিত ? একথা সেদিনকার সংস্কৃত পাঠের মধ্যে ছিল না। আমরা নানারকম উত্তর দিতে লাগলাম। আমরা বললাম, হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসা উচিত। মাস্টারমশায় খুশি হলেন না। একজন সাত্ত্বিক ছাত্র বলল, 'পিতামাতার চরণ বন্দনা করা উচিত।' অধরবাবু মনে হল দাড়ির মধ্যে অল্প হাসলেন, কিন্তু বললেন, ঠিক হয়নি। তারপরে রুচিভেদে নানারকম উত্তর আসতে লাগল। যারা শরীর চর্চায় খুব উৎসাহী তাদের কেউ বলল, ভিজে ছোলা। কেউ বলল, আলো চাল আর এক গ্লাস জল। একজন মোহমুদ্গর আবৃত্তি করার কথা বলতে লাগল। অধরবাবু কোনো ফাঁদেই ধরা দিলেন না। এমন সময় শেষ বেঞ্চি থেকে একটি ছেলে, তাকে আমরা কোনোদিন কেউ লক্ষ্যই করতাম না, বলল, 'ভগবানের নাম নিতে হয়।' অধরবাবু বললেন, 'ঠিক হয়েছে।' সে ক্লাসে ফার্স্ট পজিশনে গিয়ে বসল। অধরবাবু বলতে পারতেন, সকলের কান মলে দিয়ে এসো। এ শাস্তিও তখন প্রচলিত ছিল, কিন্তু দয়া করে সেটা বলেননি। সেদিন তবু সেই ছেলেটির জন্য আমাদের মান রক্ষা হয়েছিল। আর একদিনের অবস্থা আরও খারাপ। অধরবাবু মুনি-ঋষিদের কথা কী বলছিলেন, হঠাৎ তিনি বললেন, 'একজন সাধুর কাছে যেতে হলে কী নিয়ে যেতে হয় ?' আমরা রুচিমতো বলতে লাগলাম। কেউ বললে বেল ; কেউ আমলকী, কেউ আপেল, কেউ কমলালেবু বলল, যার যা ইচ্ছা। আম-কাঁঠাল কেউ বলেছিল কি না মনে নেই। যখন আমরা সবাই ভুল উত্তর দিতে দিতে এবং অধরবাবু শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তখন তিনি বললেন, 'সাধুসন্ন্যাসীর কাছে যেতে হলে একটু গাঁজা নিয়ে যেতে হয়, এটা জানো না !' মনে আছে গাঁজাকে তিনি 'গ্যাঁজা' উচ্চারণ করেছিলেন। শুনে খুব হাসি পেয়েছিল, কিন্তু ভয়ে হাসতে পারলাম না। যাই হোক, অধরবাবু আমাকে কিছুদিন সন্ধি, সমাস পড়িয়ে বিদায় নিলেন। আমাদের সঙ্গে বেশিদিন তাঁর সম্পর্ক ছিল না।

অনেক গুরুনিন্দা হয়ে গেল। আর একজনের কথা বলে আপাতত শেষ করব। এঁর আসল নামটি বলব না। ধরা যাক তাঁর নাম হীরেনবাবু। হীরেনবাবুর কাছে আমি ঠিক পড়িনি। অল্প কয়েকদিন তিনি ক্লাস নিয়েছিলেন। একবার বার্ষিক পরীক্ষায় একটা খুব বড় ম্যাপ এনে আমাকে 'মাও' দেখাতে বলেছিলেন, আমি পারিনি। ছেলেরা তাঁর সম্পর্কে অনেক অপবাদ দিত। পরীক্ষার সময় স্কুলের দেওয়া যে কালিতে লিখতে হত সে কালি লিখবার সময় হলদে দেখাত, শুকিয়ে গেলে কখনও কালো হত, কখনও হত না। ছেলেরা বলত এই কালি কাগজ ইত্যাদি হীরেনবাবু স্কুলকে জোগান দেন। একবার, বোধহয় তাঁর অসুখ করেছিল। ক্লাসে এসে একটা শিশি বের করে এক ঢোঁক কী খেলেন। আমাদের মনে হল জোয়ানের আরক কিংবা ঐরকম কিছু। কিন্তু ক্লাসের প্রথম বেঞ্চি থেকে শেষ বেঞ্চি অবধি একটি চিরকুট চলে গেল, তাতে লেখা,'হীরেনবাবু কী খাইল ?' আরও দু'একজন ছিলেন, যেমন পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি

বাড়িতেও আমাকে কিছুদিন পড়িয়েছিলেন। মানুষ খারাপ ছিলেন না কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর অনুরাগ সবচেয়ে কম ছিল। তিনি সবসময় নিজের স্বাস্থ্য ও শারীরিক উন্নতির কথা ভাবতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল সাঁওতাল পরগনার জল থেকেই সবার উপকার হবে। তা সে যে-জলই হোক্। একবার তিনি ঝাঝা থেকে শিমুলতলা হেঁটে এসেছিলেন। অনেক বয়স পর্যন্ত ভবানীপুর-বালিগঞ্জ অঞ্চলে সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

অন্যরকম মাস্টারমশায় যে ছিলেন না তা নয়। তাঁদের কথা স্পষ্ট মনে আছে, এবং তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতারও শেষ নেই। সুরাজ রায়চৌধুরী বলে একজন ছিলেন। তাঁর চুল একটু কটা, চোখের রং কটা এবং একটি চোখ অল্প ট্যারা। কোন্‌দিকে তাকিয়ে আছেন বোঝা যেত না। তিনি পরীক্ষার হলে ইনভিজিলেটর হলে ছেলের দল খুব শঙ্কিত থাকত। তিনিই প্রথম আমাকে ইউরোপীয় ইতিহাসের বই পড়তে উৎসাহিত করেছিলেন। স্কুলে ভাল লাইব্রেরি ছিল না। মাস্টারমশায়দের ঘরে কিছু বই আলমারিতে গাদা করা থাকত। উপরের ক্লাসের ছেলেরা অবশ্য পড়তে পারত। কিছু নিয়মকানুন ছিল, সেসব সবাই জানত না। একদিন সেই ঘরের দরজার কাছে গিয়েছি, সুরাজবাবু আমাকে ডেকে বললেন, 'ভেতরে এসো।' তারপর আঙুল দিয়ে একটা আলমারি দেখিয়ে বললেন, 'এটা খোলো।' দেখলাম আলমারি ভর্তি বড় টাইপে ছাপা, বাঁধানো অনেক রঙিন ছবি দেওয়া বই। যে-বই বেছে বার করলাম সেটা ইতিহাসের বই। তখন ব্ল্যাকি কোম্পানি এই ধরনের অনেক বই বার করত। টুকরো টুকরো সামান্য ইংরেজি ইতিহাসের গল্প ছাড়া আর বিশেষ কিছু বাংলায় পাওয়া যেত না। সেটা ১৯২২/২৩ সাল হবে। এই বই আমার কাছে হল নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের মতো। আমার বয়সী ছেলেদের চেয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস অনেক বেশি পড়েছিলাম। অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজদ্দৌল্লা' ও 'মীরকাশিম' ভাল করে পড়া ছিল। চণ্ডীচরণ সেনের 'মহারাজ নন্দকুমার' ভাল করে পড়েছিলাম। বিশ্বাস করতাম অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী নিছক কল্পনা। সব জিনিস যে ভাল করে বুঝেছিলাম তা নয়। ভাসা ভাসা পরিচয় ছিল। এইবার ইয়োরোপের ইতিহাসে প্রবেশ করলাম। সুরাজবাবুর কাছে যে আমি কতখানি কৃতজ্ঞ, সেকথা তিনি কখনও বুঝতে পারেননি। তারপরে অনেক বই এই আলমারি থেকে নিয়ে এসেছি। রাত জেগে পড়তাম ও ছবি দেখতাম। সুরাজবাবু প্রথম প্রথম সন্দেহ করতেন এত তাড়াতাড়ি কী করে বই শেষ হত। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন। সুরাজবাবুর বাড়িও একদিন গিয়েছিলাম, কিন্তু তার কারণ অন্য। একবার এ্যানুয়াল পরীক্ষায় ভূগোলে যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে কম নম্বর পেয়েছিলাম। বাংলাতেও তাই। বাংলা খাতা যিনি দেখেছিলেন তাঁকে সেই কথা বলতে তিনি খাতা স্কুলে নিয়ে এসে কেটে নম্বর বাড়িয়ে দিলেন। আমাকে বললেন, 'এ নিয়ে আর হেডমাস্টারের কাছে যাবি না।' তখন বোধহয় খুব সরল ছিলাম। পরে মনে হয়েছে খাতার নম্বর তো বদল হল, কিন্তু স্কুলের যে আসল মার্কসের খাতা তাতে নিশ্চয় বদল হয়নি। সুরাজবাবুকে যখন বললাম, ভূগোলে এর চেয়ে বেশি নম্বর আশা করেছিলাম তখন তিনি বললেন, শনিবার স্কুলের পর

একদিন আমার বাড়ি আসিস। তিনি তখন বলরাম বোস ঘাট রোডে থাকতেন। তখন শীতকাল। পরের শনিবার দুপুরে স্কুল থেকে তাঁর বাড়ি গেলাম। দেখলাম আমার বয়সী একটি মেয়ে পায়রাকে খেতে দিচ্ছে। সুরাজবাবু আমাকে দেখে খাতার বাণ্ডিল পাড়লেন, বললেন, 'তোর খাতা বেছে নে।' খাতা বের হলে তিনি আমাকে বললেন, 'দ্যাখ কী লিখেছিস।' আমি বললাম, 'ঠিকই তো লিখেছি।' তিনি বললেন, 'না। তোর বইয়ে আরও অনেক জিনিস আছে।' আমি বললাম, 'আছে, কিন্তু সে সব তো জিজ্ঞেস করা হয়নি।' তিনি বললেন, 'সব লিখবি। তা নাহলে বুঝব কী করে তুই সব পড়েছিস?' আমি কিছু বললাম না বটে কিন্তু আমার মনে হল বেণী চাইলে 'বেণীর সঙ্গে মাথা' দিতে হবে এমন কথা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। পরে দেখেছি এই রকম উত্তর দেওয়াই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিরাপদ। এসব সত্ত্বেও বলছি যে, সুরাজবাবু একাই সাউথ সবারবান স্কুল সম্পর্কে আমার মনে অনুরাগ সৃষ্টি করেছিলেন। সুরাজবাবু সম্পর্কে যা বলেছি তাতে একথা স্পষ্ট হবে যে সাউথ সবারবান স্কুলে কয়েকজন ভাল শিক্ষক ছিলেন। কয়েকদিনের জন্য বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন। তিনি অল্প দিন পরে কোন্ কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। আমরা খুব ঘটা করে তাঁকে বিদায় দিয়েছিলাম। তিনি পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু কোথাও শিক্ষকতার জন্য নাম হয়নি। আরও দু'একজনের কথা বলছি। যেমন, তারাপদ চৌধুরী। তিনি বোধহয় এই স্কুলে প্রথম বি· টি। এ নিয়ে মাস্টার-মহলে একটু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি আস্তে আস্তে, বিশেষ করে স্কুল ছাড়বার পর, আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। ঘোরতর রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। যে আলোচনাই আরম্ভ হোক রবীন্দ্রনাথে এসে শেষ হত। এখনকার পূর্ণ থিয়েটারের ঠিক উল্টো দিকে একটি গলিতে কয়েকজন মাস্টারমশায় মেস করে থাকতেন। এই মেসবাড়িতে অনেকবার তারাপদবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। পরে তিনি টালিগঞ্জের দিকে বাড়ি করে উঠে গিয়েছিলেন।

উপরের ক্লাসে ইংরেজি পড়াতেন রাজেনবাবু। তাঁর কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। খুব যে ভাল পড়াতেন, তা নয়। কিন্তু ভাল লোক ছিলেন। চোখের খুব কাছে বই ধরে পড়াতেন। নোট দিতে ভালবাসতেন। না দিলেও ক্ষতি হত না। অনেক বড় মাপের ইংরেজি শব্দ আমাদের শিখিয়েছিলেন। অভিধান দেখে কথার সবার অর্থ লিখে আনতে হত।

স্কুল যখন ছেড়ে আসছি, তখন মনোজ বসু পড়াতে এলেন। তখন তাঁর অল্প বয়স। আর এক বছর পরে পাস করলেই তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র হতাম। একটি উপন্যাসে তিনি এই স্কুলের মাস্টারমশায়দের নিয়ে লিখেছেন। মানুষ গড়ার যাঁরা কারিগর ছিলেন তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে চিনে নেওয়া যায়। বিশেষ করে রণেন্দ্র গুপ্ত বলে একজন সংস্কৃত শিক্ষককে। তাঁর চালচলন ঠিক পণ্ডিতমশায়দের মতো ছিল না। ছেলে বয়সে শরীরচর্চা করতেন মনে হত। সাধারণত হাতা গুটিয়ে আদ্দির পাঞ্জাবি পরতেন। কালিকা কেবিন বলে রসা রোড ও চাউলপট্টি রোডের মোড়ে যে চায়ের দোকান ছিল, সেখানে ছুটির পর চা আর চপ খেতেন। আমাদের বলতেন, 'তোদের পড়াতে পড়াতে গলায় রক্ত

উঠে আসে।'

অতটা শক্তিক্ষয় তাঁর করবার দরকার হত না। কিন্তু রণেনবাবু যত্ন করে পড়াতেন। দুঃখের বিষয় আমরা যে সেকশনে ছিলাম সেখানে কদাচিত আসতেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখানোর তাঁর একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল। ছড়া করে ব্যাকরণের নিয়মগুলিকে মুখস্থ করিয়ে দিতেন। ধাঁধার মতো। চট করে তার অর্থ বোঝা যেত না। দুটি লাইন, এখনও আমার মনে আছে—

আমেদপুরের বাঁদিগুলো বদমাইসি ছেড়ে
চন্দ্র পরাণ সত্য হরি দয়াল হল উড়ে।

এর অর্থ কী? তখন জানতাম না। এখন তো জানবার উপায় নেই।

মাস্টারমশায়দের কথা বলতে গেলে ফুরবে না। পরে আমার অনেকবার মনে হয়েছে যে, আমরা যেসব অসুবিধায় পড়েছিলাম তার কারণ স্কুলে হাল ধরবার কেউ ছিল না। যখন ভর্তি হই, তখন হেডমাস্টার ছিলেন দেবকিশোরবাবু। তাঁর ভাই ব্রহ্মকিশোরবাবু ছিলেন হিন্দু স্কুলের নামজাদা হেডমাস্টার। আমার ভর্তি হবার অল্প কিছুদিন পরে দেবকিশোরবাবুর অবসর নেবার সময় হল। তারপর বহুদিন পর্যন্ত সাউথ সবারবান স্কুলে কোনো প্রকৃত হেডমাস্টার ছিলেন না। আমরা যখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছি, তখন নলিনীমোহন সান্যাল এলেন। তিনি ভাষাতত্ত্ববিদ এবং পণ্ডিত লোক। তখন খুব বৃদ্ধ হয়েছেন, চোখে ভাল দেখতে পেতেন না, কানেও ভাল শুনতে পেতেন না। তার ফল আমাদের ভুগতে হত। কখনও রাধেশ্যাম বলে একটি ছাত্রকে অপরাধ করতে দেখে ঘনশ্যামকে শাস্তি দেবার কথা ভাবতেন এবং পুলিন বলে কাউকে দেখলে কানাই বলে ভাবতেন। যাই হোক,এইসব গোলমালের মধ্যে আমার স্কুলে পড়ার দিন প্রায় শেষ হয়ে এল।

স্কুলের খারাপ দিক অনেকটা বলেছি, কিন্তু ক্ষতি যেমন ছিল তেমনি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা যে একেবারে ছিল না তা নয়। স্কুলে যাঁরা শেখান কিংবা ভুল্ শেখান তাঁরা শুধু মাস্টারমশায় নন, সহপাঠী এবং সঙ্গীরাও। বলেছি যে, ভর্তি হবার সময় শুনেছিলাম আমি যে সেকশনে পড়ি সেটা একটি ওঁচা সেকশন। ভাল মাস্টারমশায়েরা অনেকে আমাদের পড়াতেন না। কিন্তু যাদের সঙ্গে পড়তাম তাদের মধ্যে অনেক ভাল ছেলে ছিল। নানা দিক দিয়ে ভাল, শুধু লেখাপড়ার কথা বলছি না। যখন ভর্তি হলাম তখন একটি ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। তার নাম পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়। তার বাড়ির সামনে দিয়ে স্কুলে যাবার রাস্তা। কাজেই অনেক সময় তার বাড়ি হয়ে তার সঙ্গে স্কুলে হেঁটে যেতাম। পরেশ আমাদের ক্লাসে ফার্স্ট হত। প্রবন্ধ লিখতে গেলে প্রায়ই তার লেখার মধ্যে অক্ষয় দত্তর ছাপ থাকত, বিশেষত প্রথম প্যারাগ্রাফে। এখন মনে হচ্ছে তার ক্লাসের জন্য লেখা এমন প্রবন্ধ পড়িনি যার প্রথমদিকে লেখা 'পরমকারণিক পরমেশ্বরের' কথা না থাকত। পরেশের বাবা কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানিতে ভাল চাকরি করতেন এবং তখনকার অভিভাবকদের চেয়ে অনেক ভাল ছিলেন। কলকাতার স্কুলে এসে একটি রীতি চোখে পড়েছিল যে, কোনো ছাত্র সহপাঠীকে বাড়ি যেতে বলত না। গেলেই তাকে এবং তার সহপাঠীকে

পিতৃরোষে পড়তে হবে। পরেশদের বাড়ি এর ব্যতিক্রম ছিল। পরেশের বাবার নাম তপনতাপ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর নামের সঙ্গে তাঁর স্নিগ্ধ ব্যবহারের কোনো মিল ছিল না। স্কুল ছাড়বার পর পরেশ সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হয়। আমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। পরেশ পরে কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি হয়েছিল। সবার নাম মনে থাকা সম্ভব নয়। আর একজনের কথা বলতেই হবে, তার নাম অমলেন্দু সেন। সে আমাদের সঙ্গে এক সেকশনে পড়ত কিনা মনে নেই। ক্লাসে আমি সবার চেয়ে ছোট ছিলাম, এক অমলেন্দু ছাড়া। অমলেন্দু সব বিষয়েই ভাল জানত এবং সব রকম বই পড়ার তার অভ্যাস ছিল। এই বোধহয় তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সূত্র। তাদের চাউলপট্টির বাড়িতে আমার অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। অমলেন্দু কুড়ি-পঁচিশ বছর অসুস্থ ছিল। কিন্তু কখনও তার মুখ ম্লান দেখিনি। এরকম মনের জোর আর কারও আছে বলে আমার জানা নেই। সোমনাথ লাহিড়ী নামে একজন ছেলের সঙ্গে পড়তাম। ভাল ছবি আঁকতে পারত, পরে এঞ্জিনিয়ার হয়। আর একজনের নাম অনেকের কাছে একসময় পরিচিত ছিল, হিরণ্ময় ঘোষাল। বাড়ি ভাটপাড়া, এখানে থাকত বেণীনন্দন স্ট্রীটে, পুলিশ হাসপাতালের উলটো দিকে। এই বাড়িতে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় পরে বাস করতেন। হিরণ্ময় সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা ভাল জানত। কলেজে পড়বার সময় ফরাসি ভাষা ভাল করে শিখেছিল। পরে পোলিশ, রাশিয়ান এবং আরও কিছু ইউরোপীয় ভাষা শিখেছিল। স্বাধীনতার পর কিছুদিন ভারত সরকারের বড় কাজ করেছিল, কিন্তু সরকারি কাজ তার পছন্দ হল না। কাজ ছেড়ে দিয়ে আবার সে পোল্যাণ্ডে চলে গেলে। আমার সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি। তার লেখা বই 'মহত্তর যুদ্ধের ইতিহাস', কিংবা 'হাতের কাজ' কিছুই এখন পাওয়া যায় না।

আর একজনের কথা মনে হচ্ছে, ভুজঙ্গ রায়চৌধুরী। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন আরম্ভ হলে চরকা চালানো, নাইট স্কুল করা, এসবে অনেকের উৎসাহ ছিল। বেশির ভাগ জায়গায় এই উৎসাহ ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু ভুজঙ্গর কথা আলাদা। কিন্তু তার একটি মানবোচিত দুর্বলতাও ছিল যার জন্য আমরা তাকে পছন্দ করতাম। ভুজঙ্গ লেখাপড়ায় ভাল ছিল, শখ করে বাংলা লিখত। একদিন ক্লাসে তার পাশে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি সংস্কৃত কি অন্য কোনো ক্লাসে তার বইয়ের তলায় অন্য একটা বই উঁকি দিচ্ছে। সেটি একটি গোয়েন্দা উপন্যাস। বোধকরি পাঁচকড়ি দে প্রণীত 'হরতনের নওলা' গোছের কিছু। আমি পড়বার ব্যাপারে খুব উন্নাসিক ছিলাম। এসব বই বিশেষ পড়তাম না, তবে গুপ্তপ্রেস ও পি এম বাগচীর পঞ্জিকায় অনেক সচিত্র বিজ্ঞাপন দেখেছি। মাস্টারমশায়ের চোখ এড়িয়ে কয়েক লাইন পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। অসুবিধা হল যে, আমার পড়া এবং ভুজঙ্গের পড়বার গতি একরকম নয়। তার উপর মাস্টারমশায়ের চোখ এড়িয়ে দু'জনে মিলে পড়া খুব কষ্টকর। কাজেই বেশিদিন এরকম ঘনিষ্ঠতা থাকল না, তবে চিরকালই তার সঙ্গে ভাব ছিল। ১৯৭০ সালে অর্থাৎ এর প্রায় ষাট বছর পরে যখন বিশ্বভারতীতে যাই তখন সেই কালীঘাটে ভুজঙ্গের বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম। দেখলাম বিশেষ বদলায়নি, ভুজঙ্গ প্রায় সেইরকম আছে।

ভুজঙ্গর ঘরের সামনে একটা বড় বারান্দা, সেটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজে ব্যবহার হয়, সাজসরঞ্জাম রয়েছে। মনে হল ভুজঙ্গ সংসারী হয়েছে, কিন্তু দেশসেবায় ভাটা পড়েনি। এখনও পাঁচকড়ি দে'র বই পড়ে কি না জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হল না।

আমার স্কুলের একজন সহপাঠীর কথা বলব, বীরেন মুখোপাধ্যায়। খুব নিচু ক্লাস থেকে আমরা একসঙ্গে পড়েছি। তার বাবার নাম জ্যোতি বাচস্পতি। এ-নাম কি এখন কারুর স্মরণ আছে ? ইনি বোধহয় প্রথম বাংলায় জ্যোতিষ সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা বার করেন। কিন্তু একথা বললে যথেষ্ট বলা হল না। তাঁর অনেক বিষয়ে উৎসাহ ছিল। ফরাসি জানতেন। অন্তত একটি ফরাসি নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। সাউথ সবারবন স্কুলের পিছন দিকে তাঁর বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতেই আমি প্রথম সিনে-ক্যামেরা দেখি। সে বোধহয় ১৯২০-২১ সাল।

বীরেন অঙ্কে আমার মতো কাঁচা ছিল। একদিনের কথা মনে আছে। অঙ্ক পরীক্ষার দিন দশটার সময় আমাকে স্কুলের বাড়ির তেতলায় নিয়ে গেল। তখন ঘরবাড়ি এত হয়নি। দক্ষিণে কালীমন্দিরের চুড়ো দেখা যেত। সেদিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'হে মা কালী, এই বার পাস করিয়ে দাও। নতুন ক্লাসে মন দিয়ে পড়াশুনো করব।' তার পরীক্ষার ফল কী রকম হয়েছিল আমার মনে নেই। চাকরি জীবনেও তার সঙ্গে আমার খুব কম দেখা হয়েছে। তার অবসর নেবার পর আবার পুরনো বন্ধুত্ব সঞ্জীবিত হল। শান্তিনিকেতনে গিয়ে সে কয়েকদিন আমার কাছে ছিল। তখন পুরনো বালক-কালকে আবার ফিরে পেয়েছিলাম।

স্কুলে পড়বার সময় একটি ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। ছিপছিপে রোগা চেহারা। তার আসল নাম যাই হোক ক্লাসের ছেলেরা তাকে 'ঢ্যাঁড়স' বলে ডাকত। কেন বলা হত কেউ জানত না। রোগা ছেলে তো স্কুলে অনেক ছিল। তাদের তো কেউ ঢ্যাঁড়স বলত না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কোনো তার অর্থ নাই, সেই তার খোঁচা।' এই লাইন পড়ে আমার ঢ্যাঁড়সের কথা মনে হয়েছিল। তার আসল নাম সত্যব্রত দত্ত, বকুলবাগানে বাড়ি। সত্যব্রতর ছোট ভাই সবিতাব্রত দত্ত। সবিতাব্রত যখন 'ব্যাপিকা বিদায়ে' অভিনয় করে খুব নাম করেছে, তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সবিতাব্রত আমাকে প্রণাম করে বলল, 'আমার দাদার সঙ্গে আপনি স্কুলে পড়তেন।' এই বলে বাড়ির ঠিকানা বলল। উত্তেজনায় আমি সত্যব্রতর নাম ভুলে গেলাম। সবিতাব্রতকে বললাম, 'ও তুমি ঢ্যাঁড়সের ভাই!'

মানুষের জীবনের ছয়-সাত বছর বেশি সময় নয় কিন্তু তার মধ্যে একজনের মনের কাঠামো তৈরি হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন ছেলেবেলা প্রকৃতপক্ষে খুব দুঃখের সময়। এই কথা আংশিক সত্য। কিন্তু এক ধরনের গাছ আছে যার জন্য বেশি মাটি দরকার হয় না। সামান্য মাটি কিংবা সারই তার পক্ষে যথেষ্ট। তাতেই ফুল ফোটে। আমাদের ছেলেবেলাও অনেকটা সেই রকম। অল্প

জিনিসেই তার সুখ ও আনন্দ, আনন্দের উপাদানের আমাদের কি কোনো সীমা ছিল ? রবীন্দ্রনাথ সুখের দিনকে সোনালি বর্ডার দেওয়া লেফাফায় ভরা চিঠির সঙ্গে তুলনা করেছেন। সোনালি বর্ডার দেওয়া লেফাফা সবার ভাগ্যে জোটে না। কিন্তু ছেলেবেলার প্রতিটি দিনকেই এক একটি নতুন চিঠির মতো পাওয়া যায়। আনন্দের উপকরণ সব জায়গাতেই ছড়ানো। অনেক দিন আগে বাবা যখন স্কুলে পড়তেন তখন রংপুরে আমাদের বাড়ি থেকে হাতে লেখা একটি কাগজ বেরত। তার নাম 'ফুল'। অনেক দিন পর্যন্ত তার বাঁধানো সংখ্যাগুলি আমাদের বাড়িতে ছিল। এখনও দু'এক খণ্ড অবশিষ্ট আছে। আবার আমার স্কুলে পড়বার সময়েও একটি কাগজ অনিয়মিত ভাবে বেরত। তার নাম 'কণা'। নামটি যে ভাল হয়েছিল সেকথা তখনও মনে করিনি। এটি পারিবারিক কাগজ হলেও এতে অনেকে লিখতেন। হিরণ্ময় ঘোষালের কিছু লেখা এতে বেরিয়েছে। তার আত্মীয় পঞ্চানন ঘোষাল, যিনি এখন অপরাধ বিষয়ে লেখেন, তিনি তখন এম· এসসি· পড়তেন এবং এই কাগজে জুলজির প্রবন্ধ লিখতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রর বিখ্যাত কবিতা 'নমো নমো নমো' এই পত্রিকায় বেরিয়েছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের একটি বড় লেখার টুকরো এতে বেরিয়েছিল। অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় কবিতা লেখায় হাত মকশো করেছিলেন এই কাগজে। সাউথ সবারবান স্কুলের একজন মাস্টারমশায় শান্তিনিকেতনের ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন। দুই ভাই—সুরেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী ও ধীরেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী অলংকরণের কাজ করতেন। সোমনাথ লাহিড়ী ও আমার আর একজন সহপাঠী অনিল মুখোপাধ্যায় ছবি আঁকতেন। এই কাগজ নিয়ে যখন মেতে আছি, তখন খবর পেলাম যে, স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে একজন সত্যিকারের কবি ভর্তি হয়েছে। তার নাম ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। খবর পেয়েই কবিকে দেখতে গেলাম। কী আশা করেছিলাম বলতে পারি না। গিয়ে দেখলাম একজন বেঁটে শ্যামবর্ণ আমাদের বয়সী ছেলে, মাথার চুল পাতলা। পরে শুনলাম তার ডাকনাম যতু। ঠিক কবির মতো নাম নয়। ছন্দের উপর তখনই তার খুব দখল ছিল। এখন আর বেশি কবিতা লেখে না, বোধহয় মিল না দিয়ে লেখা তার পক্ষে সহজ নয় বলে। এখন ছেলেমেয়েদের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখে। ক্ষিতীনের বাবা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বহুদিন পাঞ্জাবে ছিলেন। অবসর নিয়ে দক্ষিণ কলকাতায় টাউনসেণ্ড রোডে বাস করতে লাগলেন। সাহিত্যিক পরিবার। বিশ্বেশ্বরবাবু 'বঙ্গবাণী' এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। ক্ষিতীনের দাদা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ছেলেদের জন্য তিনি একটি জাপানি ডিটেকটিভ আমদানি করেছিলেন। তার নাম হুকাকাশি। তখন ছেলেমেয়েরা অনেকেই হুকাকাশির গল্প পড়ত। এখন বোধহয় অত পড়ে না। ক্ষিতীনের দিদিরাও কবিতা লিখতেন। এখন ক্ষিতীনের মেয়ে সুচেতা কবিতা লিখছে। ক্ষিতীনেরও তখন হাতেলেখা একটি কাগজ ছিল, তার নাম 'রামধনু'। আমাদের 'কণা' কাগজে এবং ক্ষিতীনের 'রামধনু' কাগজে রেষারেষি ছিল। এক কাগজে অন্য কাগজের কঠোর সমালোচনা বেরত। পরবর্তীকালে ক্ষিতীনদের প্রেস থেকে রামধনু ছাপিয়ে বেরতে লাগল, আমরা হেরে গেলাম। কমলকুমার

চট্টোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে পড়ত। পরে লিগ অব নেশন্‌স-এ চাকরি নিয়ে বোম্বাই গিয়েছিল। বোম্বাইয়ে তার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে। কমলকুমার চট্টোপাধ্যায় পরে নিজেকে কমলকুমার বলত। ছায়াছবির অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের বড় ভাই, এই পরিচয় দিলে অনেকে হয়তো চিনবেন।

স্কুলের কয়েক বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। মানুষের আয়ুকে সেকালের কবিরা সবসময় নদীর সঙ্গে তুলনা করতেন। সেই তুলনা মেনে নিলে বলা যায় প্রথম জীবন ঝর্নার মতো, তখন খুব বেগ থাকে। আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণ বড় বেশি দেখিনি। দু'একবার দেখেছি মাত্র। দু'তিনবার ছেলেদের অভিনয় হয়েছে। এসবেও মাস্টারমশায়দের অনেকেই খুব উদাসীন ছিলেন। সুখ যে কী, তা ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। তাহলেও আনন্দ পাওয়ার অনেক উপকরণ স্কুলের মধ্যে ছিল। স্কুলের পুবদিকের গলি দিয়ে প্রায় চারটের সময় একজন বাসনওয়ালা ঠং ঠং করে বাসন বাজিয়ে হেঁকে যেত। কাঁসার বাসনের ব্যবহার উঠে গিয়েছে। এখন কলকাতার রাস্তায় কাঁসার বাসনওয়ালা নেই। যদি কোনোদিন তার আসতে দেরি হত, ক্লাসসুদ্ধ উসখুস করতাম। স্কুলের একটি কর্মী ছিল, তার নাম সতীশ। তাকে পিয়ন বলতে দ্বিধা হয়, অথচ সে কেরানিও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি। একটু অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসত। আমাদের মাসের মাইনে, ফ্যান্ ফি ক্লাসেই জমা দিতে হত। সতীশ দুপুরের আগে একবার এসে সেই টাকা থলেতে করে নিয়ে যেত। আর একবার বিকেলের দিকে সতীশের দেখা পেতাম, স্কুল ছুটি হবার অল্প আগে। ক্লাসে এসে রেজিস্টার দিয়ে যেত না নিয়ে যেত আমার মনে নেই। তখন দুঃসাহসী ছেলেরা অস্ফুট কণ্ঠে সতীশকে জিজ্ঞেস করত, ছুটি হতে কত দেরি ? ঘড়িতে তখন যে সময়ই থাক, সতীশ সব সময় বলত, পনের মিনিট। পনের কথাটা অদ্ভুত ভাবে উচ্চারণ করত। পাঁচ মিনিট বা কুড়ি মিনিটই বাকি থাকুক, ছেলেরাও জানত কী উত্তর হবে। তবু পনের কথাটা শুনবার লোভ কেউ ছাড়তে পারত না। আমার নিজের কাছে একটি বড় আনন্দের বিষয় ছিল স্কুলের হাতায় একটি বড় বটগাছ। তখন স্কুলের পিছন দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে ঢোকবার একটি খিড়কির দরজা ছিল। রসা রোড, অর্থাৎ এখন যেটা আশুতোষ মুখার্জি রোড, থেকে গলির মধ্যে এসে এই খিড়কি দরজা দিয়ে স্কুলে ঢোকা যেত। খিড়কি পেরলেই বটগাছ। গরমের সময় বটগাছে ছোট ছোট ফল হয়, তার মিষ্টি গন্ধ। তিন-চারটি ছাগলছানা সেই ফল খাওয়ার জন্য গাছের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। ফিফ্‌থ ক্লাস অথবা ফোর্থ ক্লাসে যখন পড়ি তখন জানালা দিয়ে বটগাছ দেখা যেত। বালক বয়সে যে সব পুরনো সুখের ছবি মনে আছে, এই বটগাছের ছবি তার মধ্যে একটি।

স্কুলের বাইরেও সুখের উপকরণ কত ! যখন স্কুলে ভর্তি হয়েছি তখন রমেশ মিত্র রোড ভাল করে তৈরি হয়নি। স্কুলে যেতে হলে পদ্মপুকুর রোড দিয়ে যেতে হত। পদ্মপুকুর রোড বেশি বদলায়নি, বাসিন্দারা ছাড়া। আগে জগুবাবুর বাজারের প্রায় উলটোদিকে অনেক খাবারের দোকান ছিল। ভাল রাজভোগ, রসগোল্লা, লেডিকেনি পাওয়া যেত। কিন্তু যা আমাকে আকর্ষণ করত সে হচ্ছে

একটি দোকানের সামনে একটি টিনের বোর্ড দেয়ালে মারা থাকত। তাতে রং দিয়ে বড় করে লেখা থাকত—'জলমিশ্রিত খাঁটি দুগ্ধ বিক্রয় হয়'। কিন্তু সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ব্যাপার ছিল যেখানে এখনকার সবারবান স্কুল রোড এসে আশুতোষ মুখার্জি রোডে পড়েছে, সেই মোড়ে একটি চায়ের দোকান—'কালিকা আশ্রম'। সামনে একটি কাঠে লেখা থাকত চপ, কাটলেট, ডিমের ডেভিল, মামলেট, মটন কারি ইত্যাদি। তখন এক কাপ চায়ের দাম ছিল দু' পয়সা কি তিন পয়সা। হ্যারিসন রোডে একটি নামকরা চায়ের দোকানে ক্রেতারা অনেক সময় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হাফ কাপ চা খেতেন। এখানে অবশ্য সে রীতি প্রচলিত ছিল না। কোনো রকম আব্রু ছিল না, ক্রেতাদের রাস্তা থেকে দেখা যেত। সেটা হয়তো দোকানের বিজ্ঞাপন। মাঝে-মাঝে দেখতাম আমাদের মাস্টারমশায়দের মধ্যে দু'একজন বসে আছেন। এই চায়ের দোকানের একটি জিনিস আমাদের সবাইকে আকৃষ্ট করত। দোকানের প্রায় উলটোদিকে চক্রবেড়িয়া রোডের মোড়ের বড় বাড়ি। তার দোতলায় একটি হোটেল ছিল। নাম 'কালিকা হোটেল'। যুদ্ধের সময় এই বাড়িতে রাধামোহন ভট্টাচার্য কিছুদিন ছিল। 'কালিকা আশ্রম' থেকে এক অল্পবয়সী ছোকরা মুখে গ্রামোফোনের চোঙা লাগিয়ে চিৎকার করে অর্ডার দিত—দু' প্লেট মটন কারি, ডিমের ডেভিল আর পরোটা। হোটেলে একজন লোক ঐরকম চোঙা নিয়ে তৈরি থাকত। সে তৎক্ষণাৎ অর্ডার বুক করে নিত এবং চেঁচিয়ে বলত, দু' প্লেট মটন কারি ডিমের ডেভিল আর পরোটা যাচ্ছে। এত মজা জীবনে খুব কম পেয়েছি। পথচারীদের নাকে খাবারের গন্ধ আসত না। কিন্তু এত ভাল ভাল খাবারের নাম শোনা যেত, সেও কি কম লাভ?

অল্প বয়সে ডেহরি-অন-শোনে চেঞ্জে গিয়ে আমাকে ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়ায় ধরেছিল। প্রথম ধাক্কা কুইনিন ইঞ্জেকসন নিয়ে সেরে গেল। তারপর কলকাতা

কালিকা কেবিন

ফিরে এসে মাঝে মাঝে জ্বর হত। তখন সবাই ডি· গুপ্তর মিক্সচার খেতেন। লোকে সংক্ষেপে বলত, ডি· গুপ্ত খাচ্ছি। ঐরকম তেতো, কষায়, লবণাক্ত স্বাদ একসঙ্গে আর কোথাও পাওয়া যেত না। খেতাম বলা ভুল হল, কখনও খেতাম, কখনও জ্বরের স্মৃতি ম্লান হয়ে গেলে গেলাসে ওষুধ ঢেলে জানলা দিয়ে ফেলে দিতাম।

তখন কলকাতায় এত বাড়ি ছিল না, কাজেই বৃষ্টির সময় জল বেরোবার রাস্তা ছিল। একেক দিন ফাল্গুন-চৈত্রের সময় বিকেলের দিকে খুব মেঘ করে আসত, বৃষ্টি পড়ত। এক ঘণ্টার মধ্যে সে বৃষ্টি থেমেও যেত। লোকে তারপর বেরলে খুব অসুবিধা হত না। কেবল ঠনঠনে কালীবাড়ির মোড়, চাউলপট্টি রোডের মোড়—এ রকম দু'একটা জায়গা এড়িয়ে চললেই হত। কালিকা আশ্রমের সামনে দিয়ে আমাদের বাড়িতে আসার রাস্তা। সেখানে একটু বৃষ্টি হলেই হাঁটুসমান জল হত। সেখানে এসে মনের আনন্দে ডার্বি জুতো খুলে ছাতার বাঁটের সঙ্গে বেঁধে অনেকক্ষণ দল বেঁধে জলে পা ভিজিয়ে বাড়ি আসতাম। এর যা ফল হওয়া উচিত, অনেক সময় তাই হত। কখনও কখনও ক্লাসে পুরনো ম্যালেরিয়াও হুড়মুড় করে আসত। তখন কোনোরকমে চারটে পর্যন্ত কাটিয়ে বাড়ি এসে লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতাম। এরকম আমার কয়েক বছর চলেছিল। তারপর একদিন হঠাৎ মনে হল অনেক দিন তো জ্বর হয়নি।

প্রথম যখন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, তখন স্কুলে যাবার দুটি পথ ছিল। এক, পদ্মপুকুর রোড দিয়ে চাউলপট্টির মোড় পর্যন্ত যাওয়া যায়, তাতে ঘুর পড়ত। কিংবা হাজরা রোড দিয়ে যাওয়া। তাতেও ঘুরে যেতে হত। সে বয়সে ঘুরে যাওয়ার আনন্দ থাকে। মনে হয় অনাবিষ্কৃত জায়গা আবিষ্কার করতে করতে চলেছি। প্রথম প্রথম ভালরকম বাজার করতে হলে জগুবাবুর বাজার ছাড়া উপায় ছিল না। ল্যান্সডাউন মার্কেটের পত্তন আগেই হয়েছিল। বাজারটি বড়

কালিকা হোটেল

হয়ে আমাদের দুঃখ ঘুচল। প্রথম যখন রমেশ মিত্র রোড হল, সেও প্রায় ঐ সময়। তখন রাস্তার দু'ধারে তেলের বাতি ছিল। সবাই সে রাস্তাকে বলত বম্‌পাস রোড। দক্ষিণ কলকাতায় লেক কাটা হচ্ছে। এখন তার নাম রবীন্দ্র সরোবর। আমরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে দেখতে যেতাম। লোকে তখন একে বলত বম্‌পাস লেক। পরে এই নাম দু' জায়গা থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। বম্‌পাস রোড নামে একটি ছোট রাস্তা অনেকদিন পর্যন্ত লেক রোডের কাছে আত্মগোপন করে ছিল বলে মনে হচ্ছে। এখন অমুকচন্দ্র তমুকের নামে নতুন নামকরণ হয়েছে কিনা বলতে পারব না। তখনকার বম্‌পাস রোড দিয়ে রসা রোডে পড়বার আগে ডায়না প্রিন্টিং প্রেস ছিল। তার আগে ছিল একটি গলি। সেখান থেকে কিছুদিন আমাদের স্কুলের ম্যাগাজিন ছাপা হত। যখন প্রথম সংখ্যা বের হল তখন দেখলাম সম্পাদকমণ্ডলীতে আমার নাম রয়েছে। কোনও মাস্টারমশায়ের আমার কথা মনে হয়েছিল। প্রেস চিরকালই আমার কাছে খুব রহস্যময় জায়গা। যখন রংপুরে ক্লাস থ্রিতে পড়ি, তখন দেখতাম আমাদের স্কুলের কাছে একটা ছোট ট্রেডল মেশিনে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন, জুতোর দোকানের বিজ্ঞাপন, নিলামি ইস্তাহার ইত্যাদি ছাপা হত। অনেক সময় মুগ্ধ হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখেছি। রমেশ মিত্র রোড যখন প্রথম হল তখন কম মুগ্ধ হইনি। ল্যান্সডাউন মার্কেট ছাড়িয়ে একটু গেলেই রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। সেকালে তাঁকে সবাই কবি বলে চিনত। তিনি পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে বড় চাকরি করতেন এবং 'মানসী ও মর্মবাণী' এবং অন্যান্য কাগজে নিয়মিত কবিতা লিখতেন। কবিখ্যাতি এমন জিনিস যে, কর্পূরের মতো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দু'দিনে হাওয়ায় মিশে যায়। তবে হাওয়ায় মিশে যাননি এমন কবিও একসময় এ পাড়ায় থাকতেন। ১৯৩১ সালে ল্যান্সডাউন মার্কেটের উত্তর দিকে একতলার একটি ছোট অংশে বুদ্ধদেব বসু কিছুদিন ছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। আমি ছাত্র-ছাত্রী উৎসব পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে লেখা চাইতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে নিরাশ করেননি।

রসা রোডের দিকে আরও এগিয়ে গেলে ডানদিকে কতকগুলি খোলা ছাদের দোকান ছিল, যেখানে ইন্দ্র রায় রোড এসে রমেশ মিত্র রোডে মিশেছে। এইসব জায়গায় নানা রকম মিস্ত্রিখানার কাজ হত। কয়েকটি ছিল কামারের দোকান। বিশেষ করে একটি দোকান আমার মন মুগ্ধ করেছিল। সেখানে দেখতাম গনগনে আগুনে লোহা গরম করে পেটানো হচ্ছে। আগুনের স্ফুলিঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কখনও কখনও হাপরের দড়ি টানা হচ্ছে এবং আগুন আরও বেশি করে জ্বলছে, কোনো কোনো ধাতু গলানো হচ্ছে সেই সঙ্গে। যে একাজ করছে তার গায়ের রং, চুল ও চোখ একটু অন্য রকম। যেন পুরো ভারতীয় নয়। স্কুলে যাবার পথে সময় হত না, কিন্তু ফিরে আসার সময় অনেকবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদৃশ্য দেখেছি। ক্লাসে যখন 'ভিলেজ ব্ল্যাকস্মিথ' কবিতা পড়েছি, তখন এই লোকটির কথা আমার মনে পড়ত। তবে তুলনায় এ অনেক ক্ষীণকায়। তার 'strength is a strength of ten' একথা কখনই বলা

চলত না। গরমের সময় কখনও কখনও বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে দেখেছি এই মোড়ের চেহারা আর একটু বদলে গিয়েছে, তখন চারদিকে অনেক পুকুর ছিল এবং ইতস্তত ফুলের গাছ। দিনের বেলা তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত না কিন্তু সন্ধ্যার আগে পুকুরের জলের ভেজা বাতাস, কাদার গন্ধ, চাঁপা ফুলের গন্ধ। কলকাতাকে একটু অন্যরকম মনে হত। কাছাকাছি কয়েক ঘর জেলে থাকত, বিকেলের পড়ন্ত রোদে দেখেছি তারা জাল শুকোতে দিয়েছে।

গরমের ছুটির আগে আমাদের মাসখানেকের জন্য মর্নিং স্কুল হত। সেই একমাস প্রতিদিন প্রায় পিক্‌নিক। অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে ওঠা এবং সবার আগে স্কুলে পৌঁছবার চেষ্টা। দিনের বেলা যখন স্কুল হত, সকালের স্কুল তার চেয়ে কম সময়ের। বোধহয় দশটা সাড়ে-দশটায় স্কুল ছুটি হত। তারপর রাস্তায় একটু ঘুরে দেরি করে বাড়িতে ফেরা। আর একটি আনন্দের বিষয় ছিল—সেই একমাস বাড়ি থেকে খাবার আসত। অন্য সময় বাড়ি থেকে খাবার পাঠানোর কোনো চল ছিল না। টিফিনের সময় স্কুলে দেখতাম অনেকের বাড়ি থেকে বড় কাঁসার গেলাসে দুধ এসেছে, সঙ্গে রসগোল্লা। মিষ্টি ও দুধে আমার তখন থেকেই অনাসক্তি, কাজেই প্রলুব্ধ হতাম না। কিন্তু মর্নিং স্কুলে যখন খাবার আসত, লুচি ছেঁচকি কিংবা পরোটা, তখন মনে হত আমার মতো সুখী আর কেউ নেই।

মর্নিং স্কুল থেকে ফিরে দুপুরবেলায় চিত হয়ে শুয়ে মাসিক পত্রিকা পড়তাম—বড়দের ও ছোটদের। তখনকার শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা বলতে 'সন্দেশ' ও 'মৌচাক'। সন্দেশ অনিয়মিত, তবে মৌচাকের খুব ভাল অবস্থা। বাড়িতে পুরনো দিনের বাঁধানো 'সাথী', 'সখা ও সাথী' ও 'মুকুল' ছিল। এইরকম চিত হয়ে শুয়ে দুপুরবেলায় বোধ হয় 'মৌচাক'-এই প্রিয়ংবদা দেবীর 'গ্রীষ্মদাহে পিঙ্গল আকাশ' কবিতাটি খুব ভাল লেগেছিল, এখনও মনে আছে। 'সখা ও সাথী' ও 'মুকুল'-এর লেখাগুলি কতবার পড়েছি তার ঠিক নেই। রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছাপূরণ' গল্প ও 'নদী' এইভাবেই পুরনো মাসিক পত্রিকায় পড়েছিলাম, তবে আরও অনেক আগে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য মাসিক পত্রিকা আরও বের হত, যেমন 'খোকা ও খুকু', নিয়মিত পড়ার কিন্তু কোনো দাগ রাখেনি। খুব অল্প বয়সে দেখেছি একটি ঢাউস কাগজ—'দর্পণ'। 'হিতবাদী'র মতো বড় নয়, কিন্তু বেশ বড় সাইজের। মা পড়তেন। আর দুটি কাগজ, তার মধ্যে একটি 'বিজলী'। তার প্রথম প্রকাশকের কথা সবাই জানেন। অনেক দিন চলেছিল। কিন্তু হাত বদল হত। শেষের দিকে চালাতেন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও সুবোধ রায়। তখন এণ্টালি থেকে প্রকাশিত হত। 'ধূমকেতু'র কথাও মনে আছে। যতই উত্তেজনা সৃষ্টি করুক, বেশিদিন বাঁচেনি। যখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে এলাম, তখন বাংলা সাপ্তাহিকের একটি বন্যা বয়ে চলেছে। দামে খুব সস্তা, এক পয়সায় আরম্ভ করে চার পয়সায় শেষ। যেমন, 'অবতার', 'শিশির', 'বাংলা', 'নাচঘর' ও শচীন সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'নটরাজ'। নাচঘর হেমেন্দ্রকুমার রায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী সম্পাদনা করতেন। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী সিনেমার কাজে বোম্বাই চলে গেলে হেমেন্দ্রকুমার রায় একাই সম্পাদক ছিলেন। সে সময় লেখাপড়া জানা মহলে 'নাচঘর'-এর চাহিদা ছিল। তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ী নতুন থিয়েটার

আরম্ভ করেছেন। নাচঘরের সম্পাদক ও লেখকরা অনেকেই শিশিরকুমারের ঘনিষ্ঠ। যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অশোকনাথ শাস্ত্রী, নরেন্দ্র দেব এবং অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভা দেবী। 'নাচঘর'-এ বিলিতি অভিনেতাদের এবং নাচগানেরও খবর থাকত। প্রথম ইউরোপীয় ব্যালে নাচের খবর আমি সেখানে ও 'ভারতী' পত্রিকায় পেয়েছিলাম মনে আছে। 'নাচঘর'-কে পত্রিকাগুলির মধ্যে ওষধি মনে করলে ভুল হবে, কিন্তু খুব দীর্ঘকাল বাঁচেনি। মাঝে মাঝে বিভিন্ন সম্পাদক একে টিঁকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সে অল্পকালের জন্য। আগেকার নাচঘর আর প্রাণ ফিরে পায়নি। তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যমন্দির আর স্টার থিয়েটারের মধ্যে বেশ রেষারেষি ছিল। তার পরিচয় 'নাচঘর', 'নটরাজ', 'শিশির' প্রভৃতি কাগজে পাওয়া যেত। মিনার্ভা থিয়েটার তখনও জীবিত ছিল। দু'একজন গিরীশ যুগের অভিনেতা নায়ক সাজতেন। কিন্তু এখানকার দর্শক অন্য শ্রেণীর। স্কুলে পড়তে থিয়েটার যে দেখিনি তা নয়, যা দেখেছি শখের থিয়েটার। স্কুলে পড়বার আগে কখনও কখনও থিয়েটারে গিয়েছি মা'র সঙ্গে। মেয়েদের জন্য তখন উপরে আলাদা জায়গা থাকত। নীচে এসে বসা কেউ ভাবতেই পারতেন না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'পত্নী-হারা' নামে একটি গল্প আছে। এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ফ্রক পরিয়ে নীচে বসে থিয়েটার দেখবেন ভেবেছিলেন। ফলে কী রকম বিপত্তি হল, সেই কাহিনী। প্রমথ চৌধুরীর লেখা একটি গল্প আছে 'বড়বাবুর বড়দিন'। গল্পটি পড়লে তখনকার থিয়েটারের অবস্থা খানিকটা বোঝা যায়। খুব ছেলেবেলায় যে থিয়েটার দেখেছি তার উপর ভরসা করে কিছু বলা চলে না। দুটি অভিনয়ের কথা আমার মনে আছে। তখন সাধারণত সমস্ত রাত থিয়েটার হত। তার কারণ, অনেকে বলেছেন, মেয়েরা অনেক গয়না পরে থিয়েটার দেখতে আসতেন। রাস্তাঘাট খুব নিরাপদ ছিল না। কাজেই সকাল হবার আগে বাড়ি যাওয়া চলত না। মেয়েরা তখন অবশ্য উপরে চিকের আড়ালে বসতেন। অল্পবয়সের স্মৃতিকে যদি অভিজ্ঞতা বলা চলে তাহলে একটি অভিজ্ঞতার কথা বলব। কিছুক্ষণ উপরে চিকের আড়ালে মা'র সঙ্গে থিয়েটার দেখলাম। তারপর নীচে নেমে এসে শক্ত চেয়ারে বসে বাকি অভিনয় দেখলাম। কখনও ঘুমে, কখনও জাগরণে দেখেছি। এইটুকু মনে আছে যে, প্রথমে 'শাজাহান' দেখছিলাম। তারপরে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা' হচ্ছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা' হাস্যরসের কবিতাটির একটি নাট্যরূপ করা হয়েছিল। থিয়েটার যখন ভাঙল, তখন বেশ সকাল। রোদ্দুর উঠেছে, ট্রাম অনেকক্ষণ চলতে আরম্ভ করেছে, বাবুরা থলে হাতে করে বাজারে যাচ্ছেন। মেয়েরা বেশির ভাগই ছ্যাকড়া গাড়ি করে আসতেন। তখন থিয়েটারের ঝি বলে একশ্রেণীর পরিচারিকা ছিল। ছ্যাকড়া গাড়ির সঙ্গে এক বা একাধিক অভিভাবক দাঁড়িয়ে আছেন এবং থিয়েটারের ঝিয়েরা 'ও গোয়াবাগানের চাটুজ্যেবাড়ির বউরা' কিংবা 'বাগবাজারের মিত্তিরবাড়ি' কিংবা 'ঝামাপুকুরের দত্ত বাড়ি' এই সব বলে চেঁচাচ্ছে। ঝিয়েদের আর-একটি কাজ ছিল, যেসব মহিলারা থিয়েটার দেখতেন তাঁদের জন্য পান, জর্দা, হিংয়ের কচুরি, আলুর দম, মিষ্টি

ইত্যাদি কিনে এনে দেওয়া। এখন থিয়েটারের নবযুগে এদের আর দরকার হয় না। আর-একটি অভিনয়ের কথা মনে আছে। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'জয়দেব'। শুনেছি এটি একটি যাত্রার পালা হিসাবে লেখা হয়েছিল। পরে কোনো থিয়েটারের মালিক এটি অভিনয় করতে আরম্ভ করেন। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ভক্তিকে আশ্রয় করলে থিয়েটারে যত অর্থপ্রাপ্তি হত এমন আর কোথাও হয় না। এতে একটি ছোট রাখাল-ছেলের চরিত্র আছে, আসলে সে ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। যবনিকা উঠলেই দর্শকরা তাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ বলে ধরতে পারত। কিন্তু নাটকের চরিত্ররা যবনিকা পড়বার দশ মিনিট আগে পর্যন্ত বুঝতে পারতেন না। ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণর মুখে একটি গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তার প্রথম লাইনটি মনে আছে, 'কার তরে তুই কাঁদিস মাসি, কার তরে তুই কাঁদিস'। বলার দরকার নেই যে, মাসি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিতপ্রাণা একটি মহিলা। কটুভাষিণী, কিন্তু অন্তর খুব স্বচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণ প্রায় শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে ছলনা করে গেলেন। তখন থিয়েটারে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা প্রায় সব সময় মেয়েরাই করতেন। এখন তো থিয়েটার থেকে গানের পার্ট উঠেই গিয়েছে, কিন্তু তখন ভাল গান এবং ভাল গাইয়ে না থাকলে থিয়েটার চালানো কঠিন হত। শিশিরকুমারও তাঁর প্রথমযুগে নাচগানকে উপেক্ষা করেননি। যাকে কমার্শিয়াল অভিনয় বলে, ছেলেবেলায় যে দুটির কথা বললাম আর 'আলিবাবা' ছাড়া আমি বোধহয় আর কিছু দেখিনি। দুঃখের বিষয় আলিবাবার কাশিম ও দস্যুদের কথা ছাড়া আমার আর কিছু মনে নেই। এমন কী, মর্জিনা পর্যন্ত নয়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার পর লম্বা ছুটি থাকে। তখন শিশিরবাবুর 'সীতা' দেখেছিলাম। আমার সঙ্গে রংপুরের উপেন্দ্রকুমার সেন ছিলেন। পুরনো মনোমোহন থিয়েটার তখন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের উপর ছিল। অভিনয় যখন আরম্ভ হল তখন যে আশা নিয়ে গিয়েছিলাম সে আশা পূর্ণ হতে কিছু বিলম্ব হয়েছিল। প্রথম দৃশ্যে যেখানে দুর্মুখের প্রবেশ ও নাটকের শুরু, সে-অংশ আমার মনে রেখাপাত করেনি। বোধহয় আমারই ত্রুটি। কিন্তু পনের-কুড়ি মিনিট যাবার পরে অর্থাৎ শ্রীমতী প্রভার অভিনয়ের সঙ্গে-সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। তখন মনে হয়েছিল শিশিরকুমার তো খুব ভাল অভিনয় করেছেন, তবে শ্রীমতী প্রভা ও তুঙ্গভদ্রার অভিনয়ে শ্রীমতী নীরদারও তুলনা পাওয়া কঠিন। এখন পঞ্চান্ন বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে, তবু সেই কথাই মনে হচ্ছে। কয়েকটি জিনিস অবশ্য দৃষ্টিকটু লেগেছিল যেমন, বেশি বয়স্ক লব-কুশ। অনেকেই জানেন যে সীতা নাটকের মূল অংশ ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটক থেকে নেওয়া। তখন পণ্ডিত সমাজের একাংশ হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের বিরোধী বলে এই নাটকের প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু যে অংশের প্রতিবাদ বেশি হয়েছিল, সে-অংশ যে একেবারে সংস্কৃত থেকে নেওয়া, সে কথা তাঁরা কখনও মনে করেননি। এসব সত্ত্বেও বলব সীতা ভাল নাটক হয়নি। অভিনয়ের গুণপনাই তাকে অনেকদিন চালিয়ে নিয়ে গেছে।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন দক্ষিণ কলকাতায় বড় চড়কের মেলা হত। ল্যান্সডাউন রোডে, পদ্মপুকুর রোডের চারদিকে এবং পদ্মপুকুরের ভিতরে

চড়কের মেলা বসত। পাঁপর ভাজা, ফুলুরি, খেলনা, কৃষ্ণনগরের নানারকমের পুতুল, মাদুর, পাটি, মনোহারী জিনিস, বাঁশের খেলনা, ছোটদের বেহালা এইসব ছিল প্রধান আকর্ষণ। মনোহারীর দোকানে ক্যাপ দেওয়া পিস্তল পাওয়া যেত। সবই হয়তো সস্তার জিনিস, সেজন্য আকর্ষণ বেশি। মেলা দিন তিনেক থাকত, তার মধ্যে সংক্রান্তির দিন অবিশ্রান্ত ভিড়। আরও দক্ষিণে ল্যান্সডাউন ও হাজরা রোডের মোড়ের কাছে একটি খোলা জায়গায় দু'এক বছর মেলা বসেছিল, কিন্তু তেমন জমেনি। চড়কের কথা বলতে গেলেই যাত্রার কথা এসে পড়ে। তখন ল্যান্সডাউন রোডের কাছে চক্রবেড়িয়া অঞ্চলে অনেক খোলা জায়গা পড়ে থাকত। সেখানে ইস্টারের সময় প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বারোয়ারি পুজো ও যাত্রা হত। নামকরা দল যারা ছিল, তারা প্রায় সবাই আসত। সেইসব নামের দল এখনও দু'একটি আছে। কিন্তু নাম ছাড়া তাদের আর সব কিছু বদলে গিয়েছে। একটি অভিনয় খুব ভাল লেগেছিল। বিশ্বকর্মাকে নিয়ে লেখা। সেটি আমার ছেলেবেলার মোহ, না সত্যিই ভাল হয়েছিল, বলতে পারব না। তবে কোনো কোনো অভিনয়ের কথা মনে পড়লে এখনও আনন্দ পাই। একজন নামকরা গল্পলেখক একটি ছাত্রের মুখে শুনে পৃথ্বীরাজ, আকবর ও ওয়ারেন হেস্টিংসের যুদ্ধের কথা লিখেছিলেন। এই ধরনের 'ঐতিহাসিক' যাত্রার পালা অনেক ছিল।

এক চড়কমেলার সময় অমৃতলাল বসুকে দেখেছিলাম। তখনও কলেজে ভর্তি হইনি। চড়কের মেলায় একদিন সাধারণ বক্তৃতা কিংবা আলোচনা হত। যেদিনকার কথা বলছি সেদিন অমৃতলাল বসু এবং দিলীপকুমার রায় উপস্থিত ছিলেন। অমৃতলাল বসুর আগেকার বয়সের যে সব ফটোগ্রাফ দেখা যায় তার থেকে তাঁর পোশাক বিশেষ কিছু বদলায়নি। সেই পিছন দিকে লম্বা সাদা চুল, পায়ে স্টকিং এবং কালো বার্নিস করা জুতো। তিনি কী বলেছিলেন ভুলে গিয়েছি। সভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আমি দিলীপের বাবার ঠাকুর্দা।' বয়স হিসাব করলে কথাটা সত্য, একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু হাস্যরসিকদের দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁরা যা বলেন, লোকে তাতেই হাসতে শুরু করে। অমৃতলালের মুখে এই কথা শুনে আসরসুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পড়ল।

সিনেমার কথা বোধহয় একটু বলা দরকার। আমি যখন নিচু ক্লাসের ছাত্র তখন দক্ষিণ কলকাতায় দুটি সিনেমা ঘর ছিল। তখনকার দিনে বলত বায়োস্কোপ। একটির নাম রসা থিয়েটার, যার নাম এখন পূর্ণ থিয়েটার হয়েছে। আর একটি জগুবাবুর বাজারের কাছে। জে· এফ· ম্যাডানের প্রথম তোলা হিন্দি ও বাংলা ছবি এখানে দেখানো হত। নাম ছিল ম্যাডান থিয়েটার। পরে নাম হয় এম্প্রেস থিয়েটার। রসা থিয়েটারে প্রথম তোলা বাংলা ছবি ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইংলণ্ড রিটার্ণ্ড' বা 'বিলাত ফেরত' আমি দেখিনি তবে তার ট্রেলার দেখেছিলাম। তার অল্পদিন পরে তোলা ছবি 'সাধু কি শয়তান' দেখেছি। এতে তখনকার নামজাদা মঞ্চ-অভিনেতা মন্মথনাথ পাল, অর্থাৎ হাঁদুবাবু নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সাধু বা শয়তানের ভূমিকায় ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বিজ্ঞাপনে লেখা থাকত, দেখুন বঙ্গমহিলার অশ্বারোহণ, সেতু হইতে গভীর জলে ঝম্পপ্রদান ইত্যাদি। এখনকার দর্শক দেখলে বলবে

বোম্বাই-মার্কা ছবি। তবে ক্যামেরার কাজ পরিষ্কার হয়েছিল বলে মনে আছে। ক্যামেরার কাজ বলতে গিয়ে মনে হল যে, তখনকার দর্শকরা ছবি দেখতে গিয়ে ক্যামেরার কিছু কাজ ভাল আর কিছু কাজ ঝাপসা হবে এ ধরে নিতেন। তখনকার ছবি অবশ্য দিনের আলোতে রিফ্লেক্টর দিয়ে তোলা হত। শিশিরকুমারের প্রথম দিকের তোলা ছবি কিছু দেখেছি। তখন আমার বয়স বারো-তেরো হবে। একটি ছবির নাম রত্নাকর, বাল্মীকির গল্প নিয়ে লেখা। এখন তার নাম খুব অল্প লোক মনে রেখেছে। মনে রাখবার বিশেষ কারণও নেই। কিন্তু তাঁর প্রথম দিকের দু'একটি ছবি ভাল হয়েছিল। যেমন, শরৎচন্দ্রের গল্প 'আঁধারে আলো'। তাতে যে মেয়েটি 'বিজলী'র অভিনয় করেছিলেন তিনি সত্যিই ভাল অভিনেত্রী এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিলেন। একটি দৃশ্যের কথা মনে আছে। একটি ঘরে বিজলীর নাচ হচ্ছে, তখন সত্যেন্দ্রবেশী শিশিরকুমার এসে ঢুকলেন। তার আগে নাচের দৃশ্যে ছবিটি হঠাৎ নীল হয়ে গেল। এরকম 'গিমিক্' তখন চলত। বিজলীর নাচের সময় টাইটেল হল 'অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ, রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ'। কথা ও কাহিনীর অতি পরিচিত পঙ্ক্তিটি হঠাৎ পর্দায় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এর পরের ছবি 'মানভঞ্জন', রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত গল্প। নরেশচন্দ্র মিত্র দুটি ছবিতেই খুব ভাল অভিনয় করেছিলেন। শেষেরটি আমি দেখিনি। এর পরে শিশিরকুমারের যে সব ছবি দেখেছি সে সব আমার কলেজ-জীবনের কিংবা তার পরের।

আজকাল যে-কোনো চাকরির ইন্টারভিউয়ে গেলে খেলাধুলার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। খবরের কাগজের অনেকটা জায়গা জুড়ে খেলাধুলার খবর থাকে। আমাদের সময় কয়েকটি ধরনের চাকরি ছাড়া এ ধরনের প্রশ্ন বড় একটা উঠত না। তাহলে আমার বিপদ হত। জীবনে কখনও খেলতে শিখিনি। তবে একসময় চলনসই ব্যাডমিন্টন খেলতাম মনে পড়ে। কিন্তু সব বাঙালি ছেলেরই ফুটবলের শখ। কবে মোহনবাগান গোরাদের হারিয়ে শিল্ড পেয়েছিল সেকথা জাতীয়তাবাদের মতো বাঙালির রক্তে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল। স্কুলে পড়বার সময় ভবানীপুর অঞ্চলে অনেক জমি পড়ে থাকত। সেখানে পাড়ার ফুটবল ম্যাচ হত। এগারোজনের টিম খেলবার মতো বড় জায়গা না থাকলেও ছ'জনের টিম খেলবার মতো জায়গা অনেক ছিল। পাড়ার লোকের বদান্যতারও অভাব ছিল না। তাঁদের দয়ায় রুপোর মেডেল, কদাচিৎ সোনার মেডেল, কাপ কিংবা শিল্ড পাওয়া যেত। তাড়াতাড়ি বিকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চক্রবেড়িয়া রোড, গিরীশ মুখার্জী রোড অঞ্চলে কিছুক্ষণ দাঁড়ালে তিন-চারটি খেলা অল্পবিস্তর দেখে বাড়ি ফেরা যেত। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ফৌজের বড় ট্রানজিট ক্যাম্প হয়েছে। আগে সেটা ভাইসরয়ের দেহরক্ষীর ব্যারাক ছিল। এই মাঠে কিছুদিন ফুটবল খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এইখানে অনেক বড় ম্যাচ খেলা দেখেছি।

ফুটবল খেলা ছাড়া সময় কাটাবার উপায় ছিল সন্ধ্যাবেলা কিংবা শীতকালে দুপুরের পরে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো। যখন আমি কলকাতার বাসিন্দা হইনি, তখন দেখেছি পুরনো রসা রোড, যা এখন আশুতোষ মুখার্জি রোড হয়েছে, তা ভেঙে

চওড়া করা হচ্ছে। তার আগে রসা রোড ঠিক চিতপুরের মতো অপ্রশস্ত ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত জগুবাবুর বাজার থেকে আরম্ভ করে রসা রোডের দু'দিকে খুব বেশি বাড়ি ওঠেনি। চওড়া ফুটপাথে পসারিরা জিনিসপত্র বিছিয়ে বসত বিকালে অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্য। ফুটপাথে দোকান তোলবার কথা কেউ ভাবতেই পারত না। পদ্মপুকুর রোড দিয়ে জগুবাবুর বাজার পেরিয়ে রসা রোডে পড়ে ডাইনে মোড় নিয়ে সার্কুলার রোড অবধি হাঁটা আমার অভ্যাস ছিল। আরও উত্তরে যেতাম না। বারণ ছিল যে তা নয়, কিন্তু মনে হত ওটা আমার এলাকার বাইরে। মনের মধ্যে কোথাও অদৃশ্য বাধা ছিল। দুটি জিনিস সব সময় মনে পড়ে। একটি হচ্ছে জগুবাবুর বাজারের কাছে পৌঁছলে দেখা যেত একজন লোক তোলা উনুনে বাজারে ঢুকবার প্রায় মুখে বসে ছোট ছোট লুচি ভাজছে, আর একটি পাত্রে আলুর দম রাখা আছে। লুচির চেহারা রাজপুত্রের মতো। আলুর দমও একটু লালচে রংয়ের, খুবই লোভনীয়। আরও উত্তরে এগিয়ে ফুটপাথের উপরে একজন কাবুলিওয়ালা, গরম জামাকাপড় নয়, চাদরের উপর জড়িবুটি, শেকড়, নানা রকম ওষুধ বিছিয়ে তারস্বরে তার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার বক্তৃতা শুনতাম। এরকম অদ্ভুত বাজখাঁই গলা আমি কখনও শুনিনি। বোধহয় ব্যবসা ভালই চলত, কারণ তাকে অনেক দিন ধরে দেখেছি।

জগুবাবুর বাজারের প্রায় উলটোদিকে একটি খুব ভাল জায়গা ছিল, তার নাম কটেজ লাইব্রেরি। যখন সেকেণ্ড ক্লাস কি ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি তখন একটি প্রবন্ধ লিখবার দরকার হয়েছিল। স্কুলের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন যে, যার রচনা সর্বোত্তম হবে, তাকে একটি পদক দেওয়া হবে। পদক অবশ্য পাইনি। কিন্তু প্রবন্ধ লিখবার জন্য এই লাইব্রেরিটির শরণাপন্ন হয়েছিলাম। প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তার চেয়েও বড় জিনিসের সন্ধান পেয়েছিলাম, এই কটেজ লাইব্রেরির গ্রন্থ সংগ্রহ। তখন জেনেছিলাম যে, আমরা এর অনেক দিন থেকে সদস্য, কিন্তু বই আনা হয় না। যাই হোক, এই সব বাধা মুক্ত করে একদিন সন্ধ্যাবেলা কটেজ লাইব্রেরিতে হাজির হলাম। প্রবন্ধ লেখা শেষ হয়ে গেলেও প্রায়ই বেড়িয়ে আসবার পথে কটেজ লাইব্রেরিতে যেতাম। বেড়াবার নতুন আকর্ষণ পেলাম। যে সব বইয়ের—নাটক, উপন্যাস, কাব্য—নাম শুনে আসছি, কখনও দেখিনি, তার সন্ধান পাওয়া গেল। এছাড়া অনেক পুরনো বাঁধানো মাসিক পত্রিকা। আমাদের বাড়িতে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পূর্ণ ফাইল ছিল না, সে সব সংখ্যা এখান থেকে এনে পড়েছি। যে ভদ্রলোক প্রায়ই বই দিতেন, তাঁর চেহারা মনে নেই, তাঁর চোখে চশমা ছিল এইটুকু কেবল মনে আছে। তিনি একদিন চশমার ভিতর থেকে তাকিয়ে আমাকে বললেন, 'খোকা, এসব বই তুমি নিজে পড়ো না তো? বাড়ির জন্য নিয়ে যাও?' আমার উত্তর খুব যে সত্য হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যাও হয়নি। তারপর থেকে তিনি আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করেননি। পরে স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর যখন আশুতোষ লাইব্রেরি গড়া হয়েছিল তখন শুনেছি কটেজ লাইব্রেরি তাতে বিলীন হয়ে যায়।

এই রকম করতে করতে এদিকে টেস্ট পরীক্ষার সময় এসে গেল। সে বছর

আমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার কথা ছিল না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ছিল, ষোলো বছরের আগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। কাজেই এক বছর বসে থাকতে হবে ধরে নিয়েছিলাম। তখন অবশ্য কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে কোনো-কোনো অভিভাবক বয়স বাড়াতেন বা কমাতেন। যে অভিভাবকরা কমাতেন, তাঁদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ছেলেরা আরও বেশিদিন সরকারি চাকরি করবে। তখন মেয়েদের চাকরির কথা উঠতই না। তাছাড়া গেজেটে তাদের বয়সের উল্লেখও থাকত না। যাই হোক, শখ করে টেস্ট পরীক্ষা দিলাম ও পাস হয়ে গেলাম। কাউকে কাউকে দেখেছি কোন্ পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে তা মুখস্থ বলতে পারত। আমার স্মৃতিশক্তি অত প্রখর নয়। তাহলেও মনে আছে ইতিহাস, ভূগোলে ভাল নম্বর পেয়েছিলাম। অন্য প্রায় কোনো বিষয়েই খারাপ নয়। কেবল অঙ্কে দেখলাম কোনো রকমে পাস করে গিয়েছি। পরীক্ষকের দোষ নেই, দোষ আমার। অঙ্কের নম্বর দেখে খুব ভয় হল, যদি ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় অঙ্কে আটকে যাই! টেস্ট পরীক্ষার ফল জানামাত্র নতুন ফার্স্ট ক্লাসে পড়তে লাগলাম, অর্থাৎ যারা আমার এক ক্লাস নীচে পড়ত তাদের সঙ্গে। এবং অ্যারিথমেটিকের প্রথম পাতা থেকে দ্বিগুণ উৎসাহে অঙ্ক কষতে লাগলাম। তখনকার স্কুলের অঙ্ক সহজ ছিল। কখনও চেষ্টা করিনি বা শেখানো হয়নি বলে শিখতে পারিনি। যাই হোক, অঙ্ককে অনেকটা ঘায়েল করা গিয়েছে এরকম মনে হচ্ছে এবং ক্লাসে যাচ্ছি, তখন একদিন সকালে বাবা বললেন, 'পরীক্ষার ফি জমা দিয়ে দাও। কাগজে বেরিয়েছে এ বছর থেকে পনেরো বছরের ছেলে-মেয়েরাও পরীক্ষায় বসতে পারবে।' এই শুনে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। খুব নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করতে পারিনি। পরীক্ষার সপ্তাহ তিনেক আগে অসুখে পড়লাম। জ্বর ইত্যাদি এবং যাকে আজকাল বলে ব্ল্যাকআউট, সেরকম হয়েছিল। ভেবেছিলাম পরীক্ষা দিতে পারব না। শেষ পর্যন্ত গায়ের জোরে এবং মনের জোরে এবং বাবার উৎসাহে পরীক্ষার হলে উপস্থিত হলাম। তখনকার দিনে সাউথ সবারবান স্কুলের ছাত্রদের সিট পড়ত মিত্র ইনস্টিটিউশনে, আর মিত্র ইনস্টিটিউশনের ছেলেদের সিট পড়ত সাউথ সবারবানে। আমাকে মিত্র ইনস্টিটিউশনে সিক্ রুমে নিয়ে যাওয়া হল। অর্থাৎ যেখানে দুটো বেঞ্চি জোড়া দিয়ে রাখা হত, তার উপর ছেলেটির বিছানা, বালিশ, হাতপাখা, দুটো কমলালেবু, বড় বোতলে ঘোল এবং বিশেষক্ষেত্রে তার একজন অভিভাবকজাতীয় লোক অনেক ভাব নিয়ে উপস্থিত থাকতেন। আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার বেলা কিছুই হল না। আমাকে একজন পৌঁছে দিয়ে এলেন। আমি বিছানার উপর বসে লিখতে লাগলাম। পিছন থেকে একজন মাস্টারমশায় আমার খাতা পড়ছিলেন। তিনি আমাকে ঘন্টা দুয়েক পরে বললেন, 'তুই পাস করবি।' অপরিচিত কণ্ঠের এই আশ্বাসবাণীর কোনো প্রতিক্রিয়া আমার মনে হল না। পরের দিন থেকে বিছানায় বসা অস্বস্তিকর মনে করে চেয়ারে বসে পরীক্ষা দিতে লাগলাম। পরীক্ষা তো কেটে গেল এবং যথাসময়ে ফল প্রকাশিত হল। খুব হতাশ হলাম। আশ্চর্য হলাম দেখে যে, অঙ্কে লেটার পেয়েছি, কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল ও বাংলার ফল আশানুরূপ নয়। অথচ

পরিচিত লোক মার্কস দেখে বলতে লাগল, এই তো বেশ হয়েছে, আবার কী হবে ! কিন্তু ইতিহাসে সাতষট্টি পাওয়ার দুঃখ আমি কখনও ভুলতে পারব না। এর রহস্য কয়েক বছর পরে বুঝতে পেরেছিলাম। আমি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার, আমার মাস্টারমশায় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন গল্প করতে করতে বলেছিলেন, সে বছর তিনি ইতিহাসের হেড এগজামিনার ছিলেন। তাঁকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম আমার এরকম দুর্দশার কারণ কী ? তিনি হেসে বললেন, 'হতেই তো পারে। আমি সেবার পরীক্ষকদের বলেছিলাম, যারা মুখস্থ লিখবে, তাদের যেন কম নম্বর দেওয়া হয়।' পরীক্ষকরা সবাই যে এ নির্দেশ মেনে চলেছিলেন তা নয়। মনে মনে বললাম, স্কুলের জ্ঞানবাবু হলে এ নির্দেশ কখনই মানতেন না। যখন মার্কশিট নিয়ে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে বেরলাম তখন দেখলাম আমার সহপাঠী অমলেন্দু সেন ও আমার একই অবস্থা হয়েছে। আমরা দু'জন মার্কশিট হাতে নিয়ে সেনেট হাউসের থাম ধরে গোলদিঘির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম।

পরীক্ষার কাগজ কী ভাবে দেখা হয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি কয়েকবার পেয়েছি। অনেক বছর আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক ছিলাম। তখন দেখেছি মনোযোগ দিয়ে খাতা দেখেছেন এমন পরীক্ষকের সংখ্যা কম। প্রশ্নের উত্তরে নম্বর দিতে ভুল হলে কিংবা নম্বর যোগ করতে না জানলে কিছু যায় আসে না। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিয়ম আছে, প্রধান পরীক্ষককে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক খাতা পরীক্ষা করে দেখতে হয়। শতকরা কত ভাগ মনে নেই ভাল কাজ করতে গেলে তার চেয়েও বেশি খাতা দেখা দরকার। একবার কলকাতার বাইরে এক স্কুলের খাতা খুলে পরীক্ষকের কাজ পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম, যে শিক্ষক সেখানে পড়িয়েছেন তাঁকে আদর্শ শিক্ষক বললে অত্যুক্তি হবে না। তিনি কে আমি জানি না, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পড়াবার সময় তাম্রশাসন, শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে কী করে ইতিহাস আহরণ করতে হয় ছাত্রদের শিখিয়েছেন, কিন্তু তাদের স্মরণশক্তিকে ভারাক্রান্ত করেননি। আমার ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু অনেক দূরের পথ, তাঁকে ডেকে আনতে সঙ্কোচ হল। যে ভদ্রলোক এসব পরীক্ষার খাতা দেখেছিলেন তাঁর কথা স্বতন্ত্র। বিষয় সম্বন্ধে তাঁর পরিষ্কার জ্ঞান আছে মনে হল না। তাছাড়া খাতা দেখতে গিয়ে নানা রকম ভুল চোখে পড়ে। নিয়মমাফিক তাঁকে ডেকে পাঠানো হল। তাঁকে যে সময়ে আসতে বলেছিলাম তার চেয়ে অনেক পরে এলেন। কয়েকটি খাতা আমি আগে দেখে রেখেছিলাম। তাঁর কতরকম ভুল হয়েছে যখন বুঝিয়ে বলা হল, তখন মনে হল না তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে উশখুশ করতে লাগলেন। আমাকে বললেন, 'আজ থাক স্যার, আমার আবার সিনেমার টিকিট কাটা রয়েছে।' এই কাহিনীটি আমার মনে হল এইজন্য যে, পরীক্ষক ও শিক্ষকদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীর লোকই আছেন। যাঁরা ভাল কাজ করেন তাঁদের বিশেষ কোনো স্বীকৃতি বা আদর নেই। তাঁদের সংখ্যাও কম। ত্রিশ বছরের বেশি এই জিনিস দেখে আসছি। মত পরিবর্তন করবার

কোনো কারণ ঘটেনি। খারাপ পরীক্ষককে কি প্রধান পরীক্ষক সরিয়ে দিতে পারেন ? তাঁর সে ক্ষমতা নেই। তবে অবশ্যই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাতে পারেন। তার ফল অদ্ভুত হতে পারে। একবার, আমি তখন আই· এ· পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক, লক্ষ করলাম একজন পরীক্ষক নিজে খাতা দেখেননি এবং আনুষঙ্গিক গোলমাল আছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রমাণসহ লিখে জানালাম। পরের বছর তিনি আই· এ· পরীক্ষার পরীক্ষক থাকলেন না। অর্থাৎ প্রচলিত ভাষায় তাঁর নাম কাটা গেল। কিন্তু তারপর থেকে তিনি বি· এ· পরীক্ষার পরীক্ষক হলেন। অর্থাৎ চলতি কথায় যাকে 'প্রোমোশন' হওয়া বলে। আমি রিপোর্ট না করলে তাঁর এই 'প্রোমোশন' হতে কয়েক বছর দেরি হত।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল মাস তিনেক পরে বেরিয়ে যেত। তখন কলেজে ভর্তি হবার পালা। এই তিন মাসের ছুটি যে খুব দীর্ঘ মনে হত তা নয়। পড়বার বইয়ের অভাব ছিল না। স্কুলে পড়বার সময় বাংলা বই ছাড়া বিশেষ কিছু পড়িনি। ইংরেজিতে দুর্বল ছিলাম। যখন খুব অল্প বয়স, তখন বাবার সঙ্গে একবার রংপুর থেকে কলকাতায় আসছিলাম। সান্তাহার স্টেশনে আমাদের কামরায় একজন পাদরি সাহেব উঠলেন। তিনি কিছুক্ষণ পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন্ ক্লাসে পড়ি। তারপর পকেট থেকে ঘড়ি বার করে আমাকে সময় দেখতে বললেন। পরদিন সকালে কোনো স্টেশনে, তখন অনেক স্টেশনেই বুক স্টল থাকত, তার একটি থেকে একখণ্ড ডিকেন্সের 'এ টেল অফ টু সিটিজ' কিনে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে উপহার দিতে পারেন কি না। বইটি সেদিন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল। এই আমার প্রথম ইংরেজি বই পুরস্কার পাওয়া। আরও কিছুদিন পরে বাবা আমাকে 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' পড়তে দিয়েছিলেন। প্রথমে খুব ভাল লাগেনি অনেক বার ডিকশনারি দেখতে হয়েছিল। মনে হত গল্পকে টেনে টেনে বড় করা হচ্ছে। পরে অবশ্য এ মত থাকেনি, স্টিভেনশনের ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর যে দীর্ঘ অবসর, সে ইংরেজি গল্প-উপন্যাস দিয়ে ভরাট হয়নি। পুরনো বাঁধানো মাসিক পত্রিকা, বিশেষ করে 'ভারতী', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী' এবং 'মানসী ও মর্মবাণী' বারে বারে পড়েছি এবং বারে বারে নতুন রসের আস্বাদ পেয়েছি। তখন মাঝে মাঝে মনে হত, এখন 'সন্দেশ', 'মৌচাক' পাঠকদের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছি। কিন্তু তাও সত্যি নয়। সন্দেশ-এ তখন সুকুমার রায় নেই, তার অবস্থা পড়ে এসেছে। তবু অবনীন্দ্রনাথের 'খাতাঞ্জির খাতা' বারে বারে পড়ে কী আনন্দ পেয়েছি। সন্দেশ একে অনিয়মিত বেরত, বের হলেও সব সময় পেতাম না। আরও দুঃখের কারণ সন্দেশের মোড়কে আমার নামের উপাধি ভুল করে লেখা হত। একাধিকবার চিঠি লিখেছি, 'আমার উপাধি গুপ্ত, ভুল করিয়া ঘটক লিখিবেন না।' কোনো উত্তর পাইনি, ভুল সংশোধনও হয়নি। একবার সন্দেশ-এ রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা ব্লক করে ছাপা হয়েছিল, গীতাঞ্জলির একটি গান। খুব আশ্চর্য মনে হয়েছিল। তখন পুজো সংখ্যা বলে কাগজের খুব হৈ চৈ ছিল না। শাড়ি ধুতি খুব বিক্রি হত। যাঁরা কলকাতায় চাকরি করতেন বা ব্যবসা করতেন তাঁরা পুজোর সময় অনেক কাপড় কিনে নিয়ে যেতেন। সবই যে ঘনিষ্ঠ

আত্মীয়দের জন্য তা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় আশ্বিনের পুজোর বাজনার সঙ্গে সাটিনের জামার কথা লিখেছেন। সাটিনের জামা কিনবার লোক অবশ্য বেশি ছিল না। বড়দের যাঁদের বইয়ের শখ ছিল তাঁরা 'কুন্তলীন' পুরস্কার কখনও কখনও লাভ করতেন। তার মধ্যে বোধহয় প্রথম খণ্ডে ছিল জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা গল্প। এই গল্প প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। প্রথমে কুন্তলীন বার্ষিকীতে কোনো গল্পে লেখকের নাম থাকত না। তবে একবার পূজা সংখ্যা 'মৌচাক' খুব চমক দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ কবিতা পুজোর মৌচাকে এক সংখ্যায় পেলাম। আগে থেকে কোনো বিশেষ বিজ্ঞপ্তিও ছিল না। প্রথমটি, 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে, উঁকি মারে আকাশে।' তখন আমরা পুজোর ছুটিতে কলকাতার বাইরে। বোধ হয় ডেহরি-অন-শোনে। এই সংখ্যার মৌচাক পেয়ে যাকে 'অনির্বচনীয় ভাব' বলে তাই হল। একথাও মনে হল এই কবিতাগুলি যদি একসঙ্গে না পেয়ে, পেতাম প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে, তাহলে বেশ সাত-আট মাস তারিয়ে তারিয়ে পড়া যেত। এই লিখতে গিয়ে আর একটি আনন্দের কথা মনে হল। 'পার্বণী'র প্রথম খণ্ডের কথা আগে বলেছি। তাতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনেকগুলি কবিতা ছিল ফুলের উপর। তখন কী রকম অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল। ভাল করে বুঝবার বয়স তখনও হয়নি।

যাই হোক, ছুটির দিন এই রকম করে কাটছে। তখন 'কল্লোল' কাগজ নিয়ে প্রথম উচ্ছ্বাস আরম্ভ হয়েছে। ইংরেজি লেখকদের প্রতি যতটা না হোক, ইউরোপের অন্য অংশের লেখকদের প্রতি আগ্রহ খুব বেশি। নরওয়ের ঔপন্যাসিক যোয়ান বোয়েরের বই পড়া তখনকার ফ্যাশান। দুপুরবেলায় 'গ্রেট হাঙ্গার' পড়বার চেষ্টা করছি। একটা ছুটির দিনে বাবা আমাকে ডেকে বললেন, 'ইংরেজি কবিতা পড়বি। তাহলে যা ইচ্ছা একটা গ্রন্থাবলী নিয়ে আয়।' আমি শেলি নিয়ে গেলাম। প্রথম যে কবিতা পড়ি সেটা 'ওড টু ওয়েস্ট উইণ্ড'। তার কারণ বোধহয় রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে মিল আছে কি না, বা কতটা মিল আছে দেখবার জন্য। আর 'মানসী ও মর্মবাণী'তে কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ স্কুলের ছেলেদের ওয়েস্ট উইণ্ড পড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ তাদের টেনিসনও পড়াতেন। কিন্তু টেনিসনকে দিয়ে আমি শুরু করিনি। শেলি, কিটস ও ব্রাউনিংয়ের পাঠ আমি বাবার কাছে থেকে নিয়েছি। কিটস-এর 'ওড টু অটাম' এই সময় পড়ি। মনে আছে তার একটি ছত্র—'And watch the last oozings hour by hour।' এ পড়ে একটি অপরূপ ছবি মনে হয়েছিল, এখনও মিলিয়ে যায়নি। পরে শেক্সপিয়র পড়বার কথা উঠল। বাবা জিজ্ঞেসা করলেন, 'কী নাটক পড়বি ?' আমি উত্তর দিলাম, 'জুলিয়াস সিজার।' তখন স্কুলের ছেলেদের অনেক সময় জুলিয়াস সিজার থেকে কিছু অংশ মুখস্থ করিয়ে রাখা হত। আমার পরিণত বয়স পর্যন্ত পড়ার আসর বন্ধ হয়নি। শেষ শেক্সপিয়রের বই আরম্ভ হয়েছিল অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিয়োপেট্রা। আমি পছন্দ করিনি, বাবা পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু পড়া শেষ হয়নি। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল।

জুন মাসে পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেল আগে বলেছি। তখন শোনা যেত যে

প্রেসিডেন্সি কলেজে সহজে ভর্তি হওয়া যায় না। বাবা সাধারণত সংসারের কিছুই খোঁজখবর রাখতেন না। তবু আমাকে একবার ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হতে পারবি তো ? ভর্তি হওয়াটা কী রকম কঠিন হতে পারে আমার কোনো ধারণা ছিল না। যাই হোক, ভর্তি হবার ফর্ম নিয়ে এলাম। আমার সঙ্গী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বিবেচনা আমার চেয়ে বেশি ছিল। তাঁরা সেখান থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজে গিয়ে সেখানকারও ফর্ম আনলেন। দেখাদেখি আমিও নিলাম। যাঁরা ভর্তি হওয়া সম্বন্ধে আরও সন্দিহান তাঁরা সিটি, বঙ্গবাসী, আশুতোষ ইত্যাদি সব কলেজের ফর্ম বিদেশী ডাকটিকিট সংগ্রহ করবার মতো সংগ্রহ করলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন ভর্তি হবার জন্য মনোনীত ছাত্রদের নাম টাঙিয়ে দেওয়া হল দেখলাম তার মধ্যে আমিও আছি। যত দিন না এই তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল ততদিন প্রায় রোজই নানা রকম গুজব শুনে দল বেঁধে প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়েছি। রোজ দুপুরে কলেজে যাওয়া আমার যে খারাপ লাগত তা নয়। উত্তর কলকাতা, কলেজ স্ট্রিট পাড়া, আমার প্রায় অজানা ছিল। কলকাতার সেই মুখ আজ প্রায় ষাট বছর ধরে দেখছি। কখনও পুরনো বলে মনে হয়নি।

যেদিন কলেজে ভর্তি হবার জন্য মনোনীত ছাত্রদের নাম টাঙিয়ে দেওয়া হল সেদিন আমাদের দলের সুরেন্দ্রনাথ রায়, যে ক'জন ছিল তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চাঁদা তুলল। তখনও বুঝিনি কী জন্য। তারপর সবাইকে নিয়ে হ্যারিসন রোডে দিলখুশ কেবিনে ঢুকে গেল। যে চাঁদা উঠেছিল তাতে চা আর চপের বেশি খরচ করার উপায় ছিল না। সুরেন রায়ের ভাবভঙ্গিতে মনে হল দিলখুশে খাওয়া তার কাছে নতুন নয়। আমার পক্ষে বাইরে খাওয়া সেই প্রথম। কিন্তু আরম্ভ বেশ ভাল হয়েছিল। এর পরে সুরেন রায় ও আমি পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক জায়গার খাবার খেয়েছি কিন্তু দিলখুশের সেই অপরাহ্ণের খাওয়ার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। অল্পদিন আগে সুরেন রায়ের মৃত্যু হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি, এই খাওয়ার কথা তার মনে ছিল কি না। সুরেন রায় বিজ্ঞানের ছাত্র। আমার বছরখানেক আগে ইংলণ্ডে গিয়েছিল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে। আমি লণ্ডনে গেলাম তার বছর দুয়েক পরে। লণ্ডনে পৌঁছবার পরদিন দুপুরবেলায় টটেনহাম কোর্ট রোড পার হতে গিয়ে হোর্ন ব্রাদার্সের পোশাকের দোকানের সামনে অপ্রত্যাশিত ভাবে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে কোনো কাজে দু'একদিনের জন্য লণ্ডনে এসেছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের কথা ছেলেবেলা থেকে শুনেছি। আমার বাবা ওখানকার ছাত্র ছিলেন। আমার পিতামহও ওখানে আইন পড়েছিলেন শুনেছি। তখন ওখানে আইনের ক্লাস হত। তাছাড়া আমার মামার বাড়ির অনেকে পড়েছিলেন। তাই কখনও অজানা বলে মনে হয়নি। পরে অবশ্য চারভাই ওখানে পড়েছি। প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকে যে জিনিস আমাকে অভিভূত করেছিল সে ওখানকার লাইব্রেরি। এখনকার ছাত্ররা সে জিনিস দেখেনি, নতুন

মাস্টারমশায়রাও নন। যাঁরা জানতেন তাঁরা অনেকেই নেই এবং যাঁরা আছেন তাঁরা অবসর নিয়েছেন। হালের নিয়মে বইকে লোহার খাঁচায় পুরে ছাদ এবং দেয়ালের সঙ্গে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এর ফলে মই বেয়ে উপরে না উঠলে কিছু দেখা যায় না। উঠলেও ভাল করে দেখা যায় না। যাঁরা পড়তে চান তাঁদের অর্ধেক আনন্দই মাটি। ময়রার দোকানের একটা বড় আনন্দ হচ্ছে মিষ্টি খাবার আ'গে মিষ্টি চোখে দেখা। সেই চোখের আনন্দ থেকে সবাই বঞ্চিত। এখন অনেক বইমেলা হচ্ছে। সবাই জানেন বই চোখে না দেখতে পেলে অর্ধেক বই পড়বার কথাই মনে হয় না। বই যদি আলমারিতে না থাকত তাহলে উত্তরের দেয়ালের আলমারিতে রাখা ইজিপ্টের যেসব ইতিহাসের বই পড়েছি কিংবা পাতা উলটে দেখেছি তা কখনও সম্ভব হত না। যাঁরা এই ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা ভাল ভেবেই করেছিলেন, কিন্তু ভাল বই চোখে দেখার বিকল্প আর কিছু নেই।

কলেজ স্ট্রিট থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকলে আর একটি লক্ষ করার বিষয় ছিল এখানকার ছাত্রদের কমনরুম। আর্টস বিল্ডিংয়ে ঢুকলেই ডানদিকে ছাত্রদের জন্য দুটি ঘর। একটি খেলাধুলার জন্য, টেবিল টেনিসের বলের শব্দে সর্বদা

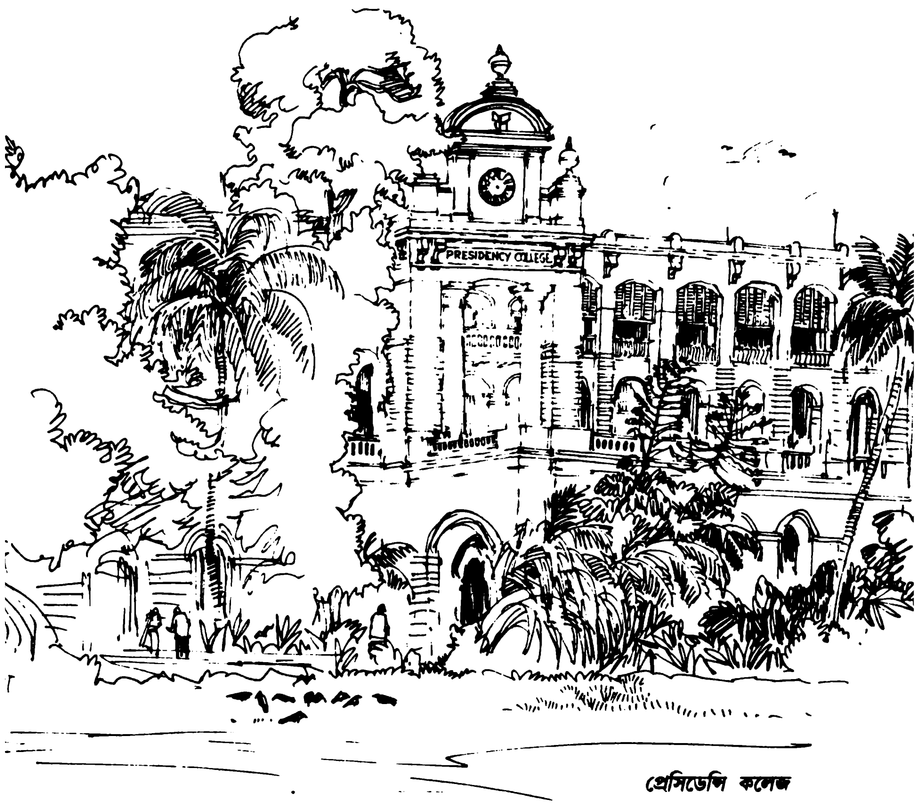

প্রেসিডেন্সি কলেজ

মুখরিত। সে ঘরে কদাচিৎ গিয়েছি। তার পাশের ঘরে ছাত্রদের গল্পগুজব করবার জায়গা। সেখানে অনেক রকম দেশী, বিলিতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা, যেমন স্ট্র্যাণ্ড কিংবা পিয়ারসন'স নিয়মিত পাওয়া যেত। মনে আছে এইখানে প্রথম ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ দেখতে পাই। কিছু কিছু বিলিতি কাগজ বাড়িতেও দেখতে পেতাম কিন্তু ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ-এর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। এখনকার ছাত্রছাত্রীরা কমনরুমে এই বহুবিখ্যাত কাগজটি দেখতে পান না। কাগজটি এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন ইজিপ্টে প্রাচীন রাজাদের সমাধি খুঁড়ে অনেক জিনিস বের করা হচ্ছে। ইজিপ্ট ও মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের নতুন কথা জানা যাচ্ছে। এর সবই ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ-এ পরিষ্কার করে বলা হত। তার আগে পৃথিবীর এই অংশ ছিল অনেকের কাছে গল্প-উপন্যাসের বাহন মাত্র। সেখানকার প্রাচীন দিনের জীবন ও বর্তমান কালের কথা সবই সত্য ও কল্পনা মিশিয়ে ঝাপসা করে দেখা হত, যেমন তিনশো বছর আগে সাধারণ ইংরেজরা ভারতবর্ষকে দেখত। সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঞ্চ ও বোধহয় এখানে দেখে অবাক হয়েছিলাম। পাঞ্চএর সঙ্গে কিছু পরিচয় আমার আগেই ছিল। এই কমনরুমের খবরদারি করত একটি পরিণত বয়স্ক বেয়ারা, শ্রীমন্ত। খুব নিরীহ মুখ, কিন্তু কিছুদিন পরেই বোঝা যেত সেটি তার মুখোশ মাত্র। সব দিকে নজর রাখতে পটু। ভদ্র ও বিনয়ী। কখনও তার সম্বন্ধে কোথাও নালিশ হয়েছে বলে শুনিনি।

এর পরে উপরে ওঠবার বড় সিঁড়ি। সিঁড়ির পশ্চিমে লাইব্রেরি। প্রেসিডেন্সি কলেজে সেই চওড়া সিঁড়িতে বহু পণ্ডিত অধ্যাপক এবং ছাত্র, ভবিষ্যতে যাঁরা দেশের নায়ক বলে পরিচিত হয়েছেন তাঁদের পায়ের ধুলো পড়েছে। যাঁর কথা প্রথমে মনে পড়ছে তিনি ইংরেজির অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। সাহিত্যের অধ্যাপনা কাকে বলে তাঁকে দেখে বুঝেছি। অধ্যাপক ঘোষের হাতে সবসময় একটি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ থাকত। গায়ে লম্বা কোট, পায়ে সব ঋতুতেই মোজা। আমরা যখন দেখেছি তখন তাঁর পরিণত বয়স। যৌবন বয়সে সুপুরুষ না হোক দেখতে নিন্দনীয় ছিলেন না। আমি তো ইতিহাস অনার্সের ছাত্র, ইংরেজিতে 'পাস' কোর্স পড়েছি, কাজেই প্রফুল্লবাবুকে সে রকম ভাল করে পাইনি। তাছাড়া আজকাল কোথাও কোথাও ছেলেদের মন কাড়বার স্পৃহা দেখা যায়, সে যুগে সেটা ছিল না। তখনকার দিনে পাস কোর্সে শেক্সপিয়রের একটি ট্র্যাজেডি ও একটি কমেডি পড়ানো হত। আমাদের সময় পাঠ্য ছিল 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'। তার আগে প্রফুল্লবাবু 'টুয়েলফ্‌থ নাইট' পড়িয়ে নিলেন। অর্থাৎ পাত্রে আসল খাদ্য পরিবেশন করবার আগে রসনাকে স্বাদগ্রহণ করতে শেখানো। ছেলেদের দ্বিগুণ লাভ হল। রসহানি না করে প্রত্যেক লাইন কীভাবে পড়ানো যায় প্রফুল্লবাবু তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আমার খুব ইচ্ছে হত যে ওঁর কাছে একদিন শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি পড়ানো শুনি, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। তখন আমাদের এমন সাহস ছিল না যে, এ নিয়ে আবদার করি।

কলেজের তেতলায় এক নম্বর ঘরে আমাদের বড় ক্লাস হত। উত্তরে বহুদূর বিস্তৃত নীল আকাশ, ওয়াই· এম· সি· এ·র লাল বড় বাড়ির ছাদ দেখা যায়।

তৃতীয় বছরের ক্লাসের কথা মনে হচ্ছে। বড় জানালার সামনে মাস্টারমশায় জাদুকরের মতো ফরেস্ট অব অরডেনের দৃশ্যপট খুলে ধরছেন আবার গুটিয়ে নিচ্ছেন। একজন ছাত্রী তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, এতক্ষণ চোখের সামনে কোট গায়ে দেওয়া বুড়ো মাস্টারমশায় এক মুহূর্তে সুন্দরী ডেসডিমনা হয়ে গেলেন। এরকম দৃশ্য আমরাও দেখেছি। অধ্যাপকমশায় রোজালিণ্ড থেকে অর্ল্যাণ্ডো হয়ে যাচ্ছেন। প্রথম শরতে মধ্যাহ্নের আলোকে ফরেস্ট অব অরডেন কলেজ স্ট্রিটের গোলমাল ছাপিয়ে ঝলমল করছে।

আমার অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁর কথা প্রায় সব সময় মনে পড়ে তিনি সোমনাথ মৈত্র। খুব জনপ্রিয় অধ্যাপক যাঁদের বলা হয়, তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন না। কিন্তু অধ্যাপনার গুণ ও স্নিগ্ধ ব্যবহারে বহু ছাত্রের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। তাঁর কথা মনে হলে তাঁর ছাত্রদের যে শব্দ প্রথম মনে হয়, সে হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। পরিচ্ছন্নতা শুধু পোশাকে নয়, আচরণেও। তাঁর সংযত ভদ্রতা ও সযত্ন শব্দনির্বাচন স্বভাবতই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তিনি আমাদের প্রথম বার্ষিক ক্লাসে ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। আমি তাঁর প্রথম ছাত্রদের একজন। আমার পড়ার প্রধান বিষয় ছিল ইতিহাস। কাজেই আই. এ. ক্লাসের পরে আমি আর তাঁর কাছে পড়িনি। কিন্তু তাহলেও কলেজে এবং কলেজের বাইরেও একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তখনকার দিনে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তিনিই আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন, অলডুস হাক্সলি ও মাইকেল আরলেন। হাক্সলির সঙ্গে পরিচয় হয়তো পরে হত, কিন্তু মাইকেল আরলেনের কথা বলতে পারব না। মাইকেল আরলেনের খ্যাতি তখন একদল পাঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে জনপ্রিয়তাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। যদিও তখন বাঙালি গল্পলেখকদের উপর তাঁর প্রভাব পড়েছিল। অধ্যাপক মৈত্র কবিতা পড়ে শোনাতে ভালবাসতেন। তখনকার আকাশবাণীর শ্রোতাদের কারু কারু তাঁর সেই কণ্ঠস্বর হয়তো মনে আছে।

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য সংস্কৃত ও বাংলা পড়াতেন। অর্থাৎ পণ্ডিতমশায়, কিন্তু অন্য ধরনের পণ্ডিতমশায়। শুনেছিলাম যৌবনে রসায়নবিদ্যার চর্চা করেছিলেন। মুগ্ধ হয়েছিলাম রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখে। সংস্কৃত ছাড়াও অন্য একাধিক বিষয়ে তাঁর অনুরাগ ছিল। পুজোর ছুটির আগে দেখেছি চারটে বাজলে নানা বিদেশী নাটকের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে বাড়ি অর্থাৎ ভাটপাড়া চলেছেন। তাঁর কাছে ভবভূতির নাটক ও মনুসংহিতার কিছু কিছু অংশ পড়েছি। দুঃখ এই যে, তাঁর কাছে কালিদাস পড়িনি। তাঁর কাছে বঙ্কিমচন্দ্রও পড়েছি। সেও আমার কাছে দুর্লভ অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়েছে। পণ্ডিতমশায়ের বেশভূষা ও কোনো কোনো আচরণ প্রাচীন পণ্ডিতমশায়ের মতো, কিন্তু মন ও বিচারশক্তি আধুনিক। এরকম আর কাউকে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।

প্রেসিডেন্সি কলেজের আরও দু'তিন জন অধ্যাপকের কথা বলব। একজন অপূর্বকুমার চন্দ। তার কয়েক বছর আগে অক্সফোর্ড থেকে ফিরেছেন, কিন্তু ছাত্রজীবনের পরিচয় কথাবার্তা ও ব্যবহারে তখনও মিলিয়ে যায়নি। কথাবার্তায় হঠাৎ চমকে দিতে পারতেন। কোনো হিসাব না করে বই কিনতেন এবং

বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য ছিল না। তখন 'শেষের কবিতা' সবে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো মহলে গুজব ছিল অপূর্বকুমার চন্দের কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ অমিত রায়ের ছবি এঁকেছিলেন। অপূর্বকুমার চন্দ নিজেও বোধহয় সেকথা বিশ্বাস করতে ভালবাসতেন।

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ইংরেজি কবিতা পড়িয়েছিলেন। শ্রীকুমারবাবু পড়াচ্ছেন 'Young pastures blind with rain,' ম্যাথু আরনল্ডের স্কলার জিপসি থেকে। সেদিন আকাশে খুব মেঘ, থেকে থেকে বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া। এই পরিবেশে এই উক্তি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। এখনও বর্ষার সময় সেই পঙ্‌ক্তি এবং সেই ক্লাসের কথা আমার মনে পড়ে।

অধ্যাপক কুরুভিল্লা জ্যাকেরিয়ার কথা না বললে প্রেসিডেন্সি কলেজের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমার মনে হয়েছে কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি সব সময় সুবিচার করেননি। তাঁর মতো পণ্ডিত অধ্যাপক যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্লভ। আমাদের সময় তিনি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়াতেন। তখন অধিকাংশ ছাত্র কলেজে পড়বার সময় ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো ধারণা নিয়ে আসত না। কাজেই অধ্যাপক জ্যাকেরিয়া যতই ভাল পড়ান না কেন, প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে তার যথেষ্ট ফল পাওয়া যেত না। সে জমি ফলদানের পক্ষে যথেষ্ট উর্বর ছিল না। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অনার্স ক্লাসে অধ্যাপক জ্যাকেরিয়ার গ্রীস দেশের ইতিহাস পড়াবার ফল ফলতে দেরি হত না। গ্রীসের প্রাচীন লিপি, মুদ্রা, সাহিত্য, বিশেষ করে নাটককে কী করে ইতিহাসের কাজে ব্যবহার করা যায়, সে জিনিস তাঁর কাছে শিখেছিলাম। গ্রীক নাটক ও কবিতা পড়তে আগ্রহ জন্মেছিল। অনেক দিন পরে তাঁর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে দেখা হয়েছিল। আমি রেকর্ডস কমিশনের অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে কোথায় দেখেছি, প্রেসিডেন্সি কলেজে না?'

ইতিহাসের গবেষণা শিখতে হলে রাস্তা পেরিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিংএ আসতে হবে। সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপক হিসাবে আমার জীবনের প্রায় পঁচিশ বছর কেটেছে। আশুতোষ বিল্ডিংয়ের তেতলায় অধ্যাপকদের বসবার ঘর। ঘরটি বড় কিন্তু কোনো শ্রী নেই। সেই ঘরে প্রতিদিন বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সমাগম হত। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, হেমচন্দ্র রায়। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কদাচিৎ আসতেন। তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথ সেন ও সুকুমার সেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ কখনও কখনও এসে শব্দের ফুলঝুরিতে সবাইকে চকিত করে চলে যেতেন। এর মধ্যে যে দু'জনের কাছে আমার ঋণ সবচেয়ে বেশি তাঁরা হলেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগের ইতিহাসের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন। অধ্যাপক রায়চৌধুরী বই কম লিখেছেন। প্রধানত একটি বইয়ের জন্য তাঁর খ্যাতি। তাঁর পড়াবার রীতি এবং গবেষণা দুইই অনন্যসাধারণ। ক্লাসের সময় ছাত্রদের এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হবার উপায় ছিল

না। যা বলতেন, যা লিখতেন, তার একটি কথারও যোগবিয়োগ করা চলত না। তাঁর লেখা বা পড়া অনেকটা ক্যামেরার ক্লোজ-আপের মত।

প্রকৃতপক্ষে যিনি আমার গুরু, যাঁর কাছে ইতিহাসচর্চার রীতি শিক্ষা করেছি, তিনি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হবার সময় থেকেই ইচ্ছা ছিল তাঁর কাছে ইতিহাসের পাঠ নেব। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসের গবেষক হিসাবে তিনি আমার আদর্শ ছিলেন। মারাঠি ভাষা ছাড়া পর্তুগিজ জানতেন। ফার্সিও কিছু কিছু শিখেছিলেন। মারাঠি ভাষা প্রায় মাতৃভাষার মত বলতে পারতেন। ফরাসি ভাষা ভাল জানতেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উপর দখল ছিল। বাংলাদেশের পাখি সম্পর্কে একটি ছোট বই লিখেছিলেন। ভাল বিদেশী নাটক পড়তেন। বিদেশী ভাল গোয়েন্দা কাহিনীর প্রতি অনুরাগ শেষ বয়েসে জন্মেছিল।

মহারাষ্ট্র কিংবা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাস ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তাঁর ছাত্রের মন ঘুরে বেড়াবে এটা তাঁর পছন্দ ছিল না। বলতে গিয়ে হঠাৎ 'লিপিকা'র একটি গল্প মনে পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের 'পুনরাবৃত্তি' গল্পে ছাত্র কৌশিক তাঁর অধ্যাপকের ভর্ৎসনা শুনে বলেছিল,"আমার অনুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও নানা জিনিসে।' অধ্যাপক বললেন, 'সে সব অনুরাগ ছাড়ো।' কৌশিক বলেছিল, 'তাহলে বিদ্যার প্রতিও আমার অনুরাগ থাকবে না।'

আমার সঙ্গে আমার গুরুর কথোপকথন এতটা নাটকীয়ভাবে অবশ্য হয়নি। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসবে কলেজ প্রাঙ্গণে অন্য কাজের ফাঁকে কথা হয়েছিল। সে যুগে রুচিরাদের দেখা পাওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু পরবর্তীকালে গুরুর উপর প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। তার ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়েছি।

সুরেন্দ্রনাথ সেন কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছিলেন। ঢাকায় পড়বার সময় অধ্যাপক র‍্যামসবটম (R. B. Ramsbotham) এক সময় তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। সে সাহায্য সুরেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি। কিন্তু দু'জনের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক চিরকাল বজায় ছিল। ১৯৫৫/৫৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে হাই স্ট্রীটে দেখা হওয়া মাত্র ষাট বছরের বেশি বয়সের শিষ্য ভিড়ের মধ্যে নিচু হয়ে বসে প্রায় আশি বছরের গুরুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। অধ্যাপক র‍্যামসবটম 'সুরেন্দ্র' বলে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। এ আমার শোনা কথা, কিন্তু কাহিনীটি অবিশ্বাস করতে পারছি না। এক বছর পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রায় অনুরূপ দৃশ্য আমার চোখে পড়েছিল।

এখনকার অধ্যাপকদের তুলনায় তখনকার অধ্যাপকরা কেমন ছিলেন ? তুলনা করা যায় কিনা জানি না। একটা কথা হয়তো বলা যেতে পারে। উৎসাহী, পরিশ্রমী ও পণ্ডিত শিক্ষকদের সংখ্যা চিরকালই কম। কিন্তু ক্লাস হচ্ছে না, মাস্টারমশায়েরা মন দিয়ে পড়াচ্ছেন না, এ রকম ঘটনা তখন যে একেবারে হত না তা নয়, কিন্তু কম। কেউ কেউ আসতেন পনের মিনিট দেরি করে। তার একটা কারণ হতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রান্তে পর পর ক্লাস

থাকলে সকলেরই স্বভাবত আসতে একটু বিলম্ব হয়। অবশ্য ক্লাস একটু আগে ছেড়ে দিলে দু' পক্ষেরই হয়তো আনন্দের কারণ হত। কিন্তু একথা মনে হয় না যে, দু' বছর ধরে ফাঁকি দিয়ে এমন কয়টি বিষয় পড়িয়ে দেওয়া হল যা পরীক্ষায় আসতে পারে, কিন্তু বিষয়টি সম্বন্ধে ছাত্রদের কিছু বোঝাবারই চেষ্টা হল না। এখন মনে হচ্ছে পঞ্চাশ বছর আগেকার ছাত্ররা এখনকার ছাত্রদের চেয়ে বোধহয় সুখী ছিল। এখনকার ছাত্ররা হয়তো বলবে পরের বাগান সব সময়েই বেশি সবুজ দেখায়।

এতক্ষণ যা বলেছি সে আমার মাস্টারমশায়দের কথা, যাঁদের কাছে পড়েছি। সে ছাড়া আরও দু' একজনের কথা বলা দরকার যাঁদের সান্নিধ্য আমি পেয়েছি। অনেক মাস্টারমশায়ের কাছে সেরকম পাইনি। তার মধ্যে প্রথমে বোধহয় নাম করা উচিত ফিজিক্সের অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের। তাঁর নানা বিষয় সম্বন্ধে লেখা আমি পড়েছিলাম। কাজেই তাঁর নাম অপরিচিত ছিল না। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি নিয়ম হয়েছিল যে, আর্টসের ছেলেদের ছোট ছোট দলে একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাছে পাঠ নিতে যেতে হবে সপ্তাহে একঘণ্টা। এইভাবে বিজ্ঞানের ছাত্রদেরও আর্টসের অধ্যাপকদের কাছে একঘণ্টা পাঠ নিতে হত। একে বলা হত অক্সফোর্ড টিউটোরিয়াল। আমি যাঁর কাছে পড়েছিলাম তিনি অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

তাঁকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, মুখে অল্প দাড়ি, প্রায়ই মুগার পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে আসতেন। আমার একজন সহপাঠী বলত, হাতে একটা ফিতে নিলেই তাঁকে ঠিক ওস্তাগরের মতো দেখাবে। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের শিক্ষক ছিলেন। এই সময় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সাধারণ পাঠকদের জন্য 'খাদ্য' বলে একটি বই লিখছিলেন। তার পাণ্ডুলিপি আমাদের প্রায়ই পড়ে শোনাতেন এবং কখনও কখনও ফিজিক্সের নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাতেন। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের একটি বেয়ারা ছিল, নাম রামধারী। তার এক্সপেরিমেন্টে অতি নিপুণ হাত। সন্দেহ হত, বহু ছেলেকে সে পরীক্ষায় তরিয়ে দিয়েছে। রামধারীর অনেক গুণ ছিল। যখন ফিজিক্স থিয়েটারে রিহার্সাল হত, রামধারী আমাদের চা করে খাওয়াত। প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চিনত। যখন পুজোর আগে কলেজে থিয়েটার হত, তখন স্টেজে আলো ফেলবার ভার রামধারীর উপর থাকত। আলোর এত কারিগরি তখন আবিষ্কার হয়নি। একটি প্রজেকটার, স্লাইডের বাক্স ও একা রামধারী ভরসা ছিল। এবিষয়ে রামধারী কারুর কোনো উপদেশ মেনে চলত না। তার স্বাধীন সত্তা থেকে থেকে বিদ্রোহ করত। খুব করুণ দৃশ্যে যেখানে চন্দ্রোদয় হচ্ছে এবং নায়ক-নায়িকার আসন্ন বিদায় বোঝাতে ম্লান নীল বা সবুজ আলো ব্যবহার করবার কথা, রামধারী সেখানে উত্তেজিত হয়ে লাল স্লাইড দিয়ে রাখল। সমস্ত স্টেজ টকটকে লাল হয়ে উঠল। এরকম কাণ্ড বহুবার ঘটেছে।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায়ের ক্লাস করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হল তিনি একসময় আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন এবং তার ফলে ক্লাস ফাঁকি দেবার কথা ভাবতে পারতাম না। তাছাড়া তাঁর থিয়েটারে খুব উৎসাহ ছিল, কাজেই আমার সঙ্গে আর-একটি

বন্ধনও যুক্ত হল। তাঁর সঙ্গে এই সৌহার্দ টিউটোরিয়াল শেষ হয়ে যাবার পরেও শেষ হয়ে যায়নি, তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল। অবসর নেবার পর তিনি বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগে কর্তা হয়েছিলেন। রবীন্দ্ররচনাবলী তাঁর চেষ্টায় ও যত্নে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তখন বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। চারুচন্দ্র কয়েক হাজার টাকা ধার করে এই কাজ আরম্ভ করলেন। জনশ্রুতি—ধারের কথা শুনে রবীন্দ্রনাথও শঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু এর ফল কী হয়েছিল পরবর্তীকালে দেশবাসী দেখতে পেয়েছেন। চারুচন্দ্র ভাল অধ্যাপক ছিলেন, গুণী লোক ছিলেন, ছাত্রদের সুহৃদ ছিলেন। গল্প শোনা যায়, তিনি যখন ছাত্র ছিলেন, কলকাতার সমস্ত অভিনয়ের প্রথম রজনীতে উপস্থিত থাকতেন। এর জন্য গভীর রাত্রে ছাত্রাবাসের প্রাচীর টপকানো প্রভৃতি আনুষঙ্গিক অসুবিধা তিনি গ্রাহ্য করতেন না। শেষের দিকে তিনি 'বসুধারা' নামে একটি কাগজ সম্পাদনা করতেন ও 'অথ নট ঘটিত' বলে থিয়েটার সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন। সমস্ত বইটা বাড়িতে এসে আমাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরীও সে আসরে উপস্থিত থাকতেন।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আসল যোগসূত্র রবীন্দ্রনাথ। প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল এইভাবে। খুব ছেলেবেলায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পরিচয় প্রকাশ করছিলেন। সে হচ্ছে বাইরের পরিচয়, অর্থাৎ কোন গ্রন্থ কবে প্রকাশ হয়েছিল, কত সেন্টিমিটার লম্বা, কত সেন্টিমিটার চওড়া, কত পৃষ্ঠা ইত্যাদি। এসব কথা তখন কেউ লিখতেন না, কাজেই দেখে খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল। পরে অধ্যাপক মহলানবিশের অন্য লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু ব্যক্তিটির সঙ্গে পরিচয় হওয়া অত সহজ হয়নি। যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হল, তখন থেকে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ যখন সভায় আসতে লাগলেন এবং কবিতা পড়ে শোনাতে লাগলেন তখন আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশি হতে লাগল। আমার যখন পরিণত বয়স, তখন সে বন্ধন দৃঢ়তর হয়েছিল। আমার আমন্ত্রণে একবার বিশ্বভারতীতে এসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার পাঁচ'ছ বছর পরে তাঁর 'আম্রপালী' গৃহে বসে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় তিনি আমার পিতার কাছে কী কী আইনের পরামর্শ নিতেন সেকথা বলেছিলেন। আমি এর কিছুই জানতাম না। আরও পরে তাঁর যখন শেষ অসুস্থতা, তখন তিনি দক্ষিণ কলকাতার একটি নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছে। কাগজে খবর দেখে অপারেশনের দু'একদিন আগে দেখতে গেলাম। সিসটারকে বলেছিলাম দশ মিনিটের বেশি থাকব না। ঘরে আর কেউ ছিলেন না। মনে হল প্রশান্তবাবু আমাকে দেখে খুশি হলেন। বোধহয় অনেকক্ষণ একা ছিলেন বলে আমাকে বললেন, 'বোসো।' তারপর অনর্গল নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন। আমার মনে হতে লাগল, এত পরিশ্রম তাঁর উচিত হচ্ছে না। বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। আমার অবস্থা দেখে তিনি আমার মণিবন্ধ ধরে বসিয়ে রাখলেন এবং

খানিকক্ষণ এ অবস্থায় বসে থাকবার পর আমাকে বললেন, 'জানোই তো বয়স হয়েছে। অ্যাবডোমেন ওপেন করে কী পাবে তা তো জানা নেই।' কাজেই তখনই চলে আসা সম্ভব হল না। অপারেশনের পর কাগজে দেখেছিলাম একটু ভাল আছেন। তারপরের খবর তো সকলেই জানেন।

আর একজনের কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। তিনি গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার। উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারের বন্ধু। এক সময় রংপুরে ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হবার পর তাঁকে দেখলাম এবং চিনতে পারলাম। তিনি অবশ্য আমাকে চিনতে পারেননি। তাঁকে চিনতে পারার কারণ এই যে তাঁর চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ঘন ঘন সুপুরি খেতেন, দেখলাম সে অভ্যাসের পরিবর্তন হয়নি। তাঁর বাড়ি এবং আমার মাস্টারমশায় সুরেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ি বালিগঞ্জে একটি সরু রাস্তার উপরে একেবারে মুখোমুখি। আমার মাস্টারমশায় তখন দিল্লিতে থাকতেন। কাজে কলকাতায় আসতে হত দু'একদিনের জন্য, তখন অধ্যাপক গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার এবং তাঁর বাড়ির মেয়েরা তাঁকে দেখাশোনা করতেন। আমাকে আসতে দেখলে গিরিজাবাবু বলতেন, এইবার স্বামী-শিষ্য সংবাদ আরম্ভ হবে। আমরা উঠি।' গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার বললে আজকাল বেশি লোক তাঁকে মনে করতে পারবে না, কিন্তু তাঁর ছেলে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে লোকে অনেক বেশি চেনে, যিনি গান লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন।

যাদের সঙ্গে স্কুলে পড়েছিলাম তারা সবাই প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়নি। খুব ভাল ছেলেরাও সবাই নয়। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে যারা প্রেসিডেন্সি কলেজে এল তাদের মধ্যে নাম করা যায় অমলেন্দু সেন, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ রায় ও চারুচন্দ্র দাশগুপ্তের। নতুন করে যাদের সঙ্গে পরিচয় হল তারা হচ্ছে অমিয়রঞ্জন রায়চৌধুরী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, প্রবোধরঞ্জন গুপ্ত, ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, অমিয়প্রসাদ মৈত্র, সুবোধচন্দ্র মিত্র, বীরেন রায়, নিখিল গঙ্গোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য। মোহনলাল ও মহিমারঞ্জন আমাদের দু'এক ক্লাস নীচে পড়ত। তাতে বন্ধুত্বের অসুবিধা হয়নি। মোহনলালের নাম সর্বত্র পরিচিত। মহিমারঞ্জন সাহিত্যিক ছিলেন। ফটোগ্রাফিরও হাত ছিল। এখন প্রবাসী বাঙালি হয়ে গিয়েছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে ভাল স্কুলে যারা পড়েছিল তাদের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হল। বুঝতে পারলাম সে সব স্কুলে কত ভাল করে পড়ানো হয়, যার স্বাদ আমরা পাইনি। তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সি কলেজ বলতে একটি বিশেষ মননশীল ছাত্রসমাজকে বোঝাত, শিক্ষকদের সম্বন্ধেও সেই কথা। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইচ্ছা করলে এম· এ· পর্যন্ত পড়া যেত। দু'একটি বিষয়ে এম· এ·-র সব ক্লাসই অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত, আশুতোষ বিল্ডিং ও দ্বারভাঙা বিল্ডিংএ। আশুতোষ বিল্ডিং তখন সম্পূর্ণ হয়নি, দোতলা পর্যন্ত হয়েছে। তখন যে সেনেট হল ছিল, তার কোনো অস্তিত্ব নেই। সেটিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। এ ঘটনা আমাদের সবায়ের খুব দুঃখের কারণ হয়েছিল।

পুরনো মাস্টারমশায়দের কেউ কেউ দু'একটি ভগ্ন অস্থি সযত্নে রক্ষা করছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে যাদের সঙ্গে নতুন করে আলাপ হয়েছিল তাদের মধ্যে অমিয়রঞ্জন রায়চৌধুরীর নাম আগেই বলেছি। অমিয়রঞ্জন অন্য ছেলেদের চেয়ে নানা কারণে স্বতন্ত্র। বাংলা ছাপা বই অনেক পড়েছি বলে আমার গোপন অহঙ্কার ছিল। দেখলাম অমিয়রঞ্জন আমি যা পড়েছি তার সবই পড়েছে, বোধহয় বেশিই পড়েছে। বটতলার বই আমি বিশেষ পড়িনি কিন্তু অমিয়রঞ্জনের সেখানে অবাধ গতিবিধি। পুরনো বাংলা সাহিত্যেও তাই। তাছাড়া ইংরেজিতেও

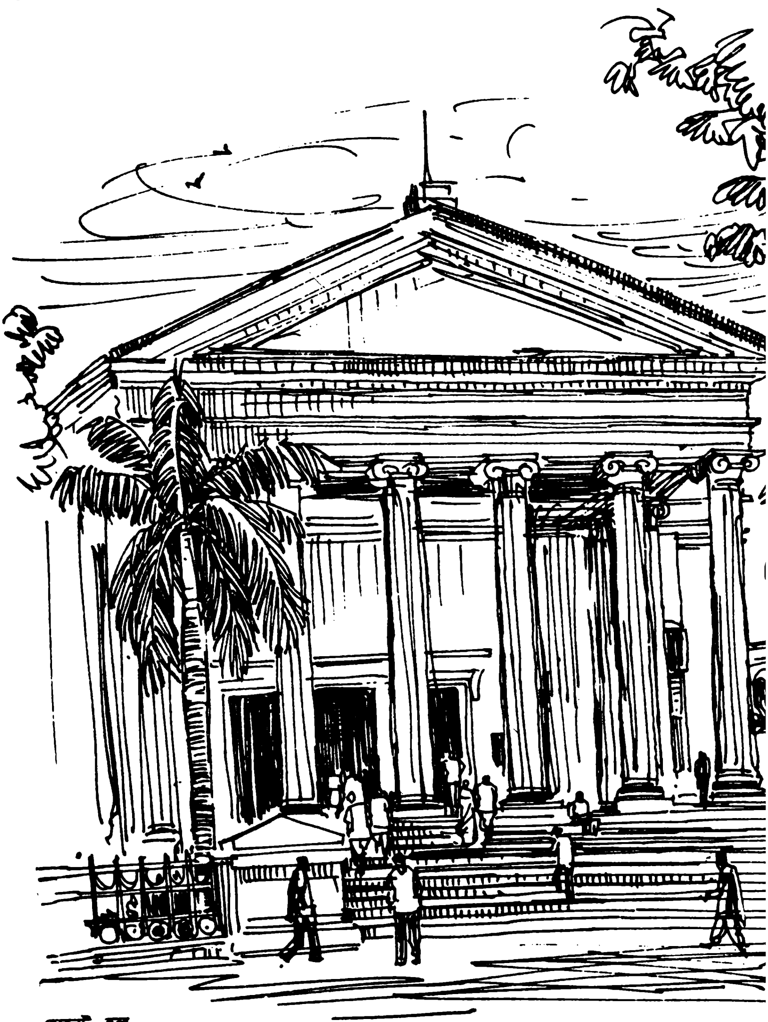

সেনেট হল

কম পোক্ত নয়। আমাদের সময় ডিকেন্স পড়া খুব চলতি ছিল। আমিয়রঞ্জন ডিকেন্স ছাড়াও লিটনের উপন্যাস প্রায় সবই পড়ে ফেলেছিল। লিটনের বই এখন আর তেমন কেউ পড়ে না। অমিয়রঞ্জন আমাকে একবার বলেছিল লিটন ওর ভাল লাগে এই কারণে যে অত মারামারি আর কোথাও পাওয়া যায় না। তখন অবশ্য জেমস হ্যাডলি চেজের লেখা বেরতে শুরু করেনি। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্যের উপর দখল ছিল অসামান্য। এই সব গুণ অথবা দোষ সত্ত্বেও সে কুস্তিটুস্তি করত এবং আরও কী কী চর্চা করত সেটা পরে বোঝা গেল। অমিয়রঞ্জন ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টারমিডিয়েটে খুব ভাল ফল করল। বি· এ· পড়বার সময় মন কী রকম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল এবং হিরণ্ময় ঘোষালের সঙ্গে পরামর্শ করে দর্শনে অনার্স নিল। একটি বড় আকর্ষণ অবশ্য ছিল, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মশায়ের কাছে পড়া এবং ভবিষ্যতে গবেষণা করা। দর্শন ঠিক অমিয়রঞ্জনের মনের মত জিনিস ছিল কি না জানি না, কিন্তু এই সময় থেকে অমিয়রঞ্জন লেখাপড়ায় উদাসীন হতে লাগল। দু'এক বছর পরে অমিয়রঞ্জনের গতিবিধি দস্তুরমত রহস্যজনক হয়ে দাঁড়াল। বাড়িতেও পাওয়া যায় না, রাস্তাঘাটে বন্ধুদের এড়িয়ে চলে। বন্ধুরা, যারা রহস্য ভালবাসে, বলত রোজ রাত্রে শ্মশানে গিয়ে তপস্যা করে। কিসের তপস্যা, তা অবশ্য কেউ খুলে বলত না। তারপর একদিন বোধহয় ১৯৩১/৩২ সালে হবে কিংবা তার পরে, হঠাৎ অমিয়রঞ্জনের পথ বদলে গেল। অমিয়রঞ্জন ধীরে ধীরে অন্য পাঁচজনের মত হয়ে গেল, ছাত্রছাত্রী পড়াতে শুরু করল, ভাল পড়াত বলে নামও করল। তারপর একদিন অমিয়রঞ্জনের কাকিমা বাড়িতে এসে বললেন, অমুক তারিখে অমিয়র বিয়ে, তোমরা এসো। ভয়ে ভয়ে গেলাম। কারণ যেরকম লোক, বিশ্বাস নেই। হয়তো শুনব পাত্রীকে ফেলে হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে গিয়েছে। অমিয়রঞ্জন সংসারী হল, ঘোরতর সংসারী। কিন্তু নানা বিষয়ে এখনও উৎসাহ। ভূতপ্রেতে যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি ভূতপ্রেত তাড়াবার উপায়েও সেরকম বিশ্বাস। ভবিষ্যৎবাণীতে এখন আর বিশেষ কারু ভরসা নেই, কিন্তু আমার জীবনে অন্তত দুটি ঘটনা বলেছিল। তখন আমার অসম্ভব মনে হয়েছিল, সে আমি ভুলতে পারব না। কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি। অমিয়রঞ্জন একটি অদ্ভুত জিনিস রেখে গিয়েছে। গত ত্রিশ বছর ধরে একাধিক খাতা আছে যার একদিকে বাজারের হিসাব এবং আর একদিকে তার লেখা ডায়েরি। আমি অন্তত একবার এই ডায়েরি থেকে উপকৃত হয়েছি।

আর একজনের কথাও এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল। তার নাম রাধামোহন ভট্টাচার্য। প্রথম যখন তার সঙ্গে আলাপ হল প্রেসিডেন্সি কলেজে, তখন সে বাঁকুড়া থেকে পাস করে এসেছে। পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করেছে বলে সবাই তাকে চিনত। হিন্দু হস্টেলের বাসিন্দা, তাহলেও তার খ্যাতির সৌরভ কলেজের অন্যত্র ব্যাপ্ত হয়েছিল। রাধামোহনের বিশেষত্ব আমার মনে আছে লেখাপড়ার কথা তার মুখে কদাচ শোনা যেত। এর জন্য তাকে কোনো পরিশ্রম করতে হয়নি। নানা বিষয়ে তার অধিকার ছিল। লেখাপড়া তো বটেই, তার সঙ্গে গান-বাজনা এবং অভিনয়। অনেক দিন আগে কোনো কাগজে দেখেছিলাম সে

বলেছে, প্রেসিডেন্সি কলেজে অভিনয়ের সময় তাকে বড় কাজে নেওয়া হত না, কেবল তবলাটবলা বাজাতে দিত। প্রকৃতপক্ষে সব কলেজেই ভাল গাইয়ে-বাজিয়ের অনেক সময় অভাব থাকে। অন্তত তখন থাকত। কলেজে অভিনয়ের সময় গাইয়ে-বাজিয়ের কথা ভাবা হলে রাধামোহন ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কথা মনে করা হত। রাধামোহন পরে পাটনা থেকে আইন পাস করেছিল কিন্তু ওকালতিতে তার মন বসল না। কলকাতায় ফিরে এল। হঠাৎ শুনলাম বোম্বাইয়ের একটা বিজ্ঞাপনের ছবিতে রাধামোহনের মুখ দেখা গিয়েছে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় সেই প্রথম পর্দায় আবির্ভাব। আমরা দল বেঁধে সিনেমা গেলাম। ছবি দেখতে নয়, বিজ্ঞাপনের ছবি দেখতে। এর কিছুদিন পরেই 'উদয়ের পথে', বিমল রায়ের তোলা ছবিতে অভিনয় করে। তারপর থেকেই যশ ও অর্থ। রাধামোহন সম্বন্ধে আমার বহুবার মনে হয়েছে, কোনো জিনিস বেশিদিন ধরে রাখা তার স্বভাববিরুদ্ধ। এর পরে তাকে এক অন্য ভূমিকায় দেখা গেল। স্টেটসম্যান কাগজে দেশী ছবির সমালোচক হিসাবে যখন তার নাম হল, রাধামোহনের তখন সেকাজ আর ভাল লাগল না। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের কথা কখনও কখনও মনে পড়ে। আলোচনা করে লাভ নেই, যার যা স্বভাব।

অদ্রীশের বাবার নাম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে আমার পিতার পরিচয় ছিল। শেষ বয়সে আমার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। তখন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় এসে বাস করছিলেন। সদানন্দ রোডে থাকতেন, ও পাড়া তখন নতুন তৈরি হয়েছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু অভ্যাসের কথা সকলেই জানেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী ছিল, যখন তিনি পুনায় আরকিওলজিক্যাল সার্ভের অফিসে কাজ করতেন তখন পুনা এত বড় হয়নি। প্রতিদিন তিনি বোম্বাই-এ গাড়ি পাঠিয়ে বাজার করে নিয়ে আসতেন। এটা বোধহয় অত্যুক্তি। দু'চার দিন হয়তো করেছিলেন। লোকের মুখে মুখে কথা রটে যায়। আমি যখন তাঁকে শেষ বয়সে দেখেছিলাম, তখন পরিবারের পূর্বশ্রী লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু লক্ষ করেছিলাম সদানন্দ রোডের বাড়িতে তাঁর একটি পুরনো গোয়ানিজ রান্নার লোক ছিল। তাঁর স্ত্রী কাঞ্চনমালা দেবীকেও সেই বাড়িতে দেখেছি। এখন বোধহয় কাঞ্চনমালা দেবীর লেখার সঙ্গে কারুর পরিচয় নেই। এক সময় তিনি গল্পলেখিকা বলে পরিচিতা ছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম বয়সে সংস্কৃত-ঘেঁষা ছিল। কিন্তু তার কয়েকটি উপন্যাসের ভাষা বেশ স্বচ্ছ। 'ধর্মপাল' কিংবা 'ময়ূখ' পড়ে এক বয়সে খুব আনন্দ পেয়েছি। 'শশাঙ্ক' সম্বন্ধেও একথা বলতে পারি, যদিও ভাষা সংস্কৃত-ঘেঁষা। 'বাংলার ইতিহাস' সম্বন্ধেও এই কথা। কিন্তু তাঁর মুখের ভাষা একেবারে অন্য রকম ছিল। একটু বেশি আদিরসাত্মক, কার সঙ্গে কথা বলছেন ঠিক খেয়াল থাকত না। অতি সহৃদয় লোক ছিলেন। উত্তর কলকাতায় তাঁর পৈতৃক বাড়িতে আমি কখনও যাইনি।

গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ আমাদের সঙ্গে পড়ত। গোবিন্দদের বাড়ি প্রথমে ছিল কলেজ স্কোয়ারের খুব কাছে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের উত্তর দিকে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়েছি। সেকালের বড় বাড়ি, সেযুগের আসবাব দিয়ে সাজানো, বিস্তর বই। গোবিন্দর কাকা কৃষ্ণচৈতন্য ঘোষ প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন। গোবিন্দরা কয়েক বছর পরে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোডের মোড়ে নতুন বাড়ি করে চলে এল। গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে হিরণ্ময় ঘোষালের খুব অন্তরঙ্গতা হয়েছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন প্রথম ভর্তি হই তখন প্রবোধরঞ্জন গুপ্তর সঙ্গে পরিচয় হল। প্রবোধের বাবা সিঙ্গাপুরে অনেকদিন ডাক্তারি করেছেন, কাজেই এদেশে তারা নবাগত। কলেজে পড়বার সময় যখন আমরা দলবেঁধে বেড়াতে যেতাম তখন প্রবোধও বেড়াতে যেত। তার বিয়ে হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। আমরা দলবেঁধে বরযাত্রী গিয়েছিলাম। সে যখন পরে দিল্লিতে থাকত, আমি বহুবার পুসা রোডে তার দিল্লির বাড়িতে গিয়ে থেকেছি। এরকম অকৃত্রিম বন্ধু আমি খুব কম দেখেছি। প্রবোধ বেশিদিন বাঁচেনি। আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি দল ছিল। প্রবোধের মৃত্যু সেই দলের উপর একটি দীর্ঘস্থায়ী ছায়া ফেলেছে।

এ দলের সবাই হরিহর আত্মা ছিল। এ দলের একটু বাইরে আমার সঙ্গে যার অন্তরঙ্গতা হয়েছিল বোধহয় সেকেণ্ড ইয়ার থেকে, তিনি মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র। অল্প বয়স থেকেই মোহনলাল ছোট গল্প লিখতে আরম্ভ করে। তার প্রথম বইয়ের নাম আমার ঠিক মনে নেই, বোধহয় 'গল্পের ঝরনা'। তার ছোট ভাই শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়েরও সাহিত্যিক বলে নাম হয়েছিল। শোভনলাল বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অল্প কিছুদিন আগে অবসর নিয়েছেন।

আগেই বলেছি যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে ছ'বছর পড়েছি। তখন হিস্ট্রি সেমিনার ইত্যাদিতে কখনও কখনও যোগ দিয়েছি। সে সব সমিতির অধিবেশন যে বেশি হত তা নয়। সেমিনার সম্বন্ধে আমার বরাবর একটু ঔদাসীন্য ছিল। ক্লাসের পড়ার গন্ধ পেতাম। অর্থাৎ সিলেবাসের বইয়ের বাইরে যে বড় ইতিহাসের পালা, তার কথা প্রায়ই সেখানে শোনা যেত না। একটি সেমিনার না বক্তৃতা তা আমার স্পষ্ট মনে নেই, তার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন কলেজের অধ্যক্ষ র‍্যামসবটম এক সভায় তাঁর দু'জন পুরনো ছাত্রকে নিয়ে এসেছিলেন। একজনের নাম সুশোভন সরকার, তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। সুশোভনবাবু তখন যুবক, মাথায় বড় চুল উলটো করে আঁচড়ানো, হাতের নখ একটু বড় রাখতেন। আর একজন সুরেন্দ্রনাথ সেন। তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পরে আমি তাঁর কাছে পাঠ নিয়েছি। তিনজনের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বেঙ্গলি লিটারেরি সোসাইটি বলে একটি সমিতি ছিল। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র তার সভাপতি ছিলেন। তিনি দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। আমার পিতা তাঁর কাছে পড়েছিলেন, বোধহয় তাঁর প্রথম দলের ছাত্রদের একজন। আমিও তাঁর কাছে লজিক পড়েছি। খগেন্দ্রনাথ মিত্র মশায়কে এক সময় লোকে সাহিত্যিক বলে চিনত। 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় তাঁর অনেক সরস গল্প বেরিয়েছিল। 'নীলাম্বরী' নামে একটি গল্পের বই একসময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এখন আর

পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। এবং নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর সঙ্গে বহুকাল গীতবাদ্যের চর্চা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেবার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক হয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে অক্সফোর্ডে দার্শনিকদের একটি সভায় যোগ দিতে তিনি এবং অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত গিয়েছিলেন। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র তখন রাসেল স্কোয়ারের ধারে একটি হোটেলে বাসা নিয়েছিলেন। প্রতিদিন আমার সঙ্গে দেখা হত।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সব চেয়ে বড় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ছিল রবীন্দ্র-পরিষদ। ১৯২৭ সালে জন্ম। এর সংক্ষিপ্ত জন্মকাহিনী কেউ কেউ লিখেছেন। রবীন্দ্র পরিষদের প্রথম যুগের কথা জানেন এরকম লোক এখন আর বেশি নেই, কাজেই বলে রাখা দরকার। পুজোর ছুটির আগে অন্য কলেজের মতো প্রেসিডেন্সি কলেজেও ছাত্রদের থিয়েটার হত। এর আগেও 'অরূপরতন', 'মুক্তধারা', 'বিসর্জন' প্রভৃতি অভিনয় হয়েছে। সেবার অভিনয়ের বই নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিল। বই ঠিক করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। একদল চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু করতে। তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর যুগ। কেউ কেউ চেয়েছিলেন 'সীতা' অভিনয় করা হোক। অন্য দলের মত একেবারে আলাদা। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে আর কিছুতে আসতে চাইলেন না। জল যখন ঘোলা হল, তখন কলেজের অধ্যক্ষ স্টেপলটন বিচারের ভার নিলেন। 'সীতা'র বিপক্ষে ও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বললেন হুমায়ুন কবির। তিনি অবশ্য সাহিত্যের ছাত্র ও কবি। তাহলেও তাঁর সওয়াল একটু দুর্বল হল। তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, শম্বুকের হত্যাদৃশ্য অলঙ্কারশাস্ত্রবিরোধী। রঙ্গমঞ্চে হত্যা কিংবা মৃত্যু দেখানো অসঙ্গত। মামলায় আমরা হেরে গেলাম। অধ্যক্ষ বললেন তাহলে শেক্সপিয়রের প্রায় সব নাটকই অভিনয় থেকে বাদ দিতে হয়। এর ফলে এই সব বিতর্কের সঙ্গে রাজনীতিও একটু একটু জড়িয়ে পড়ল। সেবার পুজোর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে থিয়েটার হল না। কলেজের একদল ছাত্র ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' অভিনয় করলেন।

অনেক দিন হয়ে গিয়েছে, তাহলেও মনে আছে আমরা কিছু ছাত্র কীরকম ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। বালিগঞ্জ সারকুলার রোড আমাদের বেড়াবার জায়গা ছিল। তখন সুরকির রাস্তা ছিল, অনেক সরু, দু'ধারে বড় বড় গাছ। রাস্তা চওড়া করার সময় অনেক গাছ বিসর্জন দিতে হয়েছে। সেখানে বেড়াতে বেড়াতে এখন যেখানে ম্যাক্সমুলার ভবন তৈরি হয়েছে, তারা উলটো দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমার হঠাৎ ব্রাউনিং ক্লাবের কথা মনে হল, মনে হল প্রেসিডেন্সি কলেজে এরকম ক্লাব থাকলে ভাল হয়, কারুর কিছু বলার থাকবে না। সঙ্গে অমিয়রঞ্জন রায়চৌধুরী ছিল। আর ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও আরো দু'একজন। কে কে আমার ঠিক মনে নেই। সেই হচ্ছে রবীন্দ্র-পরিষদের জন্মক্ষণ। কিন্তু একজন অধ্যাপক চাই যিনি সভাপতি হবেন। একথা তখন প্রচার হতে আরম্ভ করেছে

যে, স্টেপলটন সাহেব রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়ের উদ্যম ভাল চোখে দেখেননি। কাজেই সব মাস্টারমশায়দের কাছে উৎসাহ আশা করা সম্ভব নয়। আমরা অবশেষে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর কাছে গেলাম। তিনি তখন বোধহয় রিচি রোডে থাকতেন, বলামাত্র রাজি হয়ে গেলেন। প্রথম সম্পাদক ছিলেন হুমায়ুন কবির, তাঁকে সাহায্য করতেন সুশীলকুমার দে। পরের বছর বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরের বছর আমি। শুধু সম্পাদকের নাম বলেই কর্তব্য শেষ হয় না। এঁদের বহু ছাত্র সাহায্য করত। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ করে মনে পড়ছে। সামান্য চাঁদা ছিল, তাই দিয়ে আমাদের খরচ চলত। সাধারণত প্রতি রবিবার বিকালে আমাদের অধিবেশনের সভা বসত। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, কবিতা, ছোটগল্প, গান নিয়ে আলোচনা বসত। রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশনেরও ব্যবস্থা থাকত। সুশীলকুমার দে ভাল গাইতে পারতেন। কখনও কখনও বিজয়কুমার আচার্য আসতেন। অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁদের বেশি উৎসাহ ছিল তাঁরা হচ্ছেন সোমনাথ মৈত্র, অপূর্বকুমার চন্দ ও ভূপতিমোহন সেন। ভূপতিমোহন সেনকে নিমন্ত্রণ করতে গেলে তিনি প্রায় বলতেন, 'তোমরা রবিবার মিটিং করো কেন? সেদিন আমরা একটু খেলিটেলি।' রবিবার তাঁর টেনিস খেলার দিন, কিন্তু প্রায় সভাতেই আসতেন। সাহিত্যিকরাও অনেকে আসতেন। যেমন, প্রমথ চৌধুরী, রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, কখনও কখনও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের ডায়েরির এক অংশে রবীন্দ্র পরিষদের উল্লেখ আছে। মেয়েদের তখন সভায় আসা-যাওয়ার খুব বেশি রেওয়াজ ছিল না। তবু এখানে কাউকে কাউকে দেখা যেত। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর বাবার সঙ্গে আসতেন। উমা দেবীও আসতেন। লীলা মজুমদারকেও দেখেছি মাঝে মাঝে, চোখে গোলি চশমা, লেখাপড়ায় ভাল মেয়ে বলে খুব নামডাক। ভয়ে আমরা কাছেই ঘেঁষতাম না। রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকবার এসেছেন। তখন আমরা শ্রোতাদের জায়গা দিতে পারতাম না। কার্ড ছাড়া ঢুকতে দিতাম না। গৌরীনাথ ভট্টাচার্য দরজায় নজর রাখত। সব বাকি চাঁদা উশুল হয়ে যেত। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ অপ্রকাশিত কবিতা কিছু কিছু আমাদের পাঠিয়েছিলেন বিদেশ থেকে, অপূর্বকুমার চন্দ আমাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন। 'মহুয়া' থেকে আরম্ভ করে 'পুনশ্চ', 'পরিশেষে'র অনেক কবিতা এইরকম করে আমরা শুনেছি। কখনও কখনও রবীন্দ্র পরিষদের সদস্যদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে তাঁদের কিছু বলতেন ও পড়ে শোনাতেন। সে ছিল খুব সৌভাগ্যের দিন।

একটি বিশেষ দিনের কথা বলছি। একবার কী কারণে মনে নেই, বোধহয় রবীন্দ্র পরিষদের কাজে কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। কবি তখন বিচিত্রা ভবনের দোতলায় পুব দিকের একটি কোনার ঘরে বসতেন। ঘরটির দেয়ালে একটি ভাল কাজ ছিল, সেটি পরে চুন-পলেস্তরা দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছিল। এই ঘরে একথা-সেকথার পর রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ গুনগুন করে 'কখন বসন্ত গেল/এবার হল না গান' দু' স্তবক গাইবার পর তৃতীয় স্তবক আরম্ভ করে

বললেন, 'ভুলে গিয়েছি। মনে পড়ছে না।' এই বোধহয় তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। পরে যখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছি তখন ঠাকুরবাড়ি সংস্কারের সময় এই ঘরটিকে পরিষ্কার করিয়েছিলাম। রবীন্দ্র পরিষদে কবি যখন আসতেন তখন অনেককে আমন্ত্রণ করেছি। পায়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি ঘোরা তখন পরিশ্রম বলে মনে হত না। একবার খুব সাহস করে স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়ি গিয়েছিলাম। স্বর্ণকুমারী দেবীর তখন অনেক বয়স হয়েছে, বালিগঞ্জে থাকতেন। বিশেষ কোথাও যেতেন না। ভেবেছিলাম হয়তো দেখাই করবেন না। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আসছি শুনে উপরে ডেকে পাঠালেন। সেটি তাঁর শোবার ঘর, খাটের উপরে প্রায় শুয়ে আছেন। যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও বেশি শীর্ণ এবং রুগ্ন বলে মনে হল। স্বর্ণকুমারী দেবী আমন্ত্রণের কথা শুনে বললেন, 'আমি তো কোথাও যাই না।' আমি একটু জোর দিয়ে বললাম, 'রবীন্দ্রনাথ আসছেন।' তিনি একটু হেসে বললেন, 'রবি তো সব জায়গায় যায়।' রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর 'রবি' সে কথা আগে খেয়াল করিনি। যাই হোক, প্রণাম করে চলে এলাম। পরে আর কখনও দেখা হয়নি।

রবীন্দ্র পরিষদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার অল্পদিন পরেই আর একটি সাহিত্য সমিতির জন্ম হল। তার নাম বঙ্কিম-শরৎ সমিতি। আমরা কেউ কেউ দুই সমিতিরই

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ

সদস্য ছিলাম্। কিন্তু তাই বলে রেষারেষি যে একেবারে ছিল না তা নয়। এর সম্পাদক ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। তার নাম আগেই উল্লেখ করেছি। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর সভাপতি। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এর অধিবেশনে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। বঙ্কিম-শরৎ সমিতি খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তার প্রধান কারণ ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু। তাছাড়া কাজ করবার লোকও সেখানে বেশি ছিল না। শরৎচন্দ্র আমাদের সময় অন্তত দু'বার বঙ্কিম-শরৎ সমিতির সভায় এসেছিলেন।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হবার পর আমার যে নতুন বন্ধুর সংখ্যা খুব বেড়েছিল তা নয়। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে সবারই মনে হয় বয়স অনেক হয়েছে, এখন আর নতুন করে বন্ধু সংগ্রহ করা যায় না। তাহলেও শেষ বসন্তের ফুলের মতো দু'-চারটি নতুন বন্ধুত্ব যে হয় না তা নয়। আমার বিশেষ করে মনে হয় নৃপেন বলে একটি ছেলের কথা। সে কলকাতার ছেলে ছিল না। মহারাষ্ট্রের ইতিহাস পড়বার সময় সে হঠাৎ শিবাজির মত দাড়ি রাখতে আরম্ভ করল। তার স্মৃতিশক্তি সাধারণের চেয়ে বেশি ছিল। বেশি স্মৃতিশক্তির ফল সব সময় ভাল হয় না। নৃপেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা শেষ করে রামকৃষ্ণ মিশনে চলে গিয়েছিল। নৃপেন নামে এখন তাকে কেউ চিনবে না। আর একজনের কথা মনে হচ্ছে, তার নাম কুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আসানসোলের কাছে কোন্ কলেজে শেষের দিকে সে অধ্যক্ষ হয়েছিল। এখন আর যোগাযোগ নেই। কুমুদ থাকত হ্যারিসন রোডের এক মেসে এবং বিকালে তার ওখানে গেলে আমাদের কচুরি ও আলুর দম দিয়ে আপ্যায়িত করত, কখনও কখনও ছোলার ডাল। ষাট বছর আগে এর কোনোটিই কলকাতায় দুর্লভ ছিল না। বাড়িটি শোনা যেত একটি চোরাপথে কোকেন ব্যবসায়িনীর সম্পত্তি। তাকে অনেক সময় বলা হত 'কোকেন সম্রাজ্ঞী'। পুলিশকে আটকাবার জন্য বাড়িতে নানা রকম লোহার গেট ছিল। সে সব গল্প শুনে আমাদের রোমাঞ্চ হত।

মনোহরপুকুর রোডে বাড়ি করবার পর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নরেন্দ্র দেবের বাড়ি খুব আসতেন। ফেরবার সময় কখনও কখনও আমাদের বাড়ি ঘুরে যেতেন। প্রায় সব সময় তাঁর হাতে ছাতা থাকত। কোনো কোনো দিন ছাতাটি ভুলে বারান্দার কোণায় ফেলে যেতেন। যখন কলেজে পড়ি, তখন দলবেঁধে আমরা বেড়াতে যেতাম, আগে বলেছি। এইভাবে ডায়মণ্ডহারবার, ফলতা, ক্যানিং, রাজপুর প্রভৃতি অনেক জায়গায় গিয়েছি। সকাল সাড়ে নটা দশটার সময় অনেক খাবারদাবার নিয়ে আমরা ট্রেনে চড়ে বসতাম, সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসতাম। একবার খুব বৃষ্টির সময় ঠিক হল পানিত্রাসে শরৎচন্দ্রের বাড়ি দেখতে যাব। আমাদের সহপাঠী ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িও পানিত্রাসে। তাকে পাণ্ডা বলে স্বীকার করে নেওয়া হল। সকালবেলার ট্রেনে ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ রায়, চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, অমলেন্দু সেন, প্রবোধরঞ্জন গুপ্ত ও আরও দু'একজন রওনা হলাম। কলকাতায় তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। স্টেশনে নেমে

দেখি বৃষ্টিতে চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটু জিরিয়ে বৃষ্টি ধরলে শরৎচন্দ্রের গ্রামের দিকে রওনা হলাম। স্টেশন থেকে বাড়ি কাছে নয়। এখন রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তখন, অর্থাৎ ১৯২৯/৩০ সালে একটা উঁচু কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হল। কদিনের বৃষ্টিতে খুব পিছল এবং চললেই এমন কাদা গায়ে লাগে যে আমরা বর্ষাতি গায়ে দিয়ে চলছিলাম। সেদিন চারুচন্দ্রের অদৃষ্ট খারাপ ছিল। রাস্তায় পিছল মাটিতে অনেকবার পদস্খলন হতে লাগল। তখন সুরেন রায় ও অন্য কয়েকজন তার ভারসাম্য ঠিক করতে লাগল। বার দুয়েক পড়েই চারুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। যে জায়গায় ভাল করে পড়েছিল তার নাম ম্যাল্লক। চারু দাঁড়িয়ে উঠে ম্যাল্লক গ্রাম সম্পর্কে কটূক্তি করতে লাগল। সব জিনিসেরই শেষ আছে। আমরা অবশেষে শরৎচন্দ্রের বাড়ি এসে পৌঁছলাম। ফণিভূষণ শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী, আমাদের পথ দেখিয়ে আনছিল। সে বলেছিল তাদের পরিবারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা আছে। কিন্তু তাহলেও শরৎচন্দ্র ফণিভূষণকে চিনতে পারলেন না। ফণিভূষণের অবস্থা দেখে আমাদের উৎসাহ অনেক কমে গেল। যাই হোক, ফণিভূষণ তার কুলজি আওড়াবার পর শরৎচন্দ্র চিনতে পরলেন এবং আমাদের বসতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে এই উক্তি করলেন, 'আজকের দিনেও তোমরা এলে !' এর উত্তরে আমরা মৃদুমন্দ হাসবার চেষ্টা করলাম। শরৎচন্দ্র চেয়ারে বসে গড়গড়া টানছিলেন। সেই অবস্থায় আমাদের পরিচয় একটু আধটু জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। চারুচন্দ্রের দুর্ভোগ আবার শুরু হল। চারুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী পড় ?' চারু প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে এম· এ· পড়ছিল। শুনেই মনে হল শরৎচন্দ্র রুষ্ট হয়েছেন। বললেন, 'ওতে কিছু নেই। ঐ যে তোমাদের ওখানে যে মেমসাহেব (অর্থাৎ ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ) আছেন তিনিই ঐসব শেখাচ্ছেন, পাছে আমরা ইউরোপের ভাল জিনিস দেখলেই চিনতে পারি। ওটা পড়তে গেলে কেন ? ওটা তো জিওলজির মতো বাজে সাবজেক্ট।' বেরিয়ে এসে চারুচন্দ্র ম্রিয়মাণ হয়ে ফিসফিস করে বলল, 'দেখলি, আমারও নিন্দা হল, আমার বাবারও।' চারুর বাবা নামকরা জিওলজিস্ট ছিলেন। দেখা গেল, শরৎচন্দ্র আমাদের বিশেষ আমল দিলেন না। শরৎচন্দ্রকে দোষ দিই না। প্রত্যহ নিশ্চয় তাঁকে অনেক সাহিত্যভাবাপন্ন যুবক এসে বিরক্ত করে। বৃষ্টির দিনে একটু অবসর পাবেন ভেবেছিলেন। যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে আমরা অন্য একটি বাড়িতে গিয়ে পুকুরে বাঁধানো ঘাটে পায়ের কাদা যথাসম্ভব ধুয়ে ফেললাম। আবার ফিরতি মুখে স্টেশনের দিকে রওনা হওয়া গেল। স্টেশনে ফিরবার আগে খাওয়া সম্ভব হল না। চারদিকে এত জলকাদা যে বসবার উপায় নেই। স্টেশনেও সেই বিপদ। চারদিকে জল জমে আছে। একমাত্র স্টেশনের ওভারব্রিজের উপর জল জমতে পারেনি। আমরা সেখানে বসে খাবারের ঝুড়ি খুললাম। চারুচন্দ্রের বাড়ি থেকে অনেক ভাল খাবার এসেছিল। আমাদের মধ্যে অমলেন্দু প্রায় নিরামিষাশী, তবে ডিম খেতে বাধা ছিল না। সে গম্ভীরভাবে অনেকগুলো ডিমসেদ্ধ খেল। কতগুলো খেল বলবার উপায় নেই, কেউ বিশ্বাস করবে না।

আর কোথাও আমাদের এ ধরনের অবস্থা হয়নি। একবার ফলতায় পিকনিক

করবার সময় থানা থেকে লোক এসে আমাদের উদ্দেশ্য সাধু কিনা, এত জায়গা থাকতে ঐখানে এসে কেন বসেছি এইসব খবর ভদ্রভাষায় প্রশ্ন করে জেনে গেল। তখন দিনকাল খারাপ ছিল। ফলতায় পরে আবার গিয়েছি অন্য দলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িতে পিকনিক করতে। তখন শীতের শেষ। আমবাগানে বোল এসেছে। সমস্ত দুপুর তার সুবাস পেয়েছিলাম মনে আছে।

যখন খুব ছোট ছিলাম তখন দার্জিলিং ছাড়া বিশেষ কোথাও বেড়াতে গিয়েছি বলে মনে হয় না। যতদূর মনে পড়ছে ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর পুজোর ছুটিতে ১৯১৮/১৯ সালে ডেহরি-অন-শোন গিয়েছিলাম।

পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাবার সময় আমাদের সঙ্গে যেত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য। সে রান্নাঘরের অধিকর্তা। সে বোধহয় ১৯১৭/১৮ সাল কিংবা আরও আগে থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আমাদের বাড়িতে ছিল। কখনও হয়তো বাড়ি ছেড়ে যেত। খুব বয়স হয়ে গেলে তার বাড়ির লোক এসে নিয়ে গেল। তাকে শুধু রান্নাঘরের ঠাকুর বললে কম বলা হবে। সে প্রায় বাড়ির একাংশের ম্যানেজার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজের লোকদের উপর তার অবাধ প্রভুত্ব ছিল। কখনও যে উৎপাত করত না তা নয়। এমন কাজের লোক খুব কম ছিল যে তার হাতে প্রহার খায়নি। তার পছন্দ অপছন্দ দুইই প্রবল। ছেলেবেলায় লোকে বলত আমার ভাই অমল ছোট বলে তার প্রতি পক্ষপাত ছিল। ক্ষীর, পায়েস ইত্যাদি পরিবেশনের সময় এই পক্ষপাত বোঝা যেত। দুধ কিংবা মিষ্টিতে কোনকালেই আমার রুচি নেই। কাজেই বেশি মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিনি। মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের রান্নার হাত খুব ভাল ছিল। আমাদের বাড়িতে আসবার পর দিশি, মোগলাই নানারকম রান্না শিখেছিল।

তখন কোনো মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন ডেহরি-অন-শোনে থামত না। সুন্দর ছোট জায়গা। শোনের ধার দিয়ে লাল সুরকির রাস্তা দূরে একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বসতি পর্যন্ত চলে গিয়েছে। অন্য দিকে দূরে শোনের বিখ্যাত বাঁধ। তার কাছে ডেহরি ছোট শহর, বাজার হাট করতে গেলে সেখানে যেতে হয়। যেমন দেহাতি শহর হয় সেইরকম। আরও দূরে রোটাস পাহাড়ের রক্তাভ চূড়া দেখা যায়। প্রবাদ যে রোহিতাশ্বর নামে এই দুর্গের নামকরণ হয়েছে। ডেহরি শহর দিয়ে পশ্চিমে একটু এগিয়ে গেলে ডেহরি রেলস্টেশন ; সেখান থেকে ছোট ট্রেনে করে রোটাস পাহাড়ের প্রায় উপর পর্যন্ত যাওয়া যেত। আবার সেই ট্রেনেই ডেহরি-অন-শোন রেলস্টেশনে পৌঁছনো যেত। পরে আরও কয়েকবার যখন ডেহরি গিয়েছি তখন বয়স আর একটু বেশি হয়েছে। তখন বিকেলে বেড়াবার সময় ডেহরি স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ট্রেনে চড়ে ডেহরি-অন-শোন স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছতাম। রেলভাড়া এত কম ছিল যে, ফার্স্টক্লাসে চড়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম না। ডেহরিতে তিনবার গিয়েছি, প্রত্যেকবার একই বাড়িতে থাকতাম। সেই বয়সে মনে হত এমন সুন্দর জায়গায় কখনও থাকিনি, আমার এখনও তাই মনে হয়। প্রথমে যে বাড়ি ঠিক করা হয়েছিল সে বাড়িও কিছু খারাপ ছিল না, তবে পাশের বাড়ির মতো ভাল নয়।

একটু পুরনো, উপরে খাপরার চাল। প্রায় সব বাড়িতেই পেয়ারার গাছ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময়কার বইয়ে যে ধরনের বাড়ির ছবি পাওয়া যায় সেই ধরনের। যে বাড়িতে আমরা ছিলাম সে বাড়ির একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল, বাড়ির সামনে বারান্দা, তারপর রাস্তা পেরলে দিগন্তবিস্তৃত শোন নদ, একটু বাঁদিকে নদীর উপর রেলওয়ে ব্রিজ। উপরে শরতের আকাশ। এর চেয়ে বড় আকর্ষণ আর কী হতে পারে! রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক' পড়েছিলাম। সেখানে শোন নদের লাল জল এবং রোহিতাশ্ব দুর্গের উপরে প্রথম সূর্যের কিরণের বর্ণনা এখনও মনে আছে। ভারতবর্ষ পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গৃহদাহ সেই বয়সে ভাল লাগবার কথা নয়। কিন্তু তার একটি পরিচ্ছেদে আমার উপর অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। যেখানে বৃষ্টির মধ্যে মোগলসরাই স্টেশনে অচলা গাড়ি চিনতে ভুল করল এবং তারপর ডেহরি-অন-শোনের কয়েকটি পরিচ্ছেদ। একথা তখন বুঝতে পারিনি, এখনও পারিনা। আর পারিনা বৃদ্ধ কেদারবাবু চোখের জল মুছবার জন্য রুমাল ব্যবহার না করে জামার হাতা কেন ব্যবহার করতেন।

সুখের সময় বেশি স্থায়ী হয় না। এক সন্ধ্যায় বেড়িয়ে এসে শরীর খারাপ মনে হল। কয়েকদিন পরে চোখ খুললাম। বেশি অসুখের পর সব জিনিস বুঝতেই একটু দেরি হয়, দেখলাম আমার মামা ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে কলকাতায় তার করে আনানো হয়েছে। আমার কার্য-কারণ বুঝতে দু'এক সেকেণ্ড কি আর একটু বেশি সময় লাগল। ডেহরি-অন-শোনে খুব ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া হচ্ছিল। আমার মামা কয়েকদিন পরে আমাকে ভাল দেখে কলকাতায় ফিরে গেলেন। তখন ডেহরি-অন-শোনে রেলের ডাক্তার ছাড়া অন্য ডাক্তার পাওয়া যেত না। তখনকার মতো কুইনিন ইনজেকশন দিয়ে জ্বর তাড়ানো হল। সেই ম্যালেরিয়া আমার স্কুল-জীবনে কয়েক বছরের সঙ্গী হয়েছিল।

যখন সেরে উঠলাম তখনও সমস্ত দিন শুয়ে থাকতে হত। জানালা দিয়ে বাগান, রাস্তার একাংশ ও আকাশ ছাড়া বিশেষ কিছু চোখে পড়ত না। একদিন দেখলাম ঠিক গেটের বাইরে একটি ন'দশ বছরের মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে কঙ্কালের মতো চেহারা, পরনে প্রায় কিছু নেই বললেই চলে। মনে হল কয়েকদিন তার কিছু খাওয়া হয়নি। তখন এ অঞ্চলে যে অবস্থা ছিল তাকে রাজপুরুষরা আইন অনুসারে দুর্ভিক্ষ বলতে পারবেন না। কিন্তু অন্নাভাব তো বটেই। অল্প বয়সে সবার মন নরম থাকে। আমার মনে হল এই মেয়েটিকে এখনই ভাল করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা উচিত। তাতে তার সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হত না। কিন্তু সে বয়সে একথা ভাববার মতো মন কারু থাকে না। সাহিত্যে প্রায় সব সময় বঙ্গললনাদের করুণাময়ী করে দেখানো হয়। কিন্তু তা সর্বত্র সত্য নয়। পরিবারের বাইরের লোকদের জন্য সব সময় করুণার চিহ্ন দেখা যায় না। দু'একজন বললেন যে, একজনকে ভাত দিলে কাল অনেকে এসে জুটবে। কিন্তু যাই হোক, সবে অসুখ থেকে উঠেছি, ভাল করে দাঁড়াবার শক্তি নেই—এইসব কারণে শেষ পর্যন্ত কেউ আপত্তি করলেন না। মেয়েটিকে বাগানে

ডেকে আনা হল। তাকে একটি নতুন ধুতি দেওয়া হল। সে সেই ধুতি পরে কলার পাতায় এত ভাত খেল যে সবাই অবাক হয়ে খাওয়া দেখতে লাগল। স্পষ্ট বোঝা গেল অনেকদিন খায়নি। তাছাড়া একথাও ঠিক যাদের রোজ নিয়মিত খাবার জোটে না তাদের একদিন হঠাৎ খাবার পেলে বেশি খেয়ে নেওয়াই স্বাভাবিক। পরের দিন খাবার সময় মেয়েটি আবার এল। দেখলাম পরনের নতুন কাপড় ছিঁড়ে অন্তত তিন টুকরো করেছে। প্রথমে খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল। পরে ভেবেছি যে এতেই ওর সুবিধা। তারপর যতদিন ডেহরিতে ছিলাম প্রতিদিন খাবার সময় সে আসত। যেদিন চলে এলাম সেদিন নিশ্চয় এসে ফিরে গিয়েছে। অনেকদিন পরে শরৎচন্দ্রের প্রবাসে কুকুরের গল্প পড়ে হঠাৎ সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ল। সব জিনিসের প্রতিই প্রথমে খুব আকর্ষণ থাকে। মাদুর, বাসনপত্র, পোষা প্রাণী এরা পুরনো হয়ে গেলে সে আকর্ষণ চলে যায়। তখন তাদের কথা দিনান্তে একবারও মনে পড়ে কিনা সন্দেহ।

তারপরে একাধিকবার ডেহরি-অন-শোন গিয়েছি। প্রত্যেকবার সমান ভাল লেগেছে। দু'বেলা শোন নদের অপর্যাপ্ত মাছ, দামে খুব সস্তা। নদীর পাশ দিয়ে রাস্তা, তার দু'দিকে শিশুগাছের সারি। সব মিলিয়ে মনের মধ্যে আশ্চর্য পরিবেশ তৈরি করে। কয়েক বছরের মধ্যে চোখের সামনে শিশুগাছ এবং লাল সুরকির রাস্তার অযত্ন দেখতে লাগলাম। এই শিশুগাছই যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় তাল-বেতালের গল্পের শিংশপা গাছ, ছেলেবেলায় একথা জানা ছিল না। জানলে অবশ্য একটু দুরু দুরু বুকে শুতে যেতে হত। পাশের বাড়িতে খুব সুন্দর গোলাপফুলের বাগান। সেটি ইতিহাসের অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। তাঁর বই না পড়ে তখনকার দিনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পার হওয়া যেত না। একথা অবশ্য স্বীকার করব, তিনি ভাল করে গুছিয়ে অল্পবয়সীদের জন্য ইতিহাস লিখতে পারতেন। এই গুণ এখন দুর্লভ।

প্রায় প্রতি বছর পুজোর সময় বাইরে গিয়েছি কিন্তু ডেহরি-অন-শোন ও শিমুলতলার মতো আকর্ষণ আর কোনো জায়গার ছিল না। গোমোর কথাও বলতে পারি। রেলওয়ে কলোনি বলে খাবার দাবার, রুটি, কেক, মুরগি পাওয়া যেত। তখন ঘাটশিলায় কেবলমাত্র স্বাস্থ্যান্বেষীরা আসতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু ভাল বাড়ি পাওয়া যেত না। আমরা যখন গিয়েছি তখন সেখানে বাড়িঘর খুব কম। মাছও দুর্লভ। বাঙালি গৃহিণীরা খুশি হতেন না। সুবর্ণরেখার ধার অবশ্য চিরকালই সুন্দর। আর একটি ভাল জায়গা শিমুলতলা। এখন শিমুলতলার সে গৌরব নেই, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিমুলতলা প্রায় বাংলাদেশের 'ব্রাইটন' হয়েছিল। কলকাতার অনেক বিখ্যাত লোক এখানে বাড়ি করেছিলেন। কয়েক বছর পরে তাঁদের উৎসাহ কমে গেল। বাড়ি মেরামত হত না, চারপাশে আগাছা আর জঙ্গলে বাড়ি ঘিরে গেল। তাহলেও ১৯২৫/২৬ সাল পর্যন্ত পুজোর সময় শিমুলতলা চেঞ্জারদের ভিড়ে ভরে উঠত। আমি প্রথম শিমুলতলার সন্ধান পাই রংপুরে পুরনো বাঁধাই 'মুকুল' পত্রিকা থেকে, প্রিয়ম্বদা দেবীর একটি প্রবন্ধে। বোঝাই যাচ্ছে অনেকদিন আগেকার লেখা। সে মুকুল আর আমার কাছে নেই, কিন্তু লেখাটির কথা একটু একটু মনে আছে।

শিমুলতলা তখন অল্প অল্প করে গড়ে উঠেছে। প্রিয়ম্বদা দেবী জায়গাটির রূপ ও গুণ বর্ণনা করে অন্য অসুবিধাকে তুচ্ছ করতে বলেছেন। দরকারি জিনিস তিলুয়ার হাট থেকে আনতে উপদেশ দিয়েছেন। তিলুয়া শিমুলতলা থেকে তিন মাইল দূরে একটি গ্রাম। সেখানে তখন একটি জমিদারির কাছারি ছিল। সেখানে দুর্গাপুজো হত। আমরা অনেকবার শিমুলতলা গিয়েছি। প্রথম যখন শিমুলতলা যাই সেটা বোধহয় ১৯২২/২৩ সাল, স্কুলে পড়ি। সেদিন 'দাদার কীর্তি' ফিল্ম দেখে মনে হল পাড়াটা চেনা চেনা। প্রথমবার শিমুলতলায় গিয়ে যে বাড়িতে ছিলাম তার নাম 'প্রমোদ কানন'। বাড়ির নামের সঙ্গে সব সময় মিল থাকে না, কিন্তু এই বাড়িটার ছিল। বাড়িতে অসংখ্য ফুলগাছ। তাছাড়া চামেলি বিতান। ছেলেবেলায় আকর্ষণের আর একটি কারণ ছিল। বাড়ি স্টেশনের খুব কাছে। দুপুরবেলা তৃষ্ণার্ত ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যেত, কখনও কখনও শান্ট করবার শব্দ। বাড়ির অন্যদিকে একটি খিড়কি দরজা। সেটি খুললে দিগন্তবিস্তৃত ধানের ক্ষেত। ধানের ক্ষেতে নতুন রং লাগতে শুরু করেছে। আরও দূরে নীল পাহাড়ের শ্রেণী। তারপরে আবার নীল আকাশ। কখনও পাহাড়ের উপরে মেঘের আস্তরণ। অনেকদিন শিমুলতলার কথা ভাবতে গিয়ে কবি গোবিন্দ দাসের লেখা একটি পংক্তি মনে হয়েছে—'আকাশে ঠেসান দিয়ে ঘুমায় পর্বত।' কোনো কোনো উৎসাহী দল পাহাড়-জঙ্গলে চড়ুইভাতি করতে যায়। পরে আরও কয়েকবার শিমুলতলা গিয়েছি। মনে হয়েছে এত সহজ আনন্দ আর কোথাও পাওয়া যায় না। বিকালের দিকে জেলেরা ছোট নদী থেকে ধরা মাছ নিয়ে আসত। ছোট ছোট মাছ, বালিতে ভর্তি। আরও কয়েকবার শিমুলতলা গিয়েছি কিন্তু প্রথমবারের সুখস্মৃতি ভোলা কঠিন।

স্কুলে পড়বার সময় প্রথমবার কাশী গিয়েছিলাম। কাশীর কয়েকটি জিনিস সবায়ের ভাল লাগে। রেলওয়ে ব্রিজের উপর থেকে গঙ্গার দৃশ্য, গঙ্গার ঘাটের শোভা, বাঙালিটোলা আর বিশ্বনাথের মন্দিরের গলি, কচুরি গলির রাবড়ি। ষাট বছর আগে কাশী শহর ছাড়ালেই পাড়াগাঁ। কাশী থেকে সারনাথ যেতে হলে ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া আর কোনো বাহন ছিল না। সকালে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে রাস্তার দু'ধারে বুনো কুল, আমলকীগাছ দেখতে দেখতে বেলা হলে পৌঁছনো যেত। এখন যেমন সারনাথের রাজকীয় অবস্থা, তখন সেরকম ছিল না। সারনাথে পৌঁছে ধামেকস্তূপ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। তার আগে ধামেকস্তূপের ছবি অনেকবার দেখেছি। কিন্তু প্রথম দেখার বিস্ময় সহজে যেতে চায় না। এরপর যখন গিয়েছি তখন আরও তিরিশ বছর চলে গিয়েছে। সারনাথে যাবার রাস্তা তখন সংস্কৃত হয়েছে। আমার কলেজের বন্ধু অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানকার যাদুঘরের কিউরেটার ছিলেন। তিনি খুব উৎসাহ করে আমাকে সব দেখাতে লাগলেন। কিন্তু সেসব সত্ত্বেও প্রথমবারের আনন্দ আর ফিরে আসেনি। সবচেয়ে ভাল লাগে কাশীকে একটু দূর থেকে। একবার, বোধহয় লখনউ থেকে কলকাতা ফিরছি, পুলের উপর থেকে কাশী দেখলাম। বেণীমাধবের ধ্বজার একটি মিনারেট নেই। শহরের অর্ধেক এবং গঙ্গার জল কুয়াশায় ঢাকা। হাল্‌কা কুয়াশার মধ্য দিয়ে বাকি শহর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ মনে হল এইখানে নেমে পড়লে কেমন হয়। আর একবার আমার এইরকম মনে হয়েছিল। দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরছি। ট্রেন ছাড়বার আগেই শুনলাম গাজিয়াবাদ স্টেশনের কাছে একটি মালগাড়ি লাইন থেকে পড়ে গেছে। আমাদের নিউদিল্লি স্টেশন হয়ে মথুরা বৃন্দাবনের পথে টুণ্ডলা হয়ে কলকাতার পথে আসতে হবে। দিল্লি থেকে নিউদিল্লি ট্রেনে গেলে সমস্ত বাদশাহি দিল্লি চোখে পড়ে। ট্রেন থেকে দিল্লির পিছন দিক ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। বৃন্দাবন পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। আমি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নই। কিন্তু বৃন্দাবন স্টেশনে মনে হল এখানে দু'দিন থেকে গেলে বেশ হয়। বৃন্দাবনে ট্রেন অল্পক্ষণ দাঁড়ায়, বোধহয় তিন মিনিট। এই তিন মিনিট ধরে ক্রমাগত মনের সঙ্গে লড়াই করেছি। প্রায় নেমে গিয়েছিলাম, এমন সময় ট্রেন চলতে আরম্ভ করল। দুঃখ বেশি হল, না স্বস্তি বেশি হল, জানি না।

তাছাড়া হাজারিবাগ রোডের কথা প্রায়ই মনে হয়। হাজারিবাগ টাউনে গিয়েছিলাম তখন বি· এ· ক্লাসে পড়ি। মণীন্দ্রলাল বসুর রমলা উপন্যাসের প্রথমেই পুশপুশে হাজারিবাগ যাওয়ার বর্ণনা আছে, 'রক্তের মত রাঙ্গা লালমাটির পথ।' হাজারিবাগ রোড স্টেশনে পৌঁছে ঠিক রক্তের মত লালমাটি না দেখে একটু নিরাশ হয়েছিলাম। হাজারিবাগ রোড, যেখানে ট্রেন থেকে নেমে টাউনে যাবার বাসে উঠতে হয়, অতি সুন্দর জায়গা। সেখানে ছোট নদী, দূরে পাহাড় এবং বেড়াবার মাঠ। যে বাড়িতে ছিলাম সেখানে একজন বাঙালি ডাক্তার আগে থাকতেন। বেশিদিন তাঁর মৃত্যু হয়নি। রাস্তা থেকে ঢুকেই প্রথম ঘরে তাঁর টেবিল এবং ওষুধ মাপবার যন্ত্রপাতি। কে রটিয়ে দিয়েছিল যে গভীর রাত্রে দেখতে পাওয়া যাবে মৃত ডাক্তারবাবু টেবিলের সামনে বসে ওষুধ মাপছেন। তার ফলে বেশি রাত্রে তাঁর ঘরে যেতে কারুর কারুর গা ছমছম করত। সপ্তাহে বোধহয় দুদিন হাট। সমস্ত রাত গরুর গাড়ি ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে জিনিসপত্র নিয়ে হাটের দিকে যেত। বাড়ির লোকের রাত্রে ঘুম হত না।

একদিন অন্য কারণে একটু উত্তেজনা হয়েছিল। আমরা একটু বেশি রাত্রে খেতে বসতাম। রাধামোহন ভট্টাচার্য কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছিল। একদিন খাওয়ার পর রাধামোহন আমাদের বলল, তোমরা একবার বাইরে এসো। বাইরে এসে শুনলাম দূরে গ্রামের কুকুর ডাকছে। মনে হল ভয় পেয়েছে। যাকে 'ফেউ' ডাকা বলে। তার অল্পপরেই নেকড়ের ডাক শোনা যেতে লাগল। রোজ রাত্রে খেয়ে দেয়ে আমরা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতাম কুকুরের ডাক, তারপর নেকড়ের ডাক শোনবার জন্য।

হাজারিবাগ শহরেও গিয়েছি, কিন্তু শহর অত সুন্দর নয়। হাজারিবাগে যে বাড়িতে ছিলাম তার নাম 'দিলখুশা'। একজন মেমসাহেবের বাড়ি, তিনি ভাড়া দিতেন। বাড়িতে কোনো আসবাব ছিল না। মেমসাহেবের ভাষায় বাড়ি মানে বাড়ি, কোনো আসবাব নয়, তাঁর চিঠিতে ছিল—'not a piece of wood'। আমাদের সঙ্গের জিনিসপত্র খুব বেশি ছিল বলে বাড়ির কেউ একটি ঠাকুর ও দু'জন ভৃত্যকে নিয়ে আগে চলে যেত। তার কাজ ছিল আগে রিপোর্ট পাঠানো বাড়ি কী রকম। তা নাহলে মা'র মন খুঁতখুঁত করত। অবশ্য কোনো খারাপ বাড়ি

রিপোর্টের গুণে ভাল হয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাহলেও যা রীতি ছিল তাই বলছি। হাজারিবাগে যিনি গিয়েছিলেন তাঁর নাম ধীরেন নিয়োগী। তাঁর কথা আগেই বলেছি। তিনি সে সময়ে পুলিশের মতে খুব দুঃসাহসী ছিলেন। সেজন্য পরে তাঁকে অনেকদিন বক্সার জেলে আটক করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে প্রথম গিয়ে রিপোর্ট দিতে হলে তাঁর হৃৎকম্প হত। কিছুদিন আগে বিষ্ণু দে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে পুজোর ছুটিতে বাইরে যাবার সময় আমাদের সঙ্গে একশ উনত্রিশটি মাল যেত। প্রথমে ভেবেছিলাম এটা অত্যুক্তি। ষাট-সত্তরটি হলেও বা কথা ছিল। পরে ভেবে দেখলাম বিষ্ণু দে ঠিক কথাই বলেছেন। কেননা আমাদের ফর্দে অনেক সময় একজোড়া চটিকে দুটি মাল বলে দেখানো হত, প্রত্যেক পাটিকে আলাদা করে গোনা হত। ছাতা চারটে, লাঠি দুটো, লণ্ঠন ছটা, হ্যাজাক্‌ তিনটে—এই সংখ্যায় হিসাব করতে করতে একশো পেরিয়ে গেলে আমি আশ্চর্য হব না। যাই হোক, ধীরেন নিয়োগী হাজারিবাগে পৌঁছে চিঠি লিখলেন, 'বাড়ির নাম 'দিলখুশা' বটে কিন্তু বাড়ি দেখিয়া দিল খুশ হইল না।' বাড়ি দেখে কার মেজাজ কী রকম থাকবে এই ভাবনায় দুরুদুরু হৃদয়ে পৌঁছে দেখি চমৎকার বাড়ি। সেকেলে ধরনের বাংলো, খুব বড় বড় উঁচু ঘর। আলাদা ভাড়া দেওয়া হবে আশ্বাস দেওয়ায় মেমসাহেবের ফার্নিচার এসে পৌঁচেছে। সেগুলির বয়স হয়েছে কিন্তু খারাপ নয়। বাড়ির একদিকে দেবদারু গাছের দীর্ঘ সারি। বাড়ি দেখে সবাই খুব খুশি। পত্রলেখককে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি এরকম চিঠি লিখলে কেন ? তিনি আমাকে বললেন, 'বলা তো যায় না কার কী রকম লাগবে। আগে থেকে 'সেফ-সাইডে' থাকা ভাল।' যা হোক, হৈ চৈ করে চার-পাঁচ সপ্তাহ কেটে গেল। এটি আমার আর একটি সুখ-স্মৃতি। অমিয়রঞ্জন রায়চৌধুরী কিছুদিন পরে এসেছিল। তখন আমরা বি· এ· ক্লাসে পড়ি। সে সকালে চা খাবার পর গাছে উঠে কলেজের পাঠ্যবই As You Like It পড়ত। থেকে থেকে 'ফেউ' ডাকার মতো শব্দ করত, বলত এতে তার শরীর ভাল থাকবে।

রাঁচি কয়েকবার গিয়েছি। প্রথম গিয়েছিলাম এগারো-বারো বছর বয়সে। তখন রাঁচি এত বড় শহর হয়নি। স্বাস্থ্যকামীরা অনেকে আসতেন। চলাফেরার জন্য পুশপুশ নামে মানুষ ঠেলা একধরনের গরুরগাড়ির মত যান ছিল। আট-ন' বছর পরে দেখেছি ট্যাক্সি পাওয়া যায়। প্রথমে যখন গিয়েছিলাম সেই স্মৃতিই সবচেয়ে রমণীয়। তখন মোরাবাদি পাহাড়ের নাম 'টেগোর হিল' হয়নি। এই পাহাড়ের তলায় একটি ছোট বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়েছিলাম। মোরাবাদিতে ঠাকুরবাড়ির কেউ কেউ এসে থাকতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ জীবন এখানেই কাটিয়েছিলেন। যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাহলেও পাহাড়ের উপরে উঠতে কোনো বাধা ছিল না। রোজ বিকালে কলকাতার চেঞ্জারবাবুরা ছোট ছোট দলে পাহাড়ের উপর পর্যন্ত উঠে এসে ফিরে যেতেন। তখন এদিকে খুব জঙ্গল ছিল। মোরাবাদি পাহাড়ে কিংবা কাছাকাছি বাঘ আছে কিনা এ প্রসঙ্গ অনেক পরিবারে সন্ধ্যার পর রোমাঞ্চকর আলোচনার বিষয় হত। রাঁচি শহরের এক প্রান্তে ডোরাণ্ডা পল্লী, সেখানে প্রবহমান নদী, জল বেশি নেই। শীতের প্রারম্ভে

জল খুব কম, কিন্তু খুব স্বচ্ছ। প্রথমবার যখন গিয়েছিলাম তখন অন্য পথে যেতে হত। পুরুলিয়া দিয়ে। ঝালদায় খুব ভাল লাঠি বিক্রি হত, অনেকদিন পর্যন্ত কয়েকটি লাঠি বাড়িতে ছিল।

মধুপুর থেকে একবার গিরিডি গিয়েছিলাম। সেখানে তখন অমিয়প্রসাদ মৈত্র ছিল। এ যাওয়া প্রায় চড়ুইভাতির মতো, সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এলাম। অমিয় মৈত্রর তখন বেশিদিন বিয়ে হয়নি। তার স্ত্রী খুব যত্ন করে, একটু বেশি মশলা ও ঝাল দিয়ে মুরগি রান্না করেছিলেন মনে আছে। আমরা খুব আনন্দ করে খেয়েছিলাম। সেই আনন্দের দিন মনে পড়লে এখনও গিরিডি যেতে ইচ্ছা করে। যদিও একথা ভাল করে জানি যে, সেই ঝাল মশলা আর তেল-ঘি'র রান্না এখন আর খাওয়া চলবে না।

যখন এম· এ· পড়ছি তখন সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা বোধহয় রবীন্দ্রনাথের জন্ম সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর, আমাদের এম· এ· পরীক্ষা শেষ হয়েছে, কাজেই হাতে অখণ্ড অবসর। তখন সরকারি অনুদান পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও পরিশ্রম উৎসবটিকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিল। বড়দের যে অভ্যর্থনা সমিতি, তার সম্পাদক হিসাবে অমল হোম আশ্চর্য সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিধানচন্দ্র রায় তখন কলকাতার মেয়র। ছাত্র-ছাত্রীদেরও আলাদা একটি উৎসব পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই সূত্রে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছিল। সেই বন্ধুত্ব এখনও অনেকের সঙ্গে অক্ষুণ্ণ আছে। প্রমথনাথ বিশী, পুলিনবিহারী সেন, ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন, কানাইলাল সরকার, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এঁদের সঙ্গে এই সময় আমার পরিচয় হয়। আমি প্রকাশনার কাজ দেখতাম। এই কাজে আমার হাতেখড়ি বললেই চলে, বিশেষ কিছুই জানতাম না। একদিন নীহাররঞ্জন রায়কে একথা বলেছিলাম। তার দু'তিন দিন পরে চশমা চোখে শ্যামাঙ্গ এক যুবক একটি চিঠি হাতে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। চিঠির বয়ান এই রকম—ভাই প্রতুল, এই ছেলেটিকে তোমার কাছে পাঠালাম। বোধহয় তোমার কাজ চলবে। 'ছেলেটিকে' তখন বিশেষ কেউ চিনত না। তাঁর নাম পুলিনবিহারী সেন।

শীতের সময় না হলে উৎসবের আয়োজন করা সঙ্গত হবে না। একথা বিবেচনা করে জয়ন্তী উৎসব সমিতি বড়দিনের সময় উৎসব পালন করবেন ঠিক হল।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৩১, অপরাহ্ণে কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হল। নানা প্রতিষ্ঠান, যেমন কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব সমিতি প্রভৃতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটির পৃথক উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম প্রতিভাষণ, 'বিপুল জনতার বাণীসঙ্গমে আজ আমি স্তব্ধ...' অনেকের মনে পড়তে পারে। এই উপলক্ষ্যে 'দি গোল্ডেন

বুক অব টেগোর' ও জয়ন্তী উৎসর্গ, উৎসব পরিষদ প্রকাশ করে। এর চারদিন পরে ৩১ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধুনালুপ্ত সেনেট হলে ছাত্র-ছাত্রী পরিষদ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা হল। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। ছাত্র-ছাত্রী উৎসব পরিষদ কবি-প্রশস্তি নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিল। আমার আনাড়ি হাতের কাজ এই বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য বলে তার দাম বেড়েছে।

কবি-প্রশস্তি বইটি আকারে ছোট। কিন্তু ছাপতে বেগ পেতে হয়েছে। তখন ছাপাখানার জন্য এত অসুবিধা ভোগ করতে হত না। তাহলেও খারাপ প্রেস মালিকের অভাব ছিল না। বইটি শেষ পর্যন্ত ভাগ করে দুই প্রেস থেকে ছাপতে হল। তখন কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা হয়েছে, দেখে শুনে পৃথিবীকে অবিশ্বাস করতে শিখেছি। এক ছাপাখানা অনেকদিন কাজ ফেলে রেখেছিল। ছাপাখানায় গিয়ে তাড়া দিতেই তারা বলল, 'ওই তো আপনাদের ম্যাটার চাপানো রয়েছে।' যে 'ম্যাটার' চাপানো ছিল সেটা আমাদের কিছু নয়, কোনও কবিরাজি দোকানের ওষুধ ক্যাটালগ কিংবা ওইরকম আর কিছু। এরপরে বইয়ের বাকি অংশের জন্য অন্যত্র যাওয়া ছাড়া উপায় রইল না। অবশেষে একদিন কাজ শেষ হল। যে প্রেসে কাজ হল, সে ছাপাখানা এতদিন টিকে আছে কিনা জানি না। প্রেসের কর্তা খদ্দরের ধুতি পরতেন। যাকে তখনকার দিনে স্বদেশী করা বলত, একসময় তাই করেছেন। ভদ্রলোকের নাম ভুলে গিয়েছি। কাজ শেষ হবার দিন পুলিনবাবু আর আমি তাঁর কাছে গিয়েছি। তিনি বললেন, 'বসুন, কথা আছে।'—এই বলে তিনি দুটি করে সন্দেশ ও দু'গ্লাস জল আনালেন। বললেন, 'বইয়ের কাজ তো শেষ হয়েছে। সন্দেশ দুটি খান। আগেই বুঝেছিলাম এই বাজারে বই ছাপানো আপনাদের কাজ নয়।' পুলিনবিহারী তারপর অনেক বই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কবিপ্রশস্তির এই অভিজ্ঞতার কথা তাঁর নিশ্চয় মনে আছে। ছাপাখানার সেই ভদ্রলোকের চেহারা ভাল করে মনে নেই, কিন্তু প্রকাশকরা দুটি অবচীন যুবকের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করেন না।

আজ পঞ্চাশ বছর পরে মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-ছাত্রীদের একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশে তিনি যে ভাষণ পাঠ করেছিলেন তার গুরুত্ব তখন হয়তো সম্পূর্ণ বুঝিনি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্তিযোগ যে কত ছিল সে আমাদের কল্পনাতেও আসেনি। এই উপলক্ষ্যে তিনি 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যটি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দু'দিন অভিনয় করিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলবার আছে। দূরদর্শনে কিছুদিন পূর্বে শ্রীমতী অমিতা সেন একটি সাক্ষাৎকারে এই নৃত্যনাট্যের উল্লেখ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, কলকাতা থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকজন ছাত্র এসে গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলে রাজি করিয়ে গেলেন। তার মধ্যে প্রতুলবাবুও ছিলেন। আমার এই দলে যাবার কথা ছিল শুনে কৃতিত্বের ভাগ নেওয়া চলত, কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষ মুহূর্তে কোনো কারণে আমার যাওয়া হল না। দূরদর্শন দেখবার তিনচার দিন পরে শান্তিনিকেতনে শ্রীমতী অমিতা সেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তাঁকে সব কথা খুলে বললাম। তিনি একটুও দমলেন না। উলটে আমাকে বললেন,

কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া

'আমার তো ধারণা আপনিও ছিলেন। আমার মন যখন বলছে আপনি ছিলেন, যা বলেছি ঠিকই বলেছি।' এ থেকেই বোঝা যাবে যে ইতিহাস লেখা কী রকম কঠিন কাজ।

কলেজে পড়বার সময় আমাদের একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকান। প্যারিসে পুরনো বইয়ের দোকানের খুব সুনাম আছে। সেখানেও পরে গিয়েছি। কিন্তু সে ভাষা তো আমার জানা নেই, কাজেই সেরকম ঘনিষ্ঠ যোগ হয়নি। বরং লণ্ডনে চেয়ারিং ক্রস রোডে পুরনো বইয়ের দোকানগুলির সঙ্গে ভাব হয়েছিল। অক্সফোর্ড কেমব্রিজে বড় পুরনো বইয়ের দোকান আছে, কিন্তু তারা একক।

প্রথম কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় খুব অল্প বয়সে। এম· সি· সরকারের পুরনো দোকানে। তখন রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকার কখনও কখনও দোকানে আসতেন। তাঁকেও একবার দেখেছি। কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকানগুলির মধ্যে অ্যালবার্ট হলের সিঁড়ির তলায় একজন বুড়ো ভদ্রলোকের দোকান ছিল। খুব পরিচিত নাম, কিন্তু এখন মনে পড়ছে না। এম· এ· পড়বার সময় তাঁর কাছ থেকে অবিশ্বাস্য সস্তায় সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ কিনেছিলাম। দোকানের কথা বলতে গেলে পুরনো সেন ব্রাদার্সের কথা মনে পড়ে। যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, তখন ভোলানাথ সেনকে তাঁর দোকানে খুন করা হয়। কলেজ স্ট্রিটে আরও অনেক দোকান ছিল। সেখানে ছাত্রদের সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করা হত না। মনে হত আমাদের তাড়াতে পারলেই তাঁরা বাঁচেন। ভোলানাথ সেনের ব্যবহার একেবারে বিপরীত। একটি পনের বছরের ছেলে বই কিনতে গেলেও এমন ব্যবহার করতেন যেন সক্রেটিস স্বয়ং দোকানে উপস্থিত হয়েছেন। এবং একটি বই কিনতে চাইলে পাঁচখানা বই দেখাতেন। ভোলানাথ সেনের কথা আশা করি কারুর কারুর মনে পড়বে। বুক কোম্পানিরও খুব সুনাম ছিল। কিন্তু সেখানে আমরা বড় যেতাম না, আমাদের মাস্টারমশায়রা যেতেন।

যারা এখন পারিণত বয়সের তারা ছাড়া কারুর বোধহয় জানা নেই সুরেন ব্যানার্জী রোডে, তখন কর্পোরেশন স্ট্রিটে, একটি এক্সক্লুসিভ চায়ের দোকান ছিল। এখন যেখানে অ্যামেরিকান সেণ্টারের লাইব্রেরি তার প্রায় উল্‌টো দিকে। এক্সক্লুসিভ এই জন্য বলছি, এটি প্রকৃতপক্ষে চুরুট ও তামাকের দোকান। গুটি চারেক টেবিল ছিল, সঙ্গে কয়েকটি চেয়ার। খুব কম লোকই জানতেন যে, এখানে চা ও সিঙ্গাড়া পাওয়া যায়। ব্রতিশঙ্কর রায় আমাকে প্রথমে এই দোকানটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো কোনো দিন ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে এই চায়ের দোকানে বসে জামাকাপড় শুকিয়েছি।

যখন আইন কলেজে পড়ি তখন ছেলেরা আশুতোষ বিল্ডিংয়ের খুব কাছে একটি ছোট দোকানে চা খেতে যেত। নাম বসন্ত কেবিন। বোধহয় ঐ সময়েই দোকানটির আরম্ভ হয়। খুব ছোট দোকান এবং দাম খুব সস্তা। একটি ছেলে হাফপ্যাণ্টের উপর গামছা বেঁধে নতুন খরিদ্দার এলেই চেঁচাত, চিনি না মরিচ?

অর্থাৎ টোস্টে চিনি দেওয়া হবে, না মরিচ দেওয়া হবে। যাঁরা বিবেচক লোক তাঁরা বলতেন, 'একটায় চিনি, একটায় মরিচ।' এছাড়া ডিমসেদ্ধও পাওয়া যেত। সস্তার দোকান বলেছি বটে কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের ভিতরে রায়মশায়ের দোকানও কিছু কম সস্তা ছিল না। রায়মশায় ফর্সা রং, নধরকান্তি, প্রায় প্রৌঢ় ব্যক্তি ছিলেন। শিয়ালদা স্টেশন থেকে বেরিয়ে হ্যারিসন রোডের মোড়ে তাঁর বড় চায়ের দোকান ছিল। বেলা বারোটা বাজতে না বাজতে পান চিবোতে চিবোতে রায়মশায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আসতেন। তাঁর পিছনে একটি লোক আসত, মাথায় স্টিল ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্ক ভর্তি খাবার। কলেজের কর্তারা আর্টস বিল্ডিং-এ অনেকটা জায়গা তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। টেবিল-চেয়ারও কলেজের সম্পত্তি। এখনকার ভাষায় সাবসিডাইজড দোকান। রায়মশায় একটি আলমারিতে খাবারগুলি সাজিয়ে রাখতেন। সাড়ে বারোটা একটা থেকে ছেলেরা আসতে শুরু করত। বেশিরভাগ দিনই আমরা খেতাম দুটো করে সিঙ্গাড়া আর এক পেয়ালা চা। সাত পয়সা পড়ত। এর চেয়ে সস্তা আর কী হতে পারে? ছাত্রদের খাবার জায়গা আরও ছিল কলেজ স্কোয়ারের পুব দিকে দুটি সরবতের দোকান। একটির নাম 'প্যারাডাইস', আর অন্যটির নাম 'প্যারাগন'। সেখানে গ্রীষ্মের সময়ে ছেলেদের ভিড় হত। একটি দোকান এখনও আছে শুনেছি।

এম· এ· পরীক্ষার ফল বের হবার আড়াই বছর পরে বিলাত চলে গেলাম। এই আড়াই বছর যে খুব সুখে কেটেছে তা নয়। তখন বাংলা দেশে লিগ মন্ত্রিসভা। ফলে চাকরি পাবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। চাকরির বাজারও খুব খারাপ। তখন অনেকে এম· এ-র সঙ্গে আইন পড়তেন। দু'বছরে এম· এ· শেষ হত, আইন পড়তে তিন বছর লাগত। সবাই যে ভালবেসে পড়তাম তা নয়। তবে সম্মুখেই চাকরি না পাবার ভয়। সেই পারাবার যাতে ধীরে ধীরে পার হতে পারি তার ক্ষীণ চেষ্টা। যাঁরা আইনে উৎসাহী ছাত্র ছিলেন তাঁরা ভাল ফল দেখিয়ে মুনসেফের চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু সে তো কয়েক বছর পরের সম্ভাবনা। আইনের দিকে আকর্ষণ আমার বিশেষ ছিল না। আমার আগের দু'পুরুষ নামকরা আইনজ্ঞ ছিলেন। আমার মনে হত two is enough। আমার প্রজন্মেও আমার কনিষ্ঠ একজনের আইনজ্ঞ বলে সুনাম হয়েছে। কিন্তু ছাত্র অবস্থায় অল্প বয়সেই আইন ব্যবসায়ীদের এত শ্রান্ত মুখ দেখেছি যে, এই ব্যবসা কখনও আমাকে আকর্ষণ করেনি। আইনের সব গ্রন্থই যে সমান মন দিয়ে পড়েছিলাম তা নয়। এখন আইন পরীক্ষার পাঠক্রমে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তখনকার পাঠক্রমে কয়েকটি বিষয় ছিল যা ইতিহাসের ছাত্রদের অবশ্যই জানা উচিত। এর ফলে আমি মনে করি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনেক জিনিস বুঝতে আমার সুবিধা হয়েছে। তখনকার আইনের ক্লাস সকালে এক ক্ষেপ হয়ে যেত। দ্বিতীয় ক্ষেপ আরম্ভ হত বেলা দশটায়, অর্থাৎ এগারোটায় এম· এ· ক্লাস আরম্ভ হওয়ার আগে। আইনের ক্লাসে এত রকম মজা ছিল যা 'ক্যালকাটা উইক্‌লি নোটস্'-এর পাতা দেখে বুঝবার উপায় নেই। মাস্টারমশায়েরা অনেকে খুব দেরি করে আসতেন। সেইটাই ছিল সাধারণ রীতি। একজন এত দেরি

করতেন যে পরের ঘণ্টা বাজবার আগে এসে পৌঁছবেন কি না তা নিয়ে গবেষণা হত। আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন মন্মথনাথ রায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের ভাল ছাত্র বলে একসময় নাম ছিল। তাঁর পিতা মহেন্দ্র রায় কলকাতা হাইকোর্টের বড় উকিল ছিলেন। মন্মথবাবু খুব সদাশয় লোক ছিলেন, এবং খুব দেরি করে আসতেন বলে আমরা সবাই তাঁকে ভালবাসতাম। পারসেণ্টেজের জন্য একটুও কড়াকড়ি করতেন না। কাউকে ক্লাসে দেখতে না পেলে তার কোনো বন্ধু এসে বলত, 'এইমাত্র বেরিয়ে গেছে স্যার। বলে গেছে একটু পরে আসবে।' ছেলেটি পারসেণ্টেজ পেত। কোনো অনুপস্থিত ছাত্র সম্বন্ধে হয়তো আমরা কেউ বললাম, 'তাকে তো এইমাত্র কলেজ স্কোয়ারে দেখলাম।' আমরা আশা করতাম সেও পারসেণ্টেজ পাবে। আমাদের সঙ্গে বিখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতা মোহিত চট্টোপাধ্যায় পড়তেন। আমাদের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। আমরা তাঁকে দাদা বলতাম। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একটি ভাল নিয়ম প্রচলন করেছিলেন, ক্লাসে মাঝে মাঝে 'ম্যুট কোর্ট' বসাতে হবে। অর্থাৎ হাইকোর্টে যেভাবে বিচার চলে সেইটাই প্রকৃতপক্ষে অভিনয় করে দেখানো হত। যে সব বড় মোকদ্দমা, যাকে লিডিং কেস বলে সেই সব মোকদ্দমার পুনরভিনয় হত। মাস্টারমশায় জজসাহেব হতেন। আমরা কেউ এপক্ষে কিংবা ওপক্ষে উকিল কিংবা ব্যারিস্টার হতাম। 'ক্যালকাটা উইকলি নোটস্' কিংবা অন্য কোনো আইনের পত্রিকা পড়ে তৈরি হয়ে আসতে হত। কোনো লেখা জিনিস 'কোর্টে' পড়া যেত না, কিন্তু নোট ব্যবহার করা যেত। কেউ কেউ খুব তৈরি হয়ে আসতেন এবং ভাল বলতেন। মোহিতবাবুর পালা এলে তাঁর মক্কেলের মামলা দেওয়ানি না ফৌজদারি কিছুই খোঁজ রাখতেন না। তিনি উঠে দাঁড়ালে আমরা যথাসাধ্য স্মারকের কাজ করতাম। একটি ফৌজদারি মামলায় মোহিতবাবু কিছু না জেনে উঠে দাঁড়িয়েছেন আসামির পক্ষে। প্রম্পটারের সাহায্য সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। অবেশেষে তিনি বললেন, 'হুজুর, সবই তো বুঝতে পারছেন আমার মক্কেল দোষী। হুজুর দয়া না করলে তার বাঁচবার আশা নেই।' এই বলে বসে পড়লেন। 'হুজুর' কটমট করে তাকিয়ে রইলেন এবং অমরা যথাসম্ভব কোলাহল করতে লাগলাম। আর একদিন মোহিতবাবু তাঁর কেস খানিকটা দেখে এসেছিলেন। কিন্তু তিনচার মিনিট বলে পাশে বসে থাকা ছেলেটিকে আঙুলের খোঁচা মেরে বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও দাদা, বাজারে আজ মাছের দর কত ?' ক্লাসে কী রকম গোলমাল হল, কল্পনা করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য, মন্মথবাবুর ক্লাস। তিনি কখনও প্রতিবাদ করতেন না, কিন্তু এ ব্যাপারে প্রতিবাদ না করে পারলেন না। মোহিতবাবু হাতজোড় করে বললেন, 'হুজুর, মাপ করবেন। আমাদের কেষ্টনগরের কাছারিতে এরকম হয় কিনা। আমি তো কখনও হাইকোর্ট দেখিনি।' মোহিতবাবু বহুদিন নেই। কিন্তু তিনি বিমল হাস্যরসে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংকে অভিষিক্ত করে রাখতেন। সে কথা প্রায়ই মনে হয়।

অবশেষে আইন কলেজে অধ্যয়নের দিনও ফুরিয়ে এল এবং শেষ পরীক্ষাও।

আগেই বুঝেছিলাম এ পথ আমার জন্য নয়। এম· এ· পরীক্ষার ফল বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তার পূর্বে পেশোয়াদের পতনের ইতিহাস নিয়ে লেখাপড়া করেছিলাম। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর একটি লেখায় বলেছিলেন, পেশোয়াদের 'কানাগলি'র প্রতি আমার বিশেষ আসক্তি। কার কিসে আসক্তি কেন হয় বলা খুব কঠিন। 'পোড়া পতঙ্গ যত মানা কর আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে'। তবে একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে—যাকে স্টোরি অব সাকসেস বলে তার কাহিনী আমাকে কখনও তেমন আকর্ষণ করেনি, বরং পতনের কাহিনী অনেক বেশি করেছে। এর অর্থ এই হতে পারে, কোনো দেশে যখন অধঃপতন হয় তখন সেখানে যথার্থ অসাধারণ লোকের চেহারা বড় চোখে পড়ে না। যাদের দেখি তাদের মধ্যে বেশির ভাগই সাধারণ মানুষ। তাদের মুখের সঙ্গে আমার মুখের আদল দেখতে পাই। ভাল হোক, মন্দ হোক, তারা আমার অনেক চেনা লোক। প্রথম বয়সের নেপোলিয়ন আমার চেনা জগতের লোক নন। কিন্তু শেষ বয়সের নির্বাসিত, অসুস্থ, অব্যবস্থিতচিত্ত নেপোলিয়ন আমার অনেক চেনা মানুষ। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তাই। শিবাজি অনেকটা দূরের লোক, পুজোর ফুলে আচ্ছন্ন। কিন্তু পেশোয়াদের শাসনের শেষে নানাসাহেব ঊনবিংশ শতাব্দীর যে কোনো জায়গার ধনী দত্তকপুত্রদের মত স্থুল, লোভী এবং পূর্বের পেশোয়াদের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সব মানসিক সম্পর্ক বিবর্জিত।

১৯৩১ সাল থেকে মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছিলাম। 'বিচিত্রা'য় দুটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তৃতীয়টি 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে। তখন থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্র দেখতে আরম্ভ করি। আমাদের সময় কোনোরকম সরকারি বা বেসরকারি সাহায্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় সামান্য বৃত্তি দিতেন গবেষকদের। বৃত্তি সামান্য এবং সংখ্যা নগণ্য। কাজেই আমাদের মতো লোকের কাছে তার ছিটেফোঁটাও পৌঁছনো সম্ভব ছিল না। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা ধরেই নিয়েছিলেন, আমি আইন-ব্যবসায়ী হব। কেন ধরে নিয়েছিলেন তা তাঁরাই জানতেন। দুটি জিনিস আমাকে এই কাজে প্রবৃত্ত করেছিল। যাকে বলে ডাকসাইটে ভাল ছেলে, সে আমি কখনও ছিলাম না। পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া এবং একটি বিষয়কে ভাল করে শেখা, দুটি এক নয়। তার প্রমাণ একাধিকবার পেয়েছি। আমার বিশ্বাস ছিল পরিশ্রম করলে পেশোয়াদের শেষ কয়েক বছর সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর পাওয়া যেতে পারে। সেরকম চেষ্টা তখন পর্যন্ত কেউ করেনি। আশা করেছিলাম অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন আমার গবেষণায় উৎসাহ দেবেন। আশায় বিফল হইনি। তার উপরে এখন যাকে ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইণ্ডিয়া বলে, নয়াদিল্লির সেই মহাফেজখানা তখন কলকাতায় ছিল। রাজভবনের ঠিক পশ্চিমে লাল বাড়ি, এখন পুরোটাই ইনকাম ট্যাক্স অফিস। সেই আপিসে ঢুকবার রাস্তা রাজভবনের পশ্চিম দিকে ছিল। সে সময় এখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন কৃষ্ণশেখর বসু। রাজশেখর বসুর ছোট ভাই। তখন ডিরেক্টরের পদ সৃষ্টি হয়নি। কিপার অফ রেকর্ডস ছিলেন নবাবজাদা আবদুল আলি। লম্বা-চওড়া দেখতে, তবে আমরা তাঁকে বেশি দেখতে পেতাম না। তখনকার দিনে বড়সাহেবরা

অসূর্যম্পশ্য হয়ে থাকতেন। তাঁর শৌখিনতার কথা সর্বজনবিদিত ছিল। তিনি বেশিক্ষণ আপিসেও থাকতেন না। লাঞ্চের সময় তাঁর বাড়ি থেকে বড় টিফিন কেরিয়ার করে খাবার আসত। দুষ্টু লোকে বলত লাঞ্চের সময় তিনি খেতে খেতে আপিসের কাগজ সই করতেন এবং লাঞ্চের পর আপিস ছেড়ে চলে যেতেন। যা হোক, কৃষ্ণশেখরবাবুর আমলে আমরা ভালই ছিলাম। আপিসের কেরানিরাও বেশ ভদ্র। তাঁরা সবাই প্রৌঢ় বয়সের। তাঁদের সম্বন্ধে শোনা যায়, যাঁদের বাড়িতে অনূঢ়া কন্যা ছিল, গবেষকদের মধ্য থেকে সে সব কন্যাদের জন্য পাত্র সংগ্রহের চেষ্টা হত। তখন তো উইমেন'স লিব হয়নি। কন্যাদায় বিষম দায়।

১৯৩৪ সালের শরৎকাল পর্যন্ত মহাফেজখানায় প্রতিদিন যাতায়াত করেছি। তখন ট্রামে-বাসে এত ভিড় ছিল না। আসবার সময় এসপ্ল্যানেডে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে, এখন যাকে ন্যাশনাল লাইব্রেরি বলা হয়, কিছু সময় কাটিয়ে যাওয়া যেত। এখন তাকে এসপ্ল্যানেড থেকে আলিপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। এই প্রসঙ্গে তার কথা বলে নিই। একটি নিয়ম ছিল আঠার বছরের নীচে কোনো পাঠককে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু আমি তার পূর্বেই কলেজে ঢুকেই এখানে যেতে আরম্ভ করেছি। এই গ্রন্থাগার প্রথমে ছিল মেটকাফ হলে। অনেকদিন আগেকার কথা। সেখানে তখন যাঁরা যেতেন, তাঁদের পড়বার ঘর থেকে গঙ্গাদর্শন হত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসত গঙ্গার হাওয়া। আমার সেই ঘরে পড়বার সৌভাগ্য হয়নি। আমি পাঠক হবার আগেই সেটি এসপ্ল্যানেড ইস্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এখন সেখানে রাজনৈতিক আন্দোলনের জায়গা। একদিকে কে· সি· দাশের খাবারের দোকান। সেটি তখন ছিল কিনা মনে নেই। অন্যদিকে থ্যাকার্স পিঙ্কের বইয়ের দোকান। এই দুয়ের মাঝখানে বড় গেট। পড়বার ঘর একতলায়। প্রায় সত্তর-আশিজন একসঙ্গে বসতে পারতেন। লাইব্রেরিয়ান ছিলেন আসাদুল্লাহ্ সাহেব। তার আগে ছিলেন চ্যাপম্যান। তাঁকে অবশ্য আমার দেখবার কথা নয়। লাইব্রেরিয়ানকেও আমরা কদাচিৎ দেখেছি। তাঁর দপ্তর উপরে। বিশেষ জরুরি দরকার না হলে তিনি নীচে নামতেন না। তিনি এলে সবাই খুব তটস্থ হয়ে থাকত। রিডিং রুমের একদিকে রমণীবাবু বসতেন। রোগা, নিরীহ মানুষ। তাঁর চেয়েও নিরীহ কাউকে মনে হলে তিনি ক্ষত্রিয় তেজ দেখাবার চেষ্টা করতেন। সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের নাম সুরেন্দ্রনাথ কুমার। গলাবন্ধ কোট ও ট্রাউজার পরে আসতেন, মাথায় গোল টুপি। রং কালো। তাঁর অতি বড় বন্ধুও বলবেন না তিনি দেখতে সুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু যথার্থ পণ্ডিত ও পরিশ্রমী বলে তাঁর সুনাম ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কী বিষয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন আমার জানা নেই, কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় অস্কার ওয়াইল্ডের 'সালোমে' অনুবাদ করেছিলেন। আপিসে 'কড়া লোক' বলে তাঁর খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল। তাঁর সিট থেকে মাঝে মাঝে তিনি 'রমণী' বলে ডাকতেন। মৃদুস্বর হলেও প্রথমবারেই রমণীবাবুর কানে গিয়ে পৌঁছত এবং কলম ফেলে, নিম্নকণ্ঠে 'এই সারলে, এই সারলে' বলতে

বলতে যত মন্থর পদে হয় কর্তার টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতেন। তবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির দুটি বিপদ ছিল। দুপুরের পর থেকে খুব ভিড় হত। লাইব্রেরির কাছে হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট-কাছারি। একদল কালো কোট গায়ে ভদ্রলোক ক্লান্তদেহে পাখার তলায় বসে শ্রান্তি দূর করতেন। আর একটি বিপদ ছিল। প্রত্যেকটি চেয়ারে অগুনতি ছারপোকা। কালো-কোটপরা ভদ্রলোকেরা ছারপোকার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাঁধানো মলাটের ভেতরে রাখা মাসিক পত্রিকা চেয়ারের সিটে রেখে তার উপরে বসতেন। ভিড়ের জন্য চেয়ারের টানাটানি হত এবং অনেক পত্রিকা খুঁজে পাওয়া যেত না। স্বাধীনতা আসবার পর লাইব্রেরি যখন বেলভেডিয়ারে চলে গেল তখন তার নাম হল ন্যাশনাল লাইব্রেরি। তখন প্রথম লাইব্রেরিয়ান কেশবন তার খুব উন্নতি করেছিলেন। শুনেছি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বেলভেডিয়ারে যাওয়ার বাসের সুবিধা করে দেবেন। কথা বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি শুধু নাম আর জায়গা বদল করল। কিন্তু ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস ডিপার্টমেন্ট নাম তো বদলালই, কলকাতা পরিত্যাগ করে দিল্লি চলে গেল। ১৯৩৬ সালে সেপ্টেম্বরে যখন বিদেশ যাই, তখনই শুনেছিলাম ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস ডিপার্টমেন্ট দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে। শুনে আমাদের সবায়ের মন খারাপ। নবাবজাদা আবদুল আলি এর প্রতিবাদ করলেন এবং ভারত সরকারকে জানালেন কী কী কারণে দিল্লি নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। তার সবগুলিতেই আমাদের মতের মিল ছিল, একটি ছাড়া। আমরা শুনেছিলাম নবাবজাদা নাকি সরকারকে বলেছিলেন তাঁর শরীর দিল্লিতে ভাল নাও থাকতে পারে। যদি বলে থাকেন, তাহলে সরকার বাহাদুর তাতে বিশেষ কর্ণপাত করেননি। আমি বিলাত যাবার আগেই কাগজপত্র প্যাক করা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। যখন ১৯৩৬ সালের শেষে লণ্ডন থেকে ফিরে এলাম, তখন ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস ডিপার্টমেন্ট দিল্লিতে চলে গিয়েছে। পরে নতুন নাম হয়েছে ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইণ্ডিয়া। নবাবজাদা কিছুদিন দিল্লিতে কাজ করেছিলেন।

কলকাতার মহাফেজখানায় আমার প্রায় দু'বছর কাজ করা হল। কিন্তু কয়েকটি বড় অসুবিধা চোখে পড়তে লাগল। একটি অসুবিধার কথা বলছি। তখন নিয়ম ছিল যে, সমস্ত নোট কিংবা কাগজের নকল সরকারের অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা চলবে না। এখন সে নিয়ম সব দেশেই কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। অনুমোদন দিতে তখন সরকার বড় মজার ব্যবহার করতেন। ধরা যাক, আমি পেশোয়া এবং গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে চিঠি পড়ে নকল করেছি। সবশুদ্ধ তিনশো পৃষ্ঠা হবে। স্বভাবতই তার মধ্যে জয়পুর, নাগপুর, হায়দরাবাদ—এই সব রাজ্যের নাম থাকবে। আপনি একবছরের আগে কাগজ ফেরত পাবেন না। যখন পেলেন তখন দেখলেন কয়েকটি শব্দ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন, রাজনৈতিক বন্দীদের লেখা চিঠিতে দেখা যেত 'জয়পুর' শব্দ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। তারপর প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় মোহর অঙ্কিত করে ফেরত দেওয়া হল। ফেরত পেয়ে খুশি হলাম অবশ্যই, কিন্তু এত সময় যদি লাগে তাহলে আমার

দু'তিন হাজার কিংবা আরও বেশি পৃষ্ঠা নোট এভাবে পরিমার্জিত হয়ে আসতে আসতে আমার জন্ম কেটে যাবে। এইসব কাগজের মূল কিংবা প্রতিলিপি ইণ্ডিয়া অফিসেও থাকে। এবং সেখানে এরকম বাধা হয় না। আমার মনে হল তাহলে প্রেতলোকে প্রবেশ করবার পূর্বে আমার বইয়ের ছাপা দেখে যেতে পারব। আমার মাস্টারমশায় সুরেন্দ্রনাথ সেনকে বলাতে তিনি উৎসাহিত হলেন। তিনি বললেন, 'যদি যাও তাহলে অধ্যাপক হেনরি ডডওয়েলের কাছে পড়বে।' অধ্যাপক ডডওয়েল অবশ্য আমাদের কাছে তখন কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদনা করেছিলেন বলে পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া তাঁর লেখা 'নাবব্‌স অফ ম্যাড্রাস' বইটি আমার খুব প্রিয় গ্রন্থ ছিল। বাবা তখন কলকাতায় ছিলেন না। মালদাতে একটি কেস করতে গিয়েছিলেন। আমি কারু সঙ্গে বেশি বাক্যব্যয় না করে রাত্রের ট্রেনে মালদা রওনা হলাম। মনের আবেগে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটেছিলাম। কুপেতে আমি একা। আর একটি কুপেতে এক সাহেব উঠলেন। আমি যত আনন্দে ছিলাম, সাহেবটি তত আনন্দে ছিলেন না। পাশের কামরায় একটি চব্বিশ বছরের খদ্দর-পরা যুবক একা চলেছে, সঙ্গে বিশেষ কোনো লাগেজ নেই এবং মা, বোন, স্ত্রী কেউই নেই—সবই ঘোরতর সন্দেহের ব্যাপার। কিছুক্ষণ পরে একটি কোটপরা মোটসোটা ভদ্রলোক আমার কামরায় উঠলেন এবং কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞাসা করে নেমে গেলেন। পরদিন সকালে নদী পার হয়ে আবার ট্রেন। তখন সেই ভদ্রলোকটি আবার দেখা দিলেন। মালদায় কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কোথায় থাকব, কতদিন থাকব ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে পরিতৃপ্ত হলেন। আজকাল বাঙালি ছেলেদের যেরকম দুঃসময়, তাতে আমার মতো ছেলেদের মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত, এইসব ভাল ভাল কথা বলে নেমে গেলেন। পরে একটি স্টেশনে দেখি তিনি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সাহেবটির সঙ্গে কথা বলছেন। মনে হল সাহেবকে বোঝাচ্চেন তাঁর আর পাহারাদারের দরকার হবে না।

তখন বর্ষাকাল আসন্ন, অর্থাৎ আমের সময়। রাস্তার দু'পাশে আমের ঝুড়ি। নৌকাভর্তি আম চালান যাচ্ছে। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে আম ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করা নিষেধ। সেই দুপুরেই বাবার সঙ্গে লণ্ডনে যাওয়া নিয়ে কথা হল। পাঁচ মিনিটেই ঠিক হয়ে গেল আমি অক্টোবরে ভর্তি হবার জন্য চিঠি লিখব। সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতা ফিরে এলাম। এবার আর পুলিশ সাহেব আর তার টিকটিকি ছিল না। মন আরও হাল্‌কা ছিল।

কলকাতায় দেখলাম আমার কী পড়া উচিত সে-বিষয়ে কোনো কোনো অভিভাবকের মনে কোনো সংশয় নেই। কেউ কেউ চান আমি শুধু ব্যারিস্টারি পড়তে যাই। কারু কারু ইচ্ছা আমি যাই পাগলামি করি না কেন, ওদেশে আইন পড়াটাও আমার উচিত হবে। কারণ আইন পড়লেই অগাধ টাকা। আমার মামারবাড়ির অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের উপর অগাধ বিশ্বাস। এক মামার ইচ্ছা যে, আমি তাঁর মতো অক্সফোর্ডে ইতিহাস পড়ি। এ নিয়ে বাবা ছাড়া বোধহয় সবাই অল্পবিস্তর জোর করেছিলেন। আমি কিন্তু জানতাম যে খাতায় লিখে যে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে হয় সে-পরীক্ষা আমার জন্য নয়। আর,

যে-বিশ্ববিদ্যালয়েই হোক, নিজের দেশ থেকে এম· এ· পাস করে অন্য দেশে বি· এ· পড়বার কোনো অর্থ হয় না। ইতিমধ্যে অধ্যাপক ডডওয়েলের চিঠি এসে গেল যে, তিনি আমাকে ছাত্র হিসাবে নিতে রাজি আছেন।

তখন ইয়োরোপ ও আমাদের দেশের মধ্যে একাধিক স্টিমার কোম্পানির যাত্রিবাহী জাহাজ চলত। পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে ছাত্রদের টিকিট কিছু সস্তায় পাওয়া যেত। পি অ্যাণ্ড ও-র জাহাজে গিয়ে মার্সেই বন্দরে নেমে ট্রেন ধরলে পরদিন লণ্ডনে পৌঁছানো যেত। সময় হাতে থাকলে সেই জাহাজেই বসে থাকা যেত, লণ্ডন পৌঁছতে আরও দিন ছয়েক লাগত। ইটালিয়ান কোম্পানির জাহাজ বোম্বাই থেকে ছেড়ে বৃন্দিসি, মিলান বা অন্য কোনও ইটালীয় পোর্টে যেত। সেখান থেকে ট্রেনে প্যারিস হয়ে ফ্রান্সের পূর্ব সমুদ্র উপকূলের বন্দর। ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে লণ্ডন। ফরাসি কোম্পানির জাহাজও আসা যাওয়া করত। তবে ছাত্ররা তখন তার বিশেষ ভক্ত ছিল না। যে জাহাজে গিয়েছিলাম তার নাম Victoria। জাহাজটি ইটালিয়ান।

হাতে বেশি সময় ছিল না। যাওয়ার ব্যবস্থা করতে করতে কলকাতা ছাড়বার সময় এসে গেল। হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা হলাম। দেখলাম আমি একা নই, বীরেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগীও সেই ট্রেনে। তিনি ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছেন। বোম্বাই পৌঁছে আমার স্কুলের বন্ধু কমলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি দু' রাত্তির ছিলাম। সে তখন মাটুঙ্গায় থাকত, ভিনসেন্ট রোডের কাছে। সেখানে ইকনমিক উইকলির সম্পাদক শচীন চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হল। একটি ভিক্টোরিয়া গাড়িতে, কলকাতায় যাকে আমরা ফিটন বলি, বোম্বাই দেখতে বের হলাম। সমস্ত দিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, বেড়াবার দিন নয়। তবু বোম্বাই দেখে আমার ভাল লাগল। কিন্তু সমুদ্র দেখে হতাশ হলাম। একেবারে নিস্তরঙ্গ জল। পিয়ের লেটির লেখায় মাহে বন্দরের কাছে তৈলাক্ত ও শান্ত সমুদ্রের বর্ণনা আছে, সেই কথা মনে পড়তে লাগল। পরদিন প্রায় দুপুরে জাহাজ ছাড়বার কথা। শচীন চৌধুরী কমলকুমারকে বললেন, 'সকালে প্রতুলকে মাছের ঝোল ভাত খাইয়ে দিয়ো।' কমলকুমার একটু সাহেবি মেজাজের লোক। সে রাজি হল না। বলল. 'সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাবে। জাহাজে পৌঁছেই তো লাঞ্চ খাবে।'

পরদিন সকালেও আকাশ অন্ধকার, অল্প অল্প বৃষ্টি। বোম্বাইয়ে ভোর দেরিতে হয়। যখন উঠলাম তখন আলো জ্বেলে সবাই চায়ের ব্যবস্থা করছে। একটু পরেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। অনেক কষ্ট করে টাইয়ের গ্রন্থিবন্ধন শেষ হল। পঞ্চাশ বছর আগে আমরা তো এখনকার ছাত্রদের মতো বিলিতি পোশাকে অভ্যস্ত ছিলাম না। শেষটা একরকম দাঁড়াল, বন্ধুরা দেখে পাস-নম্বর দিলেন। জাহাজঘাটায় পৌঁছে মালপত্র, টিকিট, স্বাস্থ্য-পরীক্ষার কাগজপত্র ইত্যাদি দেখিয়ে ভিতরে ঢোকা গেল। বোম্বাই উপকূলে যতই নারিকেল কুঞ্জবন থাকুক, বোম্বাইয়ের জাহাজঘাটায় সে কুঞ্জবনের হাওয়া পৌঁছয় না। নিজের কেবিন খুঁজে নিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে ডেকে এসে দেখি জাহাজ ছাড়বার প্রায় সময় হয়েছে।

অবশেষে জাহাজ ছাড়ল। খালাসিদের ছোটাছুটি থেমে গেল। ডেকে

যাত্রীদের ভিড়। তীরে দাঁড়ানো বিদায়ার্থীদের চেহারা ছোট হয়ে এল। বোম্বাই বন্দরের কাছে কতকগুলি ছোট দ্বীপ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানে মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে নৌযুদ্ধ হয়েছে। দ্বীপের কাছে আসতেই সমুদ্র চঞ্চল হয়ে উঠল। ঢেউয়ের উপরে সাদা ফেনা। অভিজ্ঞ লোকেরা বলতে লাগলেন সমুদ্র একটু 'চপি' হয়েছে। আকাশে অল্প মেঘের আবরণ। বেলা ফুরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের গর্জন বাড়তে লাগল। অনেক যাত্রী রাত্রে খেতে এলেন না। জাহাজের খাওয়া যে খুব ভাল, তাতে সন্দেহ নেই, বিশেষত ইটালিয়ান খাবার। কিন্তু আমরা যেমন বিলিতি পোশাকে অভ্যস্ত ছিলাম না, সেরকম বিলিতি রান্নার ভালমন্দ তখন বুঝতে শিখিনি। আসবার আগে আমার একজন আত্মীয় বলেছিলেন,এখন সেপ্টেম্বর মাস, সমুদ্র পাটির মতো পড়ে থাকবে। সমুদ্র তাঁর কথা রাখেনি। তিন দিন ধরে বৃষ্টি, অল্প ঝড়। অবশেষে অশান্ত সমুদ্র নিজের খেয়ালে আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ডেকে সারি সারি চেয়ার পড়ল। তখনও বেশ গরম। ভিক্টোরিয়া জাহাজের প্রথম শ্রেণীর সবটাই বাতানুকূল। সেখানে কারু কারু নানা ছুতো করে ঘুরে আসবার লোভ ছিল। কিন্তু জাহাজের কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে খুব হৃদয়হীন বলে ফার্স্ট ক্লাসে যাবার রাস্তা বন্ধ করে রাখা হল। সমুদ্র ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর আমার সব বন্ধুবান্ধবদের এক এক করে খুঁজে পেলাম। শিখরেশ চক্রবর্তী ব্যারিস্টারি পড়ছিলেন। তিনি ছুটিতে দেশে এসে আবার যাচ্ছেন। সমুদ্রের সঙ্গে তাঁর পূর্ব থেকেই ভুল-বোঝাবুঝি। তিনি সেই কথা স্মরণ করে বোম্বাইয়ে জাহাজে উঠেই একটি খাকি হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন। তিন-চার দিন পরে সমুদ্র যখন শান্ত হল, তখন বিছানা ছেড়ে উঠে দাড়ি কামালেন, স্নান করলেন এবং ফর্সা জামাকাপড় পরে বাইরে এসে বসলেন। আর একজন, তাঁর নাম ডাঃ ভূপেন মুখোপাধ্যায়, 'গামা' নামে পরিচিত। তিনি সেতার বাজাতেন। মাঝে মাঝে ডেকে বাজনার আসর বসত। দু'জন বাঙালি মহিলা ছিলেন, তাঁরা কারু সঙ্গে মিশতেন না। তখন এটাই রীতি ছিল। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম রমা বসু। বিয়ে করে রমা চৌধুরী হয়েছিলেন। পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। আর একজনের নাম অরুণা বসু। বহুদিন কলকাতার একটি বড় মেয়ে-স্কুলে প্রিন্সিপাল ছিলেন।

বড় থামবার জায়গা হচ্ছে পোর্ট সৈয়দ। আগেকার লেখা অনেক ভ্রমণকাহিনীতে পোর্ট সৈয়দের দীর্ঘ বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে জাহাজ অনেকক্ষণ থামে। কখনও কখনও চব্বিশ ঘণ্টা। পুরনো ভ্রমণকাহিনীর বইয়ে পোর্ট সৈয়দ এবং সেখানকার বিখ্যাত দোকান Simon Artz-এর অনেক কথা পাওয়া যায়। এখনকার খবর জানিনা, তখন সবাই দোকানটির কথা জানত। জাহাজ যতক্ষণ দাঁড়াত Simon Artz-এর দোকানও ততক্ষণ খোলা থাকত। সমস্ত রাত্রিও। ইংরেজ আমলে কলকাতায় কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স ছিল। কিন্তু Simon Artz মনে হচ্ছে তখনকার আর্মি ও নেভি বা হোয়াইটওয়ে লেডল'র মতন বড়। অন্য সব জিনিস ছাড়া একটি ছোট পোস্ট অফিস ও একটি ছোট খাবার জায়গা ছিল। ভারতীয় ছাত্ররা যত চিঠি জাহাজে বসে লিখেছে সব ওখানে ডাকে দেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। পরের বছর দেশ থেকে ফিরতি

পথে আমাদের সঙ্গে প্রৌঢ় এক ব্যারিস্টার ভদ্রলোক ছিলেন। বেশ নামকরা ব্যারিস্টার। তাঁকে একটি কবিরাজি ওষুধ খেতে হত। দুধ সহযোগে সেব্য। তিনি দোকানে নেমে একগ্লাস দুধ দিয়ে ওষুধটি খেলেন। দুধের সঙ্গে দু'টুকরো ওয়েফার ছিল। সেটি তিনি পাশে-বসা বোম্বাইপ্রবাসী এক ভদ্রলোককে দিয়ে বললেন, আপনি এটা খেয়ে ফেলুন। তাইতে তিনি মর্মান্তিক চটে গেলেন। দোকানের সামনের রাস্তা খুব নিরাপদ ছিল না। সন্ধ্যার পর নানারকম অবাঞ্ছিত জনপ্রাণীর আবির্ভাব হত। পুলিশ তাদের খেদিয়ে নিয়ে বেড়াত। কিছু কিছু যাত্রী ঠকতে ভালবাসতেন। চকচকে জিনিসকে সোনা ভেবে কিনে ঠকেছেন এরকম যাত্রী প্রায় প্রত্যেক জাহাজেই যেত। যা হোক, পুরো একদিন থাকবার পর শেষরাত্রে আমাদের জাহাজ ছেড়েছিল মনে আছে। দিন পাঁচেক পরে আমরা নেপল্‌সে গিয়ে নামলাম। তাড়াতাড়ি এক চক্কর ঘুরে দেখা হল। পরদিন ইটালি থেকে প্রায় সমস্ত ইয়োরোপের ভিতর দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ডোভারে পৌঁছলাম। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি, তাহলেও গ্রীষ্ম একেবারে বিদায় নেয়নি। কয়েক বছর আগে 'হ্যাপি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হত। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের কাগজ নয়। গল্পগুলি সবই ছোট এবং মিলনান্তক। কী করে বড়লোকের ছেলের সঙ্গে টাইপিস্ট গরিব মেয়ের বিয়ে হল, এইরকম গল্পের ছড়াছড়ি। কাজেই একধরনের পাঠক-পাঠিকার কাছে পত্রিকাটির আদর ছিল। 'হ্যাপি' কাগজটিতে অক্সো আর বভ্রিল-এর বিজ্ঞাপন থাকত। একটা বিজ্ঞাপনে বড় করে লেখা থাকত, "হেনরি দি এইটথ হ্যাড সেভ্‌ন ওয়াইভ্‌স। ইয়োর সোল্‌ কম্ফর্ট ইজ অক্সো।" ছবিতে দেখা যেত রাস্তার ধারে সতেজ ষাঁড় কিংবা গরু দাঁড়িয়ে আছে, তার পিছনে ঘর-বাড়ি কিংবা খামার দেখা যাচ্ছে। মনে হত সুখ ও শান্তির স্বর্গ। লণ্ডন পর্যন্ত অর্ধেক রাস্তার বেশি এই দৃশ্য দেখতে দেখতে এলাম। লণ্ডনে পৌঁছবার আগে আকাশ ম্লান হয়ে এল। সেপ্টেম্বরের সূর্যের আলো বেশিক্ষণ থাকে না। স্টেশনে আমার একজন আত্মীয় নিতে এসেছিলেন। তাঁকে আমার বাড়ি ঠিক করার কথা জানানো হয়েছিল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। শুনলাম তখনকার মত সেখানেই স্থিতি।

অনেক দিন হল। কিন্তু সেই বাড়ির ঠিকানা মনে আছে। ৪ নম্বর মানস্টার রোড। ফুলহাম অঞ্চলে। এতদিন পরে ঠিকানা মনে থাকবার কারণ আছে। ছেলেবেলা থেকে অনেক বাঙালী পাঠকের ফুলহাম পাড়ার সঙ্গে পরিচয়। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্যলহরী সিরিজের বই যাঁরা সেই যুগে পড়েছেন, তাঁরা হয়তো মনে করতে পারবেন। একটি বই এইভাবে আরম্ভ : লণ্ডনের দক্ষিণে ফুলহাম পল্লী, সেখানে অনেক দস্যু-তস্করের বাস। আমি দস্যু-তস্কর চোখে দেখিনি, তবে গরিবপাড়া, তা দেখলেই বোঝা যেত। অনেক বাড়িতে স্নানের ঘর ছিল না। স্নান করা সেরকম দরকার বলে মনে করা হত না। যদি বা কখনও স্নানের দরকার হত পাড়ার পৌর প্রতিষ্ঠানের স্নানাগারে যেতে হত। আমার আত্মীয় বোধহয় খুব অসুবিধা বোধ করতেন না। কিন্তু দু'দিন পরে আমি পালাই পালাই করতে লাগলাম।

পরের দিন সকালে কলেজের বন্ধু অজিতনাথ রায় ও শিখরেশ চক্রবর্তী আমাকে নিয়ে বের হলেন লণ্ডন খানিকটা চিনিয়ে দিতে। তাছাড়া কিছু কাপড়চোপড় কিনবার দরকার ছিল। আরও কিছু অবশ্য কর্তব্য। কোথায় প্রথমে গিয়েছিলাম মনে নেই। বোধহয় স্ট্র্যাণ্ড দিয়ে গ্রে'জ ইন্ অঞ্চলে। রাস্তায় এক পশলা বৃষ্টি হল। আমরা একটা বাড়ির ধারে দাঁড়ালাম। অজিত বিজ্ঞের মতো মুখ করে বললেন, 'এদেশে বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না।' তারপর অল্ডউইচে ভারতীয় হাই কমিশনারের আপিসে গেলাম।

তখন ১১৪ নম্বর গাওয়ার স্ট্রিটে ভারতীয় ছাত্রদের একটি হস্টেল ছিল। ওয়াই· এম সি· এ· চালাতেন। মেম্বার হলে সেখানকার রেস্তরাঁয় সস্তায় ভারতীয় খাবার পাওয়া যেত। যেমন, ভাত, ডাল, মাছভাজা, মাংসের কারি, ভুনা গোস্ত, ভিণ্ডি দিয়ে রাঁধা মাংস, দু'এক রকম মিষ্টি। আর শনিবার দিন লাঞ্চে খিচুড়ি। খিচুড়ি আমরা বিশেষ পছন্দ করতাম। কী কারণে জানি না 'মেনু'তে খিচুড়িকে 'বেঙ্গল খিচুড়ি' বলা হত। খাবারের দাম খুব সস্তা। এক শিলিংয়ে খাওয়া যেত। কেবল খিচুড়ি খেলেই এক পেনি বেশি দিতে হত। সেখানে দোতলায় থাকবার ব্যবস্থা মনোরম না হলেও খারাপ ছিল না। কখনও কখনও চার্লস অ্যান্ড্রুজের মত লোকও এসে রাত কাটাতেন। ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে হলে এখানেই আসতে হত। এর খাবার ঘর আর রান্নার ঘর একতলায়, রাস্তার ধারে। ভারতীয় রান্নার গন্ধ রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ত। গল্প আছে, একজন ভারতীয় ছাত্র গাওয়ার স্ট্রিটে এসে পুলিশকে জিজ্ঞাসা করেছিল, '১১৪ নম্বর কোথায় পড়বে?' পুলিশ তাকে বলেছিল, 'এই ফুটপাথ দিয়ে সোজা হেঁটে যাও। ইউ ক্যান স্মেল ইট।'

রোজ বিকেলে স্নানের ভাবনা তো মিটল, এবং শনিবার সন্ধ্যার খাওয়া। কিছুদিন পরে খবর পেলাম গোল্ডার'স গ্রিন টিউব স্টেশনের কাছে পার্লে অ্যাভিনিউয়ে ঘর পাওয়া যাবে। শিখরেশ চক্রবর্তী ও আমি গিয়ে বাড়ি দেখলাম। ছোট বাড়ি, ছিমছাম, পরিষ্কার। আমাদের পছন্দ হল। শিখরেশ অবশ্য কয়েকদিন পরে কেমব্রিজে না কোথায় চলে যাবেন। শুধু আমি থাকব। একটি বড় শোবার ঘর ও একটি মাঝারি ঘর। পুরনো বাসিন্দা একজন ছিলেন। তিনি আই· সি· এস পরীক্ষা সদ্য পাস করেছেন। কয়েকদিন পরে দেশে ফিরবেন। নাম করলে সবাই চিনবে, এম· এস· রনধাওয়া।

অল্ডউইচে হাই কমিশনের আপিসে দেখা করতে হত। সেখানে দু'জন কর্মচারী ভারতীয় ছাত্রদের ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখতেন। সেখানে সম্মতি না পাওয়া গেলে ভর্তি হওয়া যেত না শুনেছিলাম। একজন লণ্ডনে আর একজন লণ্ডনের বাইরে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা পড়তে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। এঁদের সঙ্গে দেখা করে না গেলে কোথাও ভর্তি হওয়া যায় না। গ্যাসটার সাহেবের আপিসে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর আমাকে ডেকে পাঠানো হল। যা উপদেশ পেলাম তার অর্থ হচ্ছে, আমার ইতিহাস পড়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে আইন পড়া উচিত। তিনি কাগজপত্র দেখে আমাকে বোঝালেন, আমার রক্তে আইন আছে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তিনি

দেখলেন আমি কিছুতেই আমার মত পরিবর্তন করতে রাজি নই। তখন তিনি বিরক্ত হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করলেন। তাঁর সহকর্মী ন্যাসটারের কাছে যারা যেত, তাদের সংবর্ধনা কীরকম হত আমি জানি না। তখনকার বাঙালি ছেলেরা একটি ছড়া বানিয়েছিল তার প্রথম লাইনটি মনে আছে :

গ্যাস্টার ন্যাস্টার দুই ভাই।

পরের লাইনটি মনে নেই। তবে সন্দেহ হচ্ছে খুব rude।

পৌঁছেই দু'একদিন আমার কলেজ অর্থাৎ স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ (এখন তার নাম হয়েছে স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, সংক্ষেপে SOAS) দেখতে গিয়েছিলাম। মোরগেট, টেমসের কাছে। আগে এখান থেকে ভারতগামী জাহাজ ছাড়ত। সামনে একটি বড় পার্ক ফিনসবারি সার্কাস, চারদিকে বড় বড় আপিস। বড় বাড়ি মনে হত ওখানে মানাচ্ছে না। সে বাড়ি এখন নেই। তখনকার স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন রোসেটি। কবি রোসেটির বংশধর লোক। দু'একদিন পরে রোসেটিকে গিয়ে আমার ইণ্ডিয়া-হাউসের অভিজ্ঞতার কথা বললাম। রোসেটি শুধু বললেন, 'কালকে একুশ পাউণ্ড নিয়ে এসে স্কুলে ভর্তি হয়ে যাও, আর কিছু ভাববার দরকার নেই।' বাধা এল অধ্যাপক হেনরি ডডওয়েলের কাছ থেকে। পূর্বে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। তাঁর সম্পর্কে কিছু বিরূপ কথাবার্তা আগে থেকে শুনেছি। অধ্যাপক হেনরি ডডওয়েলকে দেখে আমার বৃদ্ধ বলে মনে হল না। প্রশস্ত ললাট এবং টাক। বেশভূষায় শৈথিল্য। আমাকে বললেন, 'বড়ই দুঃখের বিষয়, তোমাকে আমি নিতে পারছি না। তুমি অন্য কারু কাছে কাজ করো। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' আমি অবশ্য এরকম পরিস্থিতির কথা ভেবে আসিনি। পরে শুনেছিলাম ডঃ কলিন ডেভিস আমাকে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। যাই হোক, সেই মুহূর্তে আমার জিভে দুষ্ট সরস্বতী ভর করেছিল। আমি বললাম, 'আপনি নেবেন মনে করে এসেছি, তা যদি না হয় দেশে ফিরে যাব।' ডডওয়েল কীরকম থমকে গেলেন। তারপর কথাবার্তা বলে বললেন, 'অমুক দিন এসো, তারপর কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে।' সে দিন গেলাম। ঘরে অন্যান্য লোক ছিলেন। ডডওয়েল বললেন, 'তোমাকে নিতে পারছি না তার কারণ আমার যে নির্দিষ্ট সংখ্যা ছাত্র নেওয়ার কথা তা পূর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই আমি তো তোমাকে নিতে পারব না। তুমি অমুকের সঙ্গে কাজ করো।' বলে এক বিখ্যাত লোকের নাম করলেন। তিনি অধ্যাপক এল. ডি. বারনেট। তিনি বহু ভারতীয় ভাষা জানতেন। তবে আমার বিষয়ের লোক নন। ডঃ বারনেটের নাম শুনে আমি রাজি হয়ে গেলাম। ডডওয়েল একটু পরে যা বললেন সে খুব মজার। তিনি বললেন, 'বারনেট খুব ব্যস্ত লোক। ওঁর কাছে বেশি যাবার দরকার নেই। তুমি আসলে আমার কাছেই কাজ করবে।' রুটিন ঠিক হয়ে গেল। 'প্রথম বছর দু' সপ্তাহ পরে একদিন, দ্বিতীয় বছর সপ্তাহে একদিন, যখন তুমি থিসিস লিখতে আরম্ভ করেছ, আমার সঙ্গে দেখা কোরো।' ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করলাম, 'ডঃ বারনেটের সঙ্গে কখন দেখা করব?' ডডওয়েল বললেন, 'উনি খুব ব্যস্ত লোক। ধরো, মাসে দু'মাসে একবার।' তোমায় তো মারাঠি কাগজপত্র নিয়ে কাজ করতে হবে। তাতে তোমার অসুবিধা হলে

বারনেটের কাছে যেতে হবে।' ডডওয়েল আর একটি কথা বললেন, 'তুমি তো দেশে ফিরে গিয়ে পড়াবে। কাজেই আমার একটা 'কোর্স' শুনবে।' এইসব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবার পর যখন চলে আসছি, তখন ডডওয়েল আমাকে দরজা থেকে ডেকে পাঠালেন এবং একটি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ম্যালেরিয়া নেই তো?' ডডওয়েলের নিশ্চয় ধারণা ছিল সব ভারতীয় ছেলেরাই বিশেষত বাঙালিরা ম্যালেরিয়ায় ভোগে। ডডওয়েল নিজে কখনও বাংলাদেশে আসেননি। অনেক দিন মাদ্রাজে ছিলেন। আমাকে পরে বলেছিলেন যে, রাজপুতানার সঙ্গে খুব অল্প পরিচয়, তাছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও যাননি।

স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে ভর্তি হলাম। কিন্তু আমায় কাজ করতে হত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। তখন পড়বার ঘরে বেশি ভিড় হত না। বোধহয় আট-দশ জন। কখনও বৃদ্ধ ইংরেজ সিভিলিয়ান দু'একজনকে দেখা যেত। সে সময় ঘরে বড় ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলত। গরম রাখবার অন্য ব্যবস্থা ছিল না, কয়লার আগুন ছাড়া। আমরা টিউব থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা পার হয়ে শীত কাটাবার জন্য কিছুক্ষণ আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম। যেটা খুব ভাল লাগত সেটা এই যে, কাগজপত্র পড়বার কিংবা দেখবার কোনো বাধা ছিল না। ভারত সংক্রান্ত এত বই ও বাংলাভাষায় লেখা এত পুরনো বই ওখানে আছে বলে আমার কোনো ধারণা ছিল না। পরে বছর বছর পাঠকের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং আসনের সংখ্যাও। এখন তো ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাঠকদের সুবিধা বেড়েছে নিশ্চয়। কিন্তু পুরনো ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ঘরটির জন্য সব আগেকার ছাত্রদের স্মৃতির সৌরভ সহজে মিলিয়ে যাবে না।

একটু আগে বলেছি অধ্যাপক ডডওয়েলের আমাকে ছাত্র হিসাবে নিতে কিছু অসুবিধা ছিল। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে কাজ করতে করতে আবিষ্কার করলাম যে, একজন অধ্যাপক আমাকে নিতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর নাম ডঃ কলিন ডেভিস। তখন তাঁর আন্দাজ চল্লিশ বছর বয়স। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিক ছিলেন। পরে স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেছেন। তাঁর বই 'নর্থ ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স' কিছুদিন হল বেরিয়েছে। পরের বই 'ওয়ারেন হেস্টিংস অ্যাণ্ড আউধ' বোধহয় লেখা আরম্ভ হয়েছে। তিনি একাধিক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেন আমার সঙ্গে কাজ করবে না?' ছাত্রমহলে গুজব ছিল যে, অধ্যাপক ডডওয়েলের সঙ্গে ডঃ ডেভিসের ভাল বনত না। কাজেই উত্তর দেওয়া কঠিন হত। ডঃ কলিন ডেভিস পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৫৭/৫৮ সালে লণ্ডনে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি লণ্ডনে এসেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে পত্রব্যবহার হয়েছিল, কাজেই কেউ কাউকে ভুলিনি। অনুষ্ঠানের সময় প্রথমে তাঁকে দেখতে পেলাম না। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তখন স্কুলের ডিরেক্টর আমার এক সময়কার সহপাঠী অধ্যাপক সিরিল ফিলিপসকে বললাম, ডঃ ডেভিস বোধহয় আসেননি। ফিলিপস বললেন, 'সেকি, ডেভিস তো তোমার

সম্বন্ধেও একথা বলছে।" একটু পরে ডেভিসের সঙ্গে দেখা হল। কুড়ি বছরের অদর্শন। দু'জনের চেহারাই বেশ বদলে গিয়েছে। চিনতে পারবার কথা নয়।

এই রকম মাস তিনেক কেটে গেল। পার্লে অ্যাভিনিউয়ের বাড়ি খালি হয়ে গেল। রনধাওয়া দেশে ফিরে গেলেন। শিখরেশ চক্রবর্তী এডিনবরা চলে গেলেন। ইতিমধ্যে এক বিপদ হল। পার্লে অ্যাভিনিউয়ের বাড়ির কর্ত্রী জানালেন তিনি আর-একটু দূরে হেনডন সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে চলে যাচ্ছেন। হেনডন সেন্ট্রাল স্টেশন আমি কখনও দেখিনি, কাজেই তার সপক্ষে বা বিপক্ষে আমার কিছু বলার ছিল না। আমি প্রথমে যেতে রাজি হলাম না। দু'মাস আমি এবং আরও তিনজন গোল্ডার্স গ্রীনের এক বাড়িতে কৃচ্ছ্রসাধন করলাম। তখন খুব শীত। সে বাড়ি গরম করবার ভাল ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া এত খারাপ খাবার দিত যে, মাংস কোথা থেকে আনা হয়, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে গবেষণা চলত। শেষে একদিন অসহ্য হওয়াতে আমরা সবাই একসঙ্গে বাড়ি ছেড়ে দিলাম। পুনর্মূষিক হয়ে আগেকার ল্যাণ্ডলেডির হেনডন সেন্ট্রালের বাড়িতে ফিরে গেলাম। একতলায় একটা ঘর খালি ছিল। একতলা বটে, কিন্তু আমি বাড়ি থাকলে সমস্ত সময় কয়লার আগুন জ্বলত। আমি রোজ স্নান করব শুনে বেশিরভাগ ল্যাণ্ডলেডি ভয় পেয়ে যেত। এখানে কিন্তু এরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সব সুবিধা তো পাওয়া যায় না। ব্রেকফাস্ট খারাপ দিত না। রবিবার বিকালে বাড়ি থাকলে চায়ের ব্যবস্থা ভাল ছিল। কিন্তু সাধারণত খাবারের পরিমাণ এত কম যে ক্ষীণক্ষুধা লোকের পক্ষেও যথেষ্ট হত না।

এইভাবে হেনডনে আমার ন'মাসের বেশি কেটে গেল। আগেই বলেছি, যাকে সোর্স মেটেরিয়েল বলে, তার কিছু অংশ দেশে থাকতেই দেখা ছিল। মাসে দু'তিন দিন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যেতাম। তাছাড়া বেশিরভাগ কাজই হত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। ইণ্ডিয়া অফিসে ঢুকবার সময় বাঁ দিকে সেন্ট জেমস পার্কে জল চোখে পড়ত। গ্রীষ্মের সময় মনে হত একটু ফাঁকি দিয়ে সেন্ট জেমস পার্ক ঘুরে আসি। কষ্ট করে সেই প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখতাম। ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও কখনও কখনও গিয়েছি। আমার কাজের জন্যও বটে, এবং মনে হত বারনেট সাহেবকে মুখ চিনিয়ে রাখা দরকার। দেখে মনে হয়েছিল অধ্যাপক বারনেট ভুলো মনের লোক। ভাইবার সময় যদি চিনতে না পারেন, এবং বলেন, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে! তিনি তখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একতলায় বসতেন। তাঁর দু'জন সহকারীকে ডিঙিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছতে হত। এইটাই একটু কঠিন, বাকিটা সরল। দুপুরে লাঞ্চের পরে যখন অধ্যাপকের কাছে যেতাম তখন তাঁর মেজাজ খুব ভাল থাকত। লেখাপড়ার কথা বেশি খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন না। খুব সস্নেহ ব্যবহার। দুটি একটি প্রশ্ন সব সময় করতেন। 'শরীর কেমন আছে ?' 'ঠাণ্ডা লাগানো উচিত হবে না,' এবং 'মন দিয়ে লেখাপড়া করবে।' বলেই বলতেন, 'নিশ্চয় জানি তুমি করছ।' ডঃ বারনেট সবসময় লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মনে হয় আমরা কেউ গেলে কাজে বাধা হত। কিন্তু না গিয়েও উপায় ছিল না। আমরা সবাই আমাদের 'কপিবুক' পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা করতাম।

আট মাসের পর আমার থিসিসের প্রথম পরিচ্ছেদ লিখতে আরম্ভ করলাম। লাইব্রেরিতে লিখতাম। গরমের সময় শনি-রবিবার হেনডন সেন্ট্রালের বাড়িতে বাগানে গাছের তলায় টেবিল পেতে কাজ করতাম। ভাল জায়গা। আপেল গাছে থোকা থোকা ফুল এসেছে। অল্প কিছুদিন পরে সমস্ত গাছ জুড়ে ফল দেখা দিল। আমি গাছের তলায় বসে কয়েক হাজার মাইল দূরে এবং দেড়'শো বছর আগেকার পেশোয়ার সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লড়াইয়ের কথা লিখবার চেষ্টা করছি। শনিবার রবিবার দু'দিন পুরোপুরি লিখবার সময় পাওয়া যেত। অন্যান্য দিন বেশিক্ষণ লিখতে হলে রাত্রি জাগরণ ছাড়া উপায় ছিল না। তাতে আমার আপত্তি ছিল না। শনি-রবিবার দুপুরে একটা অবধি কাজ করে পাড়ার দোকানে যেমন এ· বি· সি·, লায়ন্স কিংবা এক্সপ্রেস ডেয়ারিতে লাঞ্চ খেতে যেতাম। মাছভাজা অথবা সসেজ, আলুভাজা এবং ডাক্তারের কথামতো এক গ্লাস দুধ সামান্য কফি দিয়ে আমার লাঞ্চ খাওয়া হয়ে যেত। এসব সস্তার জায়গা। সব মিলিয়ে আমার এক শিলিংয়েরও কম পড়ত। বার্নার্ড শ যৌবন বয়সের কথা লিখতে গিয়ে খাবার খরচের হিসাব দিয়েছেন। তিনি আরও কম পয়সায় লাঞ্চ সারতেন। সেই সুখের দিনে আমরা জন্মাইনি।

হেনডনের বাড়িতে থাকবার সময় কলকাতা থেকে অনেকে এসেছিলেন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত দার্শনিক সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। তিনি প্রথম দিন আমার বাড়িতেই ছিলেন। পরে রাসেল স্কোয়ারের কাছে চলে যান। এই সঙ্গে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রও এসেছিলেন। তিনি রাসেল স্কোয়ারের উপরে একটি হোটেলে থাকতেন। আইনজ্ঞ ডঃ রাধাবিনোদ পাল একবার ঐ হোটেলে এসে উঠেছিলেন। ছুটির দিনে বিকালে হেনডনের বাড়িতে কখনও কখনও বন্ধুসমাবেশ হত এবং আমার ল্যাণ্ডলেডি তাদের চা খাওয়াতে কার্পণ্য করতেন না। বেশিরভাগই আসতেন নীহাররঞ্জন রায়, স্নেহাংশু আচার্য, শিখরেশ চক্রবর্তী, অজিতনাথ রায় ও আমার আত্মীয় দিলীপ সেনগুপ্ত। দিলীপকে 'যিশু' বলে সবাই চিনত। আমি যখন বাড়ি থাকতাম না তখন তারা এলে একটু বিপদের সম্ভাবনা ছিল। একদিন দেরিতে ফিরে দেখলাম অজিতনাথ রায় ও স্নেহাংশু আচার্য আমার সুটকেশ খুলে সাবান, শাল এবং আরও যা তাদের পছন্দ হয়েছে, ল্যাণ্ডলেডির পরিবারের মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। সেই সব জিনিস ফিরে পেতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল।

এখন লণ্ডনে অনেক বাঙালি ছাত্রী দেখা যায়; প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তাঁদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। আমাদের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে একজন মেয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর নাম তখন ছিল ফুলরেণু দত্ত, পরে ফুলরেণু গুহ হয়েছিলেন। এখন খুব বিখ্যাত হয়েছেন। কিছুদিনের জন্য মন্ত্রীও হয়েছিলেন। কিন্তু তখন এত সাহসিকা ছিলেন না। শনিবার বিকালে আমাদের দলের সঙ্গে তিনি গাওয়ার স্ট্রিটে যেতেন। ফিরবার সময় মুশকিল হত। তিনি থাকতেন বেলসাইজ পার্কে, বাড়ি যেতে রাস্তায় একটি পাব পড়ত। এখনকার কথা বলব না, তখন মাতালের ভয় বাঙালি মেয়েদের মজ্জাগত ছিল। ফুলরেণু কখনও সেই পাবের সামনে একা রাস্তা পার হতে পারতেন না। পালা করে

একটি ছেলে ট্রেন থেকে নেমে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসত।

পুরোপুরি গ্রীষ্মকাল এসে গেল। তখন প্রায় মাস তিনেকের জন্য ছুটি। ইংলণ্ড তখন দেখতে খুব সুন্দর হয়। কিন্তু আমি মনে করলাম ছুটির সময় দেশে ঘুরে আসি। একটা কারণ সস্তায় যাওয়া-আসার সুবিধা পাওয়া যেত। দেখলাম মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও আমার দু'একজন চেনা মুখও আছে। যেমন, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিমা দেবী, নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং ধীরেন্দ্রমোহন সেন। একটু ক্ষীণ ইচ্ছা ছিল যে দেশে এসে দু'একটা জিনিস আমার মাস্টারমশায় সুরেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে আলোচনা করব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সব কিছুই হল না। যেরকম এসেছিলাম সেরকমই ফিরে গেলাম আবার আর একটি ইটালিয়ান জাহাজে চেপে। সেবারেও মোহনলালের সঙ্গে। আর দেবীপ্রসাদ সিংহ ছিলেন। যিনি পরে বেশির ভাগ কর্মজীবন শ্রীলঙ্কায় কাটিয়েছেন, পরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ও ডিন হয়েছিলেন। ফিরবার সময় জাহাজে খবর পেলাম ইটালির সঙ্গে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে একজন নামকরা ব্যারিস্টার ছিলেন। তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাঙালি ছেলেরা কয়েকজন বলতে লাগল, লক্ষণ ভাল নয়। কয়েকটি আবিসিনিয়ান সাবমেরিন এই জাহাজের চারিধারে ঘোরাফেরা করছে। বাঙালি ছাত্র না হলে আবিসিনিয়ান সাবমেরিন কথাটা কারুর মাথা থেকে বের হত না। এর ফলে কিনা জানি না, একটি জিনিস প্রত্যক্ষ করলাম। ব্যারিস্টার ভদ্রলোকটি আমাদের গন্তব্য ভেনিস অবধি না গিয়ে বৃন্দিসি পৌঁছনো মাত্র একটি ফিটন ডাকিয়ে সমস্ত মালপত্র তাতে তুলে দিয়ে রেলপথে লণ্ডন রওনা হলেন। পরের কয়েক ঘন্টার জন্য ইটালিয়ান জাহাজে থাকতে তিনি রাজি হলেন না।

লণ্ডনে যখন পৌঁছলাম তখন সেখানে শরৎকাল শেষ হয়ে এসেছে। আকাশে আসন্ন শীতের ছায়া। বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। সকালে বিকালে আকাশে মেঘ। মাঝে মাঝে সূর্য ক্ষীণপ্রভায় দেখা দিচ্ছে। ছুটির সময় আমার শূন্যঘরে একটি অতিথির সমাগম হয়েছিল। আমার গৃহকর্ত্রীর মতে তাঁর নাম স্যাণ্ডি। অক্সফোর্ডে ইতিহাসের ছাত্র। আমি প্রথমে তাঁকে অ-ভারতীয় অনুমান করেছিলাম। বছর দুই পরে তাঁর সঙ্গে হঠাৎ আমার আলাপ হল। তখন দেখলাম স্যাণ্ডি ভারতীয় তো বটেই, তার উপর ব্রাহ্মণ বংশজাত। তাঁর প্রকৃত নাম শাণ্ডিল্য। অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জামাই। এখন বেঁচে নেই। কটকে অল্প বয়সে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে আমাদের প্রথম দেখা হল। আর একবার বোম্বাইয়ে খুব বৃষ্টির মধ্যে ট্রেনের কামরায় জলবন্দী অবস্থায় তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল। শাণ্ডিল্য বেঁচে থাকলে ভারতীয় ইতিহাসকারদের মধ্যে হয়তো প্রথম শ্রেণীর হতেন। আমি অলস লোক। যেখানে যথেষ্ট গরম জল ও ঘর গরম রাখবার ব্যবস্থা থাকে, সে-বাড়ি আমি ছাড়তে চাই না। এ বাড়িতে দুই-ই ছিল। তবু থাকা সম্ভব হল না। বাড়িতে অনেকগুলি ঘর ছিল। আমার গৃহকর্ত্রী বহু ছাত্রকে এইখানে স্থান দেবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তাঁকে কোনো দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই তাঁর জীবিকা। কিন্তু ছাত্ররা যারা আসত তারা সবাই

যে অধ্যয়নকে তপস্যা বলে মনে করত তা নয়।

প্রথমবার যখন লণ্ডনে যাই ১৯৩৪ সালের শেষের দিকে, প্রায় এই সময় রঙ্গলাল সেন নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হল আরও পরে। যখন আমার বই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ছাপা হল, রঙ্গলাল সেন তখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের কলকাতা শাখার ম্যানেজার হয়েছিলেন। ১৯৫৭/১৯৫৮ সালে আবার তিনি আপিসের কাজে লণ্ডনে ছিলেন। পিকাডেলি সার্কাসের কাছে থাকতেন। আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁরা বলবেন প্রকাশন সম্বন্ধে এরকম জ্ঞানসম্পন্ন লোক বহুদিন হয়নি। তিনি একমাত্র এই বিষয়েই কথা বলতে ভালবাসতেন। বইয়ের ছাপা, বাঁধাই, কাগজের গুণাগুণ এবং কোনো কোনো লেখক সম্বন্ধেও। ইংরেজি বই ছাপার কাজ সম্বন্ধে কোনো সমস্যা উপস্থিত হলে সমাধানের জন্য রঙ্গলাল সেনের কাছে যেতে হত। তখন লালবাজারের উল্টোদিকে মার্কেন্টাইল বিল্ডিংয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের আপিস ছিল। সেখানে অনেক অপরাহ্ন আনন্দে কাটিয়েছি। কাজ থেকে অবসর নেবার পর তিনি দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন। সেই কষ্ট প্রায় অকাতরে বহন করেছেন। তখনও নতুন বই ও ছাপার কথা উঠলে অসুস্থতার কথা ভুলে যেতেন। একটু ভাল থাকলে কখনও বিকালের দিকে হরিশ পার্কের উত্তরদিকে দোতলার সরু বারান্দায় এসে বসতেন। এখনও মাঝে মাঝে যখন ওদিকে যাই তখন শূন্য বারান্দা চোখে পড়ে।

তখন আমার লেখার কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদ যখন অধ্যাপক ডডওয়েলকে দেখতে দিয়েছিলাম তখন আমতা আমতা করে বলেছিলাম, আমি ভাল ইংরেজি লিখতে পারি না, আমার অভ্যাস নেই। একটুও বাড়িয়ে বলিনি। ডডওয়েল কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে বললেন, 'I have seen worse'। তিনি লেখার চেয়ে হাতের লেখার উপর বেশি মন্তব্য করলেন। তারপর থেকে তাঁকে টাইপ করে কাজ দেখাতে লাগলাম। খরচ বাড়ল। ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এমন সময় মনে হল এ বাড়িতে আর থাকব না। এখন বিদেশে ছাত্রছাত্রীরা অনেকে নিজেরা রান্না করে খায়। আমাদের সময় ছেলেদের সে অভ্যাস বড় থাকত না। তাছাড়া বাড়িতে পছন্দও করত না। তখনকার ক্যামডেন টাউনের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, চকফার্ম, বেলসাইজ পার্কেও চলনসই থাকবার জায়গা পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এ সব জায়গার নবজন্ম হয়েছে। তখন বেশিরভাগ ল্যাণ্ডলেডিকে দেখে মনে হত যেন চার্লস ডিকেন্সের বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে। ঘরের দেয়ালে ওয়ালপেপার খুলে খুলে পড়ছে। হাতমুখ ধোবার ব্যবস্থা ভাল নয়। নোংরা পরিবেশ। চকফার্মে যে সব জায়গায় ঘর পাওয়া যেত, সেখানে সমস্তক্ষণ ট্রেনের আসা যাওয়ার শব্দ। প্রায় মিনিটে মিনিটে ট্রেন আসছে আর বাড়ি কাঁপছে।

বাড়ি খুঁজে খুঁজে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি, এমন সময় হায়দরাবাদের একটি

রঙ্গলাল সেনের বাড়ি

ছাত্র বলল, কলিনডেল স্টেশনের কাছে নতুন পাড়া গড়ে উঠছে। সেখানে ঘর পাওয়া সম্ভব। সে একটি ঠিকানাও দিয়েছিল। কলিনডেল হল হেনডন ছাড়িয়ে আরও কিছু উত্তরে। জায়গার নাম আমার কাছে অপরিচিত ছিল না। এখানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একটি অংশ আছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পত্রিকার সংগ্রহ এবং খবরের কাগজ এখানে রাখা হয়। কাজেই কখনও কখনও আসতে হয়েছে। কিন্তু থাকবার কথা কখনও ভাবিনি। যা হোক, রবিবার সকালে কলিনডেল স্টেশনে নেমে সেই বাড়ির উদ্দেশে গেলাম। গৃহকর্ত্রী আমার অবস্থা বুঝে একটু হেসে বললেন, 'কালকেই তো একজন ভারতীয় ছাত্র এসে গিয়েছে। তুমি কি তাকে চেনো ?' আমি শুষ্কমুখে ধন্যবাদ দিয়ে বড় রাস্তায় এসে উঠলাম। একটু পরে দেখলাম এক মহিলা আসছেন। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, সঙ্গে সেই রকম লম্বা-চওড়া চেহারার কুকুর। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি কোনো ভারতীয় ছাত্রাবাসের খোঁজ জানি যেখানে ছাত্ররা থাকবার জায়গার খোঁজ করতে আসে ? আমার মনে হল এই মহিলাকে ভগবান প্রেরণ করেছেন। গাওয়ার স্ট্রিটে যেতে অনেক সময় লাগবে। আমি তাঁকে বললাম ইচ্ছা করলে তিনি এখনই একজনকে ঘর ভাড়া দিতে পারেন। আমি বাড়ি দেখতে গেলাম। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বাড়িটি অনেক ভাল। একেবারে নতুন, সঙ্গে বড় বাগান। অনেক ফুলের গাছ, দু'একটি ফলের গাছও আছে। তবে কলিনডেলে বাড়ির ভাড়া একটু বেশি মনে হল। দরাদরি হবে ভেবেই বোধহয় বেশি করে বলেছিলেন। আমি আপত্তি না করে রাজি হয়ে গেলাম। উপরে দুটি ঘর, যে-কোনো একটি আমি পেতে পারি। পাছে অন্য কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তি এসে দখল করে নেয়, এই ভয়ে দুটি ঘরই দখল করলাম। এ বাড়িতে আর একটি সুবিধা ছিল। তখন তো আমার থিসিস মাজাঘষা এবং টাইপ করা চলছে। সকাল থেকে বেলা বারোটা অবধি সেই কাজ করতাম। আমার বাড়ির কর্ত্রী ও গৃহস্বামীও দুপুরের পর লাঞ্চ খেয়ে কাজে যেতেন। ফিরতে রাত দশটা হত। আমার এ ব্যবস্থায় খুব সুবিধা। বাড়িতে কাজ করে অপরাহ্নে ইণ্ডিয়া অফিস কিংবা কখনও স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ এবং রাত্রে প্রায় শেষ টিউবে বাড়ি ফেরা। গ্রীষ্মে সন্ধ্যার অন্ধকার অনেক পরে হয়। ছটার পরে লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে গেলে পকেটে পয়সা থাকলে কখনও থিয়েটারে গিয়েছি। কাছাকাছি সিনেমায় যেতে হলে হয় হেনডন সেন্ট্রাল নয় গোলডার্স গ্রিনে যেতে হত। কলিনডেলে একটি ছবিঘর ছিল, শ্রীহীন এবং প্রায়ই পুরনো ছবি দেখানো হত। মনে আছে টিকিটের দাম অনেক জায়গার চেয়ে সস্তা। আমরা বলতাম দুপুরে এক শিলিংয়ের বেশি পয়সার টিকিট কিনলে ম্যানেজার নিজে এসে সিটে বসিয়ে দিয়ে যেত। একবার অজিতনাথ রায় আর স্নেহাংশু আচার্য আমার পল্লীবাস দেখতে এসেছিলেন। আমার গৃহস্বামিনী বিয়ের পর সদ্য সংসার পেতেছিলেন। বিয়েতে অনেক সাবান, প্রসাধনের সামগ্রী ইত্যাদি উপহার পেয়েছিলেন। স্নেহাংশু বাথরুমে গিয়ে ভাল সাবান চেয়ে গায়ে মাখলেন, বাথ সল্ট অনেক ঢেলে স্নান করলেন। আমার ভয় হতে লাগল পরদিনই আমায় বাড়ি ছাড়তে হবে। যা হোক, সে সব কিছু হয়নি। গ্রীষ্ম ও শরৎকাল সেই বাড়িতে কাটালাম, বাগানের

স্ট্রবেরি খেলাম। তবে কুকুর দুটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হল না।

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল বছরের দুটি নির্দিষ্ট তারিখে থিসিস দাখিল করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস কোন্ দোকানে বাঁধাই করতে হবে, নিয়মাবলীতে তাও লেখা থাকত। তখনও লণ্ডনে বেশ গরম। নিউমোনিয়ার ভয় না থাকলে দুপুরে কয়েক ঘন্টা সিল্কের সুট পরলে ভাল লাগে এমন গরম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এই রকম গরমের সময় অনেক শার্ট কিংবা বুশশার্ট পরা লোক রাস্তায় দেখা যায়। কিন্তু তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যেত না, তখন এ সব কল্পনা করা যেত না। একবার, বোধহয় ১৯৩৫ সাল। লণ্ডনে তখন খুব গরম। এক ভদ্রলোক শার্ট গায়ে একটি ছোট চায়ের দোকানে ঢুকেছিলেন। কোট তাঁর গায়ে ছিল না, কিন্তু তাঁর কাঁধের উপর ছিল। সেই দোকানের একটি ওয়েট্রেস তাঁকে চা পরিবেশন করেনি কারণ তাঁর পোশাকের ত্রুটি ছিল। বিকালের কাগজে এই খবর ফলাও করে ছাপা হল। অনেক কাগজের বক্তব্য মেয়েটি ঠিক কাজ করেছে। চা দিলেই অন্যায় হত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সে যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেল।

যা হোক, এই রকম এক গরমের দিনে রাসেল স্কোয়ারের কাছে এক দপ্তরির দোকানে আমার থিসিস বাঁধাই করতে দিয়ে দুপুরের পর কলিনডেল ফিরে আসছি। লেখা, টাইপ কপি সংশোধন সব কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহপাঠী বলেছিলেন, অধ্যাপক ডডওয়েল যদি মনে করেন তুমি থিসিস দিতে পারো, তাহলে অবশ্যই তুমি স্টিমারে বাড়ি ফিরবার টিকিট কিনতে পারো। না হলে কিছুরই বিশ্বাস নেই। যা হোক, মন প্রফুল্ল ছিল। গুজ স্ট্রিটে এসে কলিনডেল যাব বলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় একটি ব্যাপার হল। তখন তার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারিনি।

আমি যখন প্ল্যাটফর্মে নামার জন্য লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন চোখে পড়ল আমার সামনে দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। একজন মধ্যবয়স্ক ভারতীয়, আর একজন সুপুরুষ ইংরেজ সিল্কের স্যুট পরা। দেখে মনে হল ভদ্রলোকে খুব সম্ভব কিছুদিন ভারতবর্ষে কাটিয়ে গেছেন। মন যে খুব প্রসন্ন হল বলতে পারি না। এখন যেমন ইংলণ্ডের শহরে দাঙ্গা এবং লুঠতরাজ লেগে আছে, সে সময় সেটা কল্পনা করা যেত না। দুই রকম ইংরেজকে আমরা দেখতাম। এক ধরনের ইংরেজ আমাদের অবজ্ঞা করে চলত, প্রকাশ্যে নয়, কিন্তু সেই অবজ্ঞা আমাদের বুঝতে দেরি হত না। আর এক ধরনের ইংরেজ ছিলেন যাঁরা আমাদের সঙ্গে মিষ্টভাষী হবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁদের ব্যবহারে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠত যে, England's work in Indiaয় কীরকম সুফল হয়েছে বিশ্ববাসীরা দেখে যাক। এর বাইরে একটি দল ছিলেন যাঁরা যথার্থই ভদ্রলোক, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। ইংরেজ ভদ্রলোকটি আমাকে দেখে মৃদু হাস্যকরে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই ছাত্র, কোথায় পড়ো ?' আমি খুশি হলাম না। মনে মনে ভাবলাম, এই সেরেছে, এখনই ইংরেজ শাসনের সুফল কীর্তন করবেন। আমি একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে ট্রেন এল। ইংরেজ ভদ্রলোক ও তাঁর ভারতীয় সঙ্গী সামনের কামরায় উঠলেন। আমি সেটিতে না উঠে পাশের

কামরায় গিয়ে উঠলাম যাতে তাঁর সঙ্গে কথা না বলতে হয়। এই ঘটনা এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু এর একটি উপসংহার আছে, সেটি বলছি।

ছ'মাস পরে অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ দিকে দেশে ফিরে এলাম। আরও দু'বছর আড়াই বছর পরে আমার থিসিস্ বিদেশে ছাপা হয়ে বেরোল। এর কিছুদিন পরে আমার এক আত্মীয় এসে বললেন, "মেকিং অব দি ইণ্ডিয়ান প্রিনসেস' নামে নতুন বই বেরিয়েছে, পড়েছিস? তাতে দেখলাম তোর বই সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।' 'মেকিং অব দি ইণ্ডিয়ান প্রিনসেস'-এর লেখক এডওয়ার্ড টমসন। এডওয়ার্ড টমসনের নাম বাংলা দেশে একসময় খুব পরিচিত ছিল। 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর' বলে একটি বই লেখেন, খুব নিন্দিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও নিজে তাঁর বিরুদ্ধে বেনামীতে কলম ধরেছিলেন। টমসন সাহেবের বাংলা জ্ঞানে নিশ্চয় ত্রুটি ছিল, কিন্তু রসবোধ কম ছিল না। আমার মনে হয় যে-নিন্দা তাঁর প্রাপ্য তার চাইতে অনেক বেশিই তিনি পেয়েছিলেন।

একটি প্রচলিত মারাঠি কবিতা আছে যে, গঙ্গাধর শাস্ত্রীর মৃত্যুর জন্য পেশোয়ার সর্বনাশ হল। এই গঙ্গাধর শাস্ত্রী ছিলেন শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওয়ের প্রধান উপদেষ্টা। ইংরেজদের ধারণা, পেশোয়ার এক অনুচর তাঁকে লোক দিয়ে খুন করিয়েছিলেন।

পেশোয়া অনেক দিন পর্যন্ত একথা স্বীকার করেননি। প্রমাণেরও কিছু অস্পষ্টতা ছিল। একটি জনরব ছিল এই ঘটনা নিয়ে, একটি ভৌতিক কাহিনীও কিছুদিন শোনা গিয়েছিল। এই প্রমাণ একজন ডিটেকটিভ যেভাবে ব্যবহার করতে পারতেন, আমিও অনেকটা সেভাবে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছিলাম। টমসন সাহেব তাঁর গ্রন্থে ভৌতিক কাহিনীর উল্লেখ করেছেন, অনেক রসিকতাও করেছেন। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার চিঠিপত্রের সূত্রপাত। এই চিঠিপত্র প্রায় তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত চলেছিল। কিন্তু আমাদের কখনও দেখা হয়নি। বোধহয় ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু তখনও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি পাইনি, কাজেই নিমন্ত্রিতদের ফর্দে আমি ছিলাম না। এর বছর দেড়েক পরে মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই ইন্দ্রায়ণী নদীর ধারে তাঁর বাড়িতে একটি উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। গ্রামটি বোম্বাই ও পুনার মাঝামাঝি। আমরা কেউ কেউ বোম্বাই থেকে যাওয়া-আসা করতাম। যদুনাথ সরকার সরদেশাইয়ের পুরনো বন্ধু, তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলেন। যাঁরা মহারাষ্ট্রের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেছেন, তাঁরা অনেকেই এসেছিলেন। শুনেছিলাম এডওয়ার্ড টমসনও আসবেন, কিন্তু আসেননি। আমরা চিঠিতে ক্রমাগত দুঃখ প্রকাশ করেছি যে, আমাদের কখনও দেখা হল না। কিছুদিন পরে টমসন সাহেবের মৃত্যু হল, কাগজে তাঁর ছবি দেখলাম। ছবিটি দেখে চেনা-চেনা মনে হতে লাগল। হঠাৎ বুঝতে পারলাম ইনিই সেই ভদ্রলোক, ১৯৩৬ সালে লণ্ডনের গুজ স্ট্রিট স্টেশনে কয়েক মিনিটের জন্য যাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বিধাতা কখনও কখনও পরিহাস করে থাকেন।

আর একটি বিস্ময়কর ঘটনার কথা বলছি। এও প্রবাসে, বাইশ বছর পরে,

১৯৫৭/৫৮ সাল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বাড়ি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আরম্ভ হয়েছিল রাসেল স্কোয়ারের ধারে। এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। আমার পুরনো কলেজ স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, নাম বদলিয়ে, এখন (সংক্ষেপে হচ্ছে SOAS) স্থান পরিবর্তন করেছে। নতুন বাড়ি হয়েছে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গা ঘেঁষে। স্কুলের নামও সামান্য বদল হয়ে ওরিয়েন্টাল শব্দের পরে 'আফ্রিকান' কথাটি যুক্ত হয়েছে। পুরনো অধ্যাপকরা অনেকে নেই। সহপাঠীদের মধ্যে কয়েকজন অধ্যাপক হয়েছেন। আমার ছাত্রপ্রতিম একজন ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় সেখানে বাংলা ও ভাষাবিদ্যা পড়ান, স্ত্রী এমা মুখোপাধ্যায় হাসপাতালে ক্যানসারের ডাক্তারি করেন, বাড়িতে অন্য প্রাণী তাঁদের ছোট মেয়ে মিমি, এক বছরও বয়স হয়নি। বহু শনিবার তাঁদের লাডব্রোক রোডের বাড়ি গিয়েছি। কখনও কখনও দেখেছি তারাপদ বাজার করতে গিয়েছেন। তার গৃহিণী এমা হাসপাতালের কাজ শেষ করে তখনও বাড়ি ফেরেননি। একটি ইংরেজ মেয়ে বাড়ি আগলাচ্ছে। যথাসময় মিমিকে চান করিয়ে দিচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, ঘুম পাড়াচ্ছে। এমা ফিরলে তাকে রান্নায় সাহায্য করছে। রাত হবার আগে মুরগির ঝোল-ভাত খেয়ে বাড়ি ফিরছে। পাড়ায় অনেক বড় বাড়ি ছিল। এক সময় বড়লোক পাড়া ছিল। অনেকদিনের ধনী গরিব হয়ে যেতে ধীরে ধীরে তার যে অবস্থা হয় সেই রকম। পাড়াটা অনেকদিক থেকেই ভাল নয়। দিনের বেলা কিছু বোঝা যেত না। কিন্তু সন্ধ্যার পর রাস্তার চেহারা বদলে যেত। টিউব স্টেশন তারাপদর বাড়ি থেকে সাত-আট মিনিটের রাস্তা। যেদিন বাড়ি ফিরতে অন্ধকার হয়ে যেত, সেদিন মেয়েটিকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসতে হত। ইংরেজ-দুহিতার এত ভয় দেখে প্রথম প্রথম আশ্চর্য মনে হত, কিন্তু একদিন আমার বাড়ি যেতে দেরি হয়েছিল, সেদিন ব্যাপার বুঝতে পেরেছিলাম।

দেখতাম তারাপদ খুব সুখে আছে। বাড়িতে মিমিকে দেখবার লোক, রান্নার সহকারিণী ও স্ত্রীর সখী—একসঙ্গে কোথায় পাওয়া যাবে? তারাপদ যে কখনও কখনও স্ত্রীর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করত সে কেবল ছলনা, আমাদের দেখাবার জন্য। তারাপদর দুঃখের একটি কারণ ছিল—ভাল ফ্ল্যাট পাওয়া যাচ্ছিল না। বাচ্চা ছেলেমেয়ে থাকলে ওদেশে ফ্ল্যাট পাওয়া কঠিন।

এক রবিবার দুপুরে তারাপদ আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। ফ্ল্যাট দেখতে যাওয়া হবে। শীত পড়ে আসছে। রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল বেশ ঠাণ্ডা। যেরকম শীত সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশি। তারাপদ অনর্গল বাড়িওয়ালা ও এজেন্টদের পাষাণহৃদয় ও ফ্ল্যাট পাবার অসুবিধার কথা বলছে। আমি ঠিক মন দিতে পারছি না। আমার নানাসাহেবের উপর নতুন বই লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে। সেটি টাইপ করে প্রকাশকের কাছে পাঠানো দরকার। তখন এসব কাজ সাধারণত SOAS এর সেক্রেটারিরা করে দিতেন। তারাপদ আশা দিয়েছিল, তাঁদের একজন আমার পাণ্ডুলিপি টাইপ করে দেবেন। কয়েকজন সুন্দর টাইপ করতেন এবং প্রেস কপি এত ভাল তৈরি করতে পারতেন যে, এঁদের হাতে কাজ দিলে নিশ্চিন্ত থাকা যেত। তারাপদ যাঁর কথা বলেছিল, তাঁর নাম মনে আছে। বাঙালি ছেলেরা আড়ালে নামকে অনুবাদ করে 'দেবদূতী' বলত।

তাঁর হাতেই সম্পত্তি সম্পর্ণ করব ঠিক ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন অধ্যাপক, তাঁর খুব তাড়া ছিল বলে 'দেবদূতীর' কাছে আরজি পেশ করলেন। আমি আপত্তি করলাম না বটে, কিন্তু বিপদে পড়লাম। তারাপদ সেই শীতের অপরাহ্নে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ভয় কী ? হেলেন করে দেবে।' তখনও জানতাম না যে তারাপদর বাড়িতে যে বালিকাটিকে গৃহকর্ম করতে দেখেছি—তার নামই হেলেন। তারাপদ বুঝিয়ে বলল, পুরো নাম হেলেন হুইলার। ওর পূর্বপুরুষেরা নাকি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় কানপুরে ছিলেন, সিপাহী হাঙ্গামার সময় যুদ্ধ করেছিলেন।

খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিলাম আমরা। এই কথা শুনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার কী রকম অদ্ভুত অবস্থা হল। তারাপদ কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, আমার অবস্থা দেখে ফিরে এল। বোধহয় মনে করেছিল আমার শরীর খারাপ লাগছে। শরীর ও মন কিছুই স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। কারণ বলছি। আমি সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে পাণ্ডুলিপি টাইপ করার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম, তার একটা বড় অংশ জেনারেল স্যার হেনরি হুইলারকে নিয়ে লেখা। তিনি কানপুরে ইংরেজদের সেনানায়ক ছিলেন। তাঁর ছেলেও সেনাদলে কাজ করতেন। কানপুরে ইংরেজ শিবির অবরোধের সময় কামানের গোলা লেগে তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়। কয়েকদিন অবরোধের পর নানাসাহেবের সঙ্গে স্যার হেনরি হুইলারের চুক্তি হয়েছিল যে, ইংরেজদের চলে যেতে দেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। কানপুরে সতীচৌরা ঘাটে যখন ইংরেজ সৈনিক ও অন্যান্য সকলে নৌকায় উঠছিলেন, তখন নদীর তীর থেকে তাঁদের উপর গোলাগুলি বর্ষণ আরম্ভ হল। এই হাঙ্গামার সময় জেনারেল হুইলার গুলি লেগে মারা গেলেন। তাঁর দুই মেয়ে ছিলেন, এক মেয়ে তখনই মারা যান। আর একজন সম্বন্ধে বিবরণ আছে যে, এই গোলমালের মধ্যে তিনি একজন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে তার ঘোড়ায় পালিয়ে যান। তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, না স্বেচ্ছায় বন্দিনী হয়েছিলেন, তা নিয়ে জল্পনার শেষ ছিল না। কন্দর্পদেব অন্ধ, কিন্তু তাই বলে একজন জেনারেলের মেয়ে একজন অশিক্ষিত কিংবা প্রায় অশিক্ষিত ভারতীয় নিম্নপদস্থ সৈনিকের সঙ্গে বিনা প্রতিবাদে চলে যাবেন এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হয়ে যাবার পরে কয়েক বৎসর ধরে ব্রিটিশ সরকার এই মেয়েটির খোঁজ পাবার জন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত উত্তর ভারতবর্ষের বহু জায়গায় সিপাহীরা ছড়িয়ে পড়েছিল, খোঁজ করে দেখা হয়েছে তাদের দলে বিদেশিনী বলে সন্দেহ হয় এমন কোনো মেয়েকে দেখা যায় কিনা। নানাসাহেব নেপালে পালিয়ে যাবার পরে নেপালেও লোক পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হয়।

হেলেন হুইলারের নাম শুনে বিচলিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমার মনে হয়েছিল যদি সত্যিই জেনারেল হুইলারের পরিবারের হয়, তাহলে ১৮৫৭র বিদ্রোহ তো চার-পাঁচ পুরুষ আগেকার ঘটনা। ইংরেজদের অভ্যাস পরিবারের চিঠিপত্র কাগজ ইত্যাদি নষ্ট না করে রেখে দেওয়া। বাড়ি ফিরে সেরাত্রে ভাল ঘুম হল না, সমস্তক্ষণ মনে হতে লাগল লণ্ডনের উপকণ্ঠে একটি বাড়ির

চিলেকোঠার ঘর। মেজে থেকে ছাদ পর্যন্ত পুরনো হাতে লেখা কাগজ ও খবরের কাগজের কাটা টুকরোয় প্রায় ভর্তি। হাতে লেখা কাগজ কোথাও কোথাও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে আনা জিনিস—পুরনো পিস্তল, তরোয়ালের বাঁট, ভাঙ্গা দূরবীণ প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত। অল্প বয়সের ছেলে যেমন করে 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'এর কোনো গুহায় গুপ্তধনের স্বপ্ন দেখে, আমি সমস্ত রাত সেই স্বপ্নে জেগে কাটালাম। পরদিন সোমবার। হেলেন হুইলারকে তারাপদ মঙ্গলবার তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল। সোমবার আর মঙ্গলবার আমি প্রতিদিনের মত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গেলাম, কিন্তু সে কেবল সময় কাটানো। কাজে মন বসাতে পারলাম না। মন বারবার ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্লিওকে বলতে লাগল, কে জানত তুমি আমার জন্য এত সৌভাগ্য সঞ্চয় করে রেখেছ।

অবশেষে মঙ্গলবার এল। সন্ধ্যার পরে তারাপদর বাড়ি গিয়ে দেখি হেলেন এসে বসে আছে। মুখ দেখে মনে হল তারাপদ তাকে ব্যাপারটা কিছু বলেছে, অবশ্য সেও একটুর বেশি জানত না। হেলেনকে বললুম, 'তুমি কি জানো আমি তোমাদের পরিবারের ইতিহাসকার?' হেলেন বলল, 'শুনেছি।'

এখানেই যদি কাহিনী শেষ করে দেওয়া যেত তাহলে পাঠকরা নানা রকম সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন। কিন্তু তার উপায় নেই। যা প্রকৃত ব্যাপার বলছি। আধঘন্টার মধ্যে জানা গেল হেলেন হুইলার জেনারেল হুইলারের বংশের মেয়ে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু যাকে ডিরেক্ট ডিসেনড্যান্ট বলে তা নয়। জেনারেল সাহেবের এক ভাই ছিলেন। মেয়েটি সেই পরিবারের। এই হুইলার নির্বিরোধী লোক, যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে ছিলেন না, ব্যবসা করতেন, বোধহয় চা-কফির প্ল্যানটেসন।

'কাগজপত্র কিছু পাওয়া যাবে?' 'কিছুই না।' তাতেও দমে না গিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'পরিবারের প্রাচীনরা কেউ বেঁচে আছেন?' 'দু'জন ছিলেন। দুই পিসি; একজন খুব রোগজীর্ণ, হাসপাতালে। আরেকজনও খুব বৃদ্ধা, তিনি কিছু বুঝতে পারবেন না।' হেলেনের বাবা অবশ্য বেঁচে আছেন, তাঁরও অনেক বয়স হয়েছে। চোখেও দেখতে পান না।

ক্লিও অবশ্য খুব নিষ্ঠুর। তার পরিচয় তো নানা ভাবে পেয়েছি। দার্জিলিংএর কার্ট রোডে 'দুরাশা' গল্পের বদ্রাওয়ন খাঁর নাতনির গল্প মনে পড়ল।

একটু অবশিষ্ট আছে। হেলেন হুইলার আমার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অর্থাৎ নানাসাহেব ও জেনারেল হেনরি হুইলার কাহিনী টাইপ করে প্রেস কপি তৈরি করে দিয়েছিল। কয়েক বছর পরে আবার যখন গেলাম, তখন শুনলাম সে লণ্ডনে নেই। ইংলণ্ডের অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিংহলি অধ্যাপককে বিয়ে করে চলে গিয়েছে।

আগেকার কথায় ফিরে আসি, ১৯৩৬ সাল। বোধহয় সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষকদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থিসিস পাঠান হল। তিনজন পরীক্ষক—অধ্যাপক ডডওয়েল ও ডঃ বারনেট তো থাকবেনই, নিয়ম অনুসারে।

তৃতীয় ব্যক্তির নাম স্যার প্যাট্রিক ক্যাডেল। পুরনো দিনের আই সি এস। পূর্বে তাঁর নাম শুনেছি কিনা চট করে মনে করতে পারলাম না। পরে স্মরণ হল তিনি বোম্বাই থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক কাগজের বড়দিনের বিশেষ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন মহারাষ্ট্রের ইতিহাস বিষয়ে। তাঁর ইতিহাসের বই 'এ হিস্ট্রি অব দি বম্বে আর্মি' তখন ছাপা হচ্ছিল। 'হুজ হু' খুলে যা দেখলাম তাতে আমার প্রায় হৃৎকম্প হল। লেখাপড়ার কথা বিশেষ কিছু নেই। লেখা আছে, শখ বিগ গেম হান্টিং। এতে আশ্বস্ত হবার কিছু নেই।

ইতিমধ্যে আমাদের স্কুলের বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন থেকে সেই রকম গুজব শুনছিলাম। অবশেষে 'টাইম্‌স'-এ বাড়ির ছবি বের হল, তার সঙ্গে খবর। আমরা অন্য দুটি বাড়িতে উঠে গেলাম। একটিতে ক্লাস হত, তার কাছেই অন্য বাড়িতে লাইব্রেরি। রাসেল স্কোয়ারের কাছে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি উঠতে আরম্ভ করেছিল। শুনলাম তার কাছেই স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের নতুন বাড়ি হবে। তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বাড়ির একতলা উঠেছে, বোধহয় দোতলাও আরম্ভ হয়েছে। সেই বাড়িতে আমার থিসিস দিয়ে এলাম।

অধ্যাপক ডডওয়েল বললেন, 'তোমার শরীর কাহিল দেখছি। প্যারিসে চলে যাও। অন্তত এক মাস সেখানে থাকবে। পরীক্ষার কথা ভাববে না। মাসখানেকের আগে ফিরবে না।' তখন ফ্রান্স, এমন কী প্যারিসেও, বুঝে সুঝে চলতে পারলে লণ্ডনের চাইতে কম খরচে চালানো যেত। প্যারিস আমার একেবারে অজানা জায়গা ছিল না। কিন্তু কবে পরীক্ষার তারিখ ঠিক হবে এই ভয়ে এক মাস অপেক্ষা করা সম্ভব হল না। তিন সপ্তাহ না পড়তেই ফিরে এলাম। তখন শীত আরম্ভ হয়েছে। লণ্ডনে পার্কের গাছ পত্রহীন, বিবর্ণ। প্রায়ই আকাশ মেঘে অন্ধকার ও বৃষ্টি। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই কিছু সবজান্তা ছাত্র থাকে। তাদের একজন আমাকে বলেছিল, যদি তুমি ভাইভা ভোসির পরে তোমাকে ডাকলে ঘরে ঢুকে দ্যাখো, পরীক্ষকদের হাতে দস্তানা নেই, তাহলে বুঝবে ভাগ্য প্রসন্ন। তাঁরা তোমার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করবার জন্য দস্তানা খুলে রেখেছেন। কিন্তু যদি দ্যাখো, তাঁরা দস্তানা পরে বসে আছেন, তাহলে তার অর্থ বুঝতে আর বিলম্ব কোরো না। সকালবেলা সাড়ে দশটা এগারোটায় আমার ভাইভা হল।

পরীক্ষার আগে বন্ধুরা, বিশেষ করে ফণি সেনগুপ্ত বলতে লাগল হোর্ন ব্রাদার্সের পুরনো স্যুট পরে যদি যাও, তোমায় ফেল করিয়ে দেবে। বলতে বাধা নেই, হোর্ন ব্রাদার্সের পাঁচ গিনির স্যুট দু'বছর পরেছি, তখন তার অবস্থা জীর্ণ। প্ররোচনায় ভুলে হেক্টর পো থেকে সাত-আট গিনি দিয়ে স্যুট করালাম। তখন ভারতীয় দু'একজন ছাড়া হেক্টর পোতে জামা কাপড় বানানো চরম বিলাসিতা বলে মনে হত। সবাই স্যুট দেখে বলল এইবার নির্ঘাত পাস হয়ে যাবে। দুরুদুরু হৃদয়ে যখন পরীক্ষার জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলাম তখন পরীক্ষকরা সবাই আসেননি। আমি যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ পরে ডাক পড়ল। স্যার প্যাট্রিক ক্যাডেল বেশির ভাগ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। একটি প্রশ্ন এখনও মনে আছে। তিনি বললেন মারাঠা যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের বীরত্বের কথা আমি যথেষ্ট লিখিনি কেন, মনে হয় আমি এড়িয়ে গেছি।

উত্তর তৈরি ছিল। বললাম আমি তো যুদ্ধের ইতিহাস লিখছিলাম না, রাজনৈতিক ইতিহাস লিখেছিলাম, তাতে আর বেশি কিছু বলা উচিত হত না। অন্য দু'জন পরীক্ষক আমার কথার সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগলেন। আরও কিছু আলোচনার পরে স্যার প্যাট্রিক ক্যাডেল তাঁর পকেট থেকে একটি লম্বা খাম বার করে আমার হাতে দিলেন, বললেন, পড়ে দেখো। পড়ে দেখি, থিসিসে যত টাইপের ভুল, কমা সেমিকোলনের ভুল সব একটি তালিকা করে দিয়েছেন। আমার দেখা শেষ হলে বললেন, 'থিসিস যখন ছাপতে দেবে তখন এটা তোমার কাজে লাগতে পারে।' আমার হয়তো কিছু বলা উচিত হত না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলাম, 'থিসিস যেমন আছে সে কি ছাপার যোগ্য ?' তিনি বললেন, 'অবশ্য। তবে ভবিষ্যতে তো আরও কাজ করবে, তখন ইংরেজ সৈনিকরা কী রকম সাহসের কাজ করেছিল, যেমন কোরগাঁওয়ের যুদ্ধে, সে কথা ভুলে যেও না।' তাঁরা দস্তানা খুলেছিলেন কিনা আমার জানবার দরকার ছিল না। পরীক্ষার ফল আমি জানতে পেরে গিয়েছি। জীবনের কোনো পরীক্ষা এত সহজে পাস করিনি। এটি ব্যতিক্রম। এরপর কয়েক মিনিট ইতিহাসের নানা বিষয়ে আলোচনার পর আমাকে বিদায় দেওয়া হল।

বাইরে বেরিয়ে দেখি বিষণ্ণ আকাশ। আমার নিজের খুব আনন্দিত হবার কথা, কিন্তু শরীর ক্লান্ত, মনও বোধহয় সেজন্য বিমর্ষ ছিল। মনে হল পৃথিবীতে এর পর আর কোনো কাজ বাকি নেই। বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করে দিলাম সে মাসেই ফিরে আসছি। জাহাজের টিকিট তো আগেই করা ছিল। বন্ধুবান্ধবরা গাওয়ার স্ট্রিটে জড় হয়েছিল, পরীক্ষার ফল বের হলে একসঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে আমি অনুপস্থিত। তারা ধরে নিল পরীক্ষার ফল সুবিধার হয়নি। তখন লণ্ডনে অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র সস্ত্রীক কিছুদিনের জন্য এসেছিলেন। তাঁর হোটেলে গেলাম। তাঁর সঙ্গে একটি পরিচিত ইটালিয়ান রেস্তরাঁয় খাওয়া গেল। থিয়েটার দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, হয়ে উঠল না।

পরীক্ষার ফল বের হবার সঙ্গে সঙ্গে মন দেশে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। জিনিসপত্র প্যাক হয়ে গেল। জিনিসপত্রও এমন আর কী ছিল। দেশে থাকতে চামড়ার একটি ছোট অ্যাটাচি কেস কিনেছিলাম। মনের আবেগে সেটি একজনকে দান করে ফেললাম। পি অ্যাণ্ড ও-র জাহাজে আগে কখনও উঠিনি। ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মার্সেই থেকে কৈসর-ই-হিন্দ নামে একটি জাহাজ ছাড়ছিল। এই জাহাজ অপেক্ষাকৃত ছোট। ভাড়া পি অ্যাণ্ড ও-র অন্যান্য জাহাজের চেয়ে সস্তা। সেই জাহাজেই যাব ঠিক করে ফেলেছিলাম। জাহাজটি খুবই বনেদি। অর্থাৎ এত পুরনো যে, কেবিনে গরম ও ঠাণ্ডা জলের ভাল ব্যবস্থা নেই। কল খুললে জল পড়ে বটে, কিন্তু সে-জল বাইরে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা নেই। জল ঘরের ভিতরে কলের তলায় বালতিতে জমা হয়। একটু হিসাবে ভুল হয়ে গেলে নোংরা জলে সমস্ত কেবিন থৈ থৈ করতে থাকে। তা হোক, জাহাজের আভিজাত্য স্বীকার না করে উপায় নেই। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে আসবার সময় এই জাহাজেই নাকি এসেছিলেন। তখনকার কালে নিশ্চয় একে লাক্সারি লাইনার বলা হত। তখনও তার রান্না বেশ ভাল ছিল।

অনেক জায়গা ঘুরে দেখেছি ভারতীয় গোয়ানিজ রাঁধুনিদের হাতের রান্নার যে স্বাদ, সে আর কোথাও পাওয়া যায় না। সমস্ত রাস্তা, কতদিনেরই বা, দশ-এগারো দিন, তাদের রান্না মুরগি কিংবা মেষ মাংসের কারি, বিরিয়ানি জাতীয় পোলাও, ভিন্দালু ইত্যাদি খেতে খেতে বোম্বাই পৌঁছলাম।

বোম্বাই পৌঁছে দেখলাম বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে স্ট্রাইক হয়েছে। নাগপুর দিয়ে কলকাতার ট্রেন যাওয়া-আসা বন্ধ। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলে, অর্থাৎ এলাহাবাদ দিয়ে ঘুরে কলকাতা আসা চলে, কিন্তু সেখানে টিকিট পাওয়া কঠিন। তার ফলে দু'তিন দিন বোম্বাই-এ থাকতে হল।

সে সময় বোম্বাই শহরে সস্তায় থাকা যেত। তাজমহল হোটেল স্টিমারে বিজ্ঞাপন বিলি করত, দিনে দশ টাকায় থাকা যায়। এখন শুনলে আশ্চর্য মনে হবে। যাই হোক, যে কয়দিন ছিলাম হোটেলে থাকতে হয়নি। আমার এক বন্ধু তাঁর ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন। বোম্বাই ঘুরে দেখলাম। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দ্বারিক ঘোষ বোম্বাইয়ের শহরতলি ঘুরিয়ে দেখালেন। বম্বে টকিজের চারপাশ এক রাত্রে ঘুরে দেখা হল। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে টিকিট পাওয়া মাত্র কলকাতা রওনা হলুম। যারা একসঙ্গে এসেছিলাম সবার পক্ষে আসা সম্ভব হল না। কয়েকজনকে আরও কয়েক দিন বোম্বাই থাকতে হল।

বড়দিনের দু'এক দিন আগে কলকাতা পৌঁছলাম। বড়দিনে একসময় কলকাতায় খুব হৈ চৈ হত। বড়লাট আসতেন। দেশীয় রাজারাও অনেকে কলকাতায় এসে ভিড় জমাতে ভালবাসতেন। বেশির ভাগ হৈ চৈ চৌরঙ্গি পাড়ায়, আর শহরের যে সব অঞ্চলকে তখন সাহেবপাড়া বলা হত। নিউ মার্কেটে বড়দিনের বাজারের ভিড়। গরিব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়াতেও লোকের ভিড়, কিন্তু জৌলুস অনেক কম। ভাল বিলিতি খাবার জায়গা বলতে বোঝা যেত চৌরঙ্গিতে ফারপো, গভর্নমেন্ট হাউসের পূর্ব দিকে পেলিটি। ধর্মতলার মোড়ে ব্রিস্টল অপেক্ষাকৃত ছোট খাবার জায়গা। তবে রান্নার প্রশংসা ছিল। এখন এর একটিও নেই। বাঙালিপাড়ায় বড়দিন একেবারে ছিল না তা নয়। অনেক দিন থেকেই ব্যবসায়ীরা বুঝতে পেরেছিলেন বড়দিনের ব্যবসা মানেই লাভ। এখন থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে কলকাতায় থিয়েটার জেঁকে বসত। বড়দিনের সময় আপিসে, স্কুল কলেজে দশদিন ছুটি থাকত। থিয়েটারওয়ালারা নতুন নাটক খুলতেন। হাল্কা বই এই সময়ের জন্য দেখানো হত। আমি যখন কলেজে পড়ি তখন একটি জিনিস লক্ষ না করে উপায় ছিল না। ডিসেম্বর মাসে শীত পড়লেই দেখা যেত রাস্তাঘাটে নানা রকম রং—সবুজ, হলদে, নীল, লাল। সবার গায়ে রঙিন আলোয়ান। বড় রাস্তার মোড়ে, বিশেষ করে বৌবাজার বা কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের সামনে, ফিরিওয়ালাদের কাছে আপেল, কমলালেবু, ন্যাসপাতির ভিড়। ফুটপাথে স্তূপ করা বাঁধাকপি, ফুলকপি। শীত কমে গেলেই মনে হত একদিনে সমস্ত গায়ে দেবার আলোয়ান অন্তর্হিত হয়েছে। শীতের সওদা যেতে আর কিছুদিন দেরি হত। ফুলকপি, টমাটো, শিম অনেকদিন বাজার আলো করে থাকত। এখন যেমন যে-কোনো সময় সব ঋতুর ফল কিনতে পাওয়া যায়, তখন সেরকম ছিল না। সেদিন খ্রীষ্টপর্বের আগের দিন। বিকালবেলা এসপ্ল্যানেড

থেকে ট্রামে বাড়ি ফিরছিলাম। লিণ্ডসে স্ট্রিটের কাছে এসে চোখে পড়ল রাস্তায় বড়দিনের জন্য খুব আলো দেওয়া হয়েছে।

যত দিন যেতে লাগল আমার ভবিষ্যৎ ক্রমশ অন্ধকার মনে হতে লাগল। ফিরবার আগে অধ্যাপক ডডওয়েলের কাছে বিদায় নিতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'দেশে ফিরে যাবার আগে তোমাকে একটি কথা বলব। ফিরে গেলেই তোমাকে অনেক জায়গা থেকে চাকরি নিতে সাধাসাধি করবে। কিন্তু ভেবে চিন্তে কোথায় কাজ নেবে ঠিক করবে। যা আসছে তাই নেবে না। কারুর ধরাধরিতে ভুলবে না।' আমার অধ্যাপক চিরজীবন ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন, কিন্তু এখানকার প্রকৃত অবস্থা কী, তা তিনি জানতেন না। তখন বাংলা দেশে লিগ সরকার। সরকারি হুকুমে প্রায় সব চাকরি 'অ-হিন্দুদের' জন্য আলাদা করা থাকত। 'অমুসলমান'দের জন্য কোথাও জায়গা নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি হবে একথা মনে করিনি। খুব সাধারণ কলেজও দেখলাম আমার সম্বন্ধে উদাসীন। সে সব কলেজে মাঝে মাঝে চাকরি খালি হত। মাইনে একশো টাকা। কোথাও কোথাও একশো টাকার রসিদ দিয়ে পঁচাত্তর টাকা নিতে হত। কিন্তু তারাও চেনা লোক বা চেনালোকের লোক ছাড়া আর কাউকে নিতে অনিচ্ছুক। একটি বড় কলেজে চাকরি খালি আছে শুনে সেখানে দেখা করলাম। সেখানকার ম্যানেজিং কমিটির কর্তা আমার উপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ক্লাসে পড়াতে পারবেন ?' শুনে অপমান বোধ হল। আমার একজন পুরনো শিক্ষক বললেন, 'ইস্কুলে মাস্টারির চেষ্টা করো। বরাতে থাকলে একদিন হেডমাস্টার পর্যন্ত হতে পারবে।' তাঁকে দোষ দিচ্ছি না। ভাল ভেবেই বলেছিলেন। দু'একজন হাইকোর্টে ঢুকে পড়তে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমার আইন পরীক্ষা পাস করা ছিল। তাঁরা বললেন, 'তোমার দু'পুরুষ এই কাজ করেছেন। তোমার ভয় কী ?' ভয়টা যে কী তাঁদের বোঝাব কী করে। তবে ভয় ছিল কিনা জানি না, কিন্তু মন ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কালো কোট পরা বহু বিশুষ্ক চেহারার ভদ্রলোকদের এসপ্ল্যানেডে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এসে দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম নিতে দেখেছি। বাবা নিজে অবশ্য কিছু বলেননি। যৌবনে তাঁর নিজের এক সময় মাস্টারি করবার ইচ্ছা ছিল। আমি সেই মাস্টারি করবার জন্য তপস্যা করছি। এটা তাঁর বোধহয় খারাপ লাগেনি।

এই রকম যখন হতাশার সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছি, এমন সময় মনে হল যেন সমুদ্রে জাহাজের পাল দেখলাম। A sail. A sail বটে, কিন্তু ছেঁড়া পাল। এই জাহাজে বেশি দূর যাওয়া যাবে না। কিন্তু তাহলেও খুশি হয়েছিলাম। সংস্কৃত কলেজে ইতিহাস পড়াবার জন্য দু'জন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যখন একজন ছুটি নিতেন তখন অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আমায় ডেকে নিতেন, কখনও পনের দিন কখনও তিন সপ্তাহ। কিছুদিন পরে আবার ডাক পড়ত। একেবারে ঠিকে কাজ। তাহলেও শিক্ষকতায় এই আমার প্রথম হাতেখড়ি। খারাপ লাগত না। আমার সঙ্গে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁরা আমার চেয়ে সবাই বয়সে অনেক বড়। তাঁদের অনেককে এড়িয়ে চলতাম। একজন ইংরেজির

অধ্যাপক ছিলেন। তিনি প্রথম বয়সে রংপুরে ছিলেন। বাবাকে চিনতেন। কলকাতায় তিনি অনেক দিন ভবানীপুরে ছিলেন। তারপর হাওড়া চলে গেলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলতেন, 'বুঝলে ভায়া, সাত-আটশো টাকা মাইনে, ভবানীপুরে যে পাড়ায় থাকতুম সেখানে আরও অনেকে পায়। কিন্তু হাওড়ায় আমার তল্লাটে এত মাইনে পায় এরকম কেউ নেই।' কার যে কিসে আনন্দ, বোঝা যায় না। তবে তখন সাত-আটশো টাকা মাইনে যিনি পেতেন, তাঁকে বেশ রোজগেরে বলা হত। এক ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি কী পড়াতেন মনে নেই, আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'আপনি এখানে এলেন কেন ? বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে আপনি খুশি হতেন।' খুশি নিশ্চয় হতাম, কিন্তু তার উপায় ছিল না। দর্শনশাস্ত্রের একজন অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। তিনি হরিশ মুখার্জি রোডে থাকতেন। সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে আসবার পরে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে গিয়ে গল্প করেছি। আর একজন অধ্যাপক ছিলেন, লোক ভাল, কিন্তু সহজেই কারুর উপর হঠাৎ খুব ক্রুদ্ধ হতেন। তাঁর সম্পর্কে আমার মনে হত তিনশো বছর আগে ইয়োরোপে জন্মালে তাঁকে ক্রমাগত ডুয়েল লড়ে যেতে হত। তিনি বরেন্দ্রভূমিতে আগে একটি বড় কলেজে কাজ করতেন। তাঁর একটি প্রিয় গল্প ছিল, পদ্মার ধারে তাঁর প্রাতঃভ্রমণ বিষয়ক। গল্পটি এই রকম—"প্রাতঃকালে একদিন পদ্মার পাড়ে বেড়াইতেছি (তিনি 'বেড়াইতেছি' কথাটি চার বার উচ্চারণ করলেন তাঁর ভ্রমণের দীর্ঘত্ব বোঝাবার জন্য) এমন সময় সামনে দেখি..." এই বলে একটু থেমে বললেন, 'বলেন তো কী ?' আমি প্রায় বলে ফেলেছিলাম 'কুমির।' পদ্মার ধারে আর কী পাওয়া যেতে পারে ? ভাগ্যিস কিছু বলিনি। ভদ্রলোক নিজেই জবাব দিলেন, 'সামনেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।' পরে মনে হল 'কুমির' বললে বেশি ভুল হত না। সে সময় বাঘ, কুমির, ম্যাজিস্ট্রেট সবাই সমান ভীতিকর।

সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশিদিনের নয়। কিন্তু সেই অল্পদিনেই ছাত্র ও সহকর্মীদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। পড়াতে আরম্ভ করেই দু'জন ছাত্র পেয়েছিলাম যাদের সঙ্গে সম্পর্ক এখনও অটুট আছে। একজন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, আর একজন সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। আরও একটি কারণে এই কলেজের কথা মনে পড়ে। প্রথম চাকরির প্রায় দশ-পনের দিনের মাইনে পাইনি। আপিসের কোনো গলদ ছিল মনে হয়। তখন আমার যাঁরা শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাঁরা উপদেশ দিয়েছিলেন ব্যাপারটি যাতে ভুলে যাই। এছাড়া আর কিছু করারও ছিল না।

সংস্কৃত কলেজে আমার সহকর্মী যাই বলুন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ কাজ পেয়ে যাব একথা ভাবিনি। কাগজে 'কাজ খালি' দেখলে কিংবা লোকমুখে শুনলে দরখাস্ত করতে দেরি করতাম না। শুধু কলকাতায় নয়, ভারতবর্ষের সর্বত্র কাগজে কর্মখালি দেখলেই দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছি। কোনো জায়গা থেকে উত্তর আসেনি। কেবল এক জায়গায় অন্য রকম ব্যবহার পেয়েছি। বরোদা কলেজে একটি কনিষ্ঠ অধ্যাপকের কাজ খালি ছিল। খবরের কাগজে দেখে

দরখাস্ত করেছিলাম। অল্পদিনের মধ্যে সেখানকার অধ্যক্ষের কাছ থেকে চিঠি পেলাম। ভদ্রলোক ইংরেজ। আমাদের দেশের অবস্থা কতটা জানতেন জানি না। আমাকে লিখলেন, 'তোমার দরখাস্ত পেয়েছি। এই রকম ছোট কাজে কখনও আসতে চাইবে না। তোমার যা ডিগ্রি, ভাল কাজ ছাড়া আর কিছু তোমার নেওয়া উচিত হবে না। নিলে পরে অনুতাপ করবে।' আর একবার চাকরি নিয়ে এক জায়গায় কথাবার্তা হয়েছিল, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। ওয়ালটেয়ার বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে নিতে চেয়েছিলেন, মাইনে দিতে চেয়েছিলেন একশো ত্রিশ কিংবা একশো পঁয়ত্রিশ টাকা। কলকাতা থেকে দূরে বলে আমি দেড়শো টাকা চেয়েছিলাম। সেটা তাঁদের মনঃপূত হয়নি।

তখন আমার প্রথম বই 'বাজিরাও দি সেকেণ্ড অ্যাণ্ড দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বেরিয়েছে। বইটি বের হবার পরে স্যার যদুনাথ সরকারকে এক খণ্ড উপহার দিতে গেলাম। স্যার যদুনাথ আমাকে চিনতেন না। আমার পিতৃবন্ধু সতীশচন্দ্র সিংহ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। যদুনাথ আমার পিতার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সেসময় প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। বাবার কাছে শুনেছি তিনি তাঁর কাছে Cowper's Letters পড়েছেন। পাটনায় বদলি হয়ে যাবার পরে খোদাবক্স লাইব্রেরির সান্নিধ্যে মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ জাগে। এর পরের খবর সবাই জানেন। অবসর নিয়ে কলকাতায় এসে তিনি বছরখানেকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। তখন উপাচার্যের পদ এত কন্টকাকীর্ণ ছিল না। তাহলেও সে সময় তাঁর সুখের হয়নি।

যদুনাথ তখন মধ্য কলকাতায় থাকতেন। শীতকাল। গিয়ে দেখলাম তিনি উঠানে আলোয়ান গায়ে দিয়ে খাটিয়ার উপর আধশোয়া অবস্থায় ছুঁচলো পেন্সিল হাতে ফিশারের 'এ হিস্ট্রি অব ইউরোপ' পড়ছেন। বইটি তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। আমাকে বললেন, এরপরে যখন বই লিখবে তখন সেকশনে ভাগ করে করে লিখবে। তিনি নিজেও এইভাবেই লিখতেন। এটি তাঁর গুরু আর্ভিনের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন। যদুনাথের শিষ্যরা এই ধারা অনুসরণ করে চলতেন। যেমন, অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগো ও অধ্যাপক আশীর্বাদিলাল শ্রীবাস্তব। আরও পরে তিনি যখন দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ি করলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো লাইব্রেরি থেকে বই আনবার দরকার হলে তিনি বিকালের দিকে আমাদের বাড়ি এসে বইয়ের নাম একটি চিরকুটে লিখে রেখে যেতেন। আরও কিছু বলবার থাকলে কখনও কখনও আসতেন, কিন্তু তাঁর স্বভাব মতো একটি ছোট চিঠিতে তাঁর বক্তব্য লিখে নিয়ে আসতেন, যদি আমাকে বাড়িতে না পাওয়া যায়। এক সময় দেখেছি ল্যান্সডাউন রোড ও রিচি রোডের মোড়ের কাছে একটি খাবারের দোকান থেকে নিয়মিত দই কিনে বাড়ি নিয়ে যেতেন। একথা কেউ কেউ জানেন। সেই দোকানের পাশ দিয়ে আমাকে প্রায়ই যেতে হয়, তখন সব সময় যদুনাথের কথা মনে পড়ে। লোকে বলে যদুনাথের স্বভাব খুব কঠোর ছিল।

একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তাঁর একমাত্র বন্ধু ছিলেন বোধহয় রাওবাহাদুর গণেশ সখারাম সরদেশাই।

এশিয়াটিক সোসাইটি ও অধুনালুপ্ত বঙ্গীয় ইতিহাসের পক্ষ থেকে আমরা যদুনাথকে তাঁর অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম। এশিয়াটিক সোসাইটির হলে এই অনুষ্ঠানে মানপত্র পাঠ করেছিলেন অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী। যদুনাথের মৃত্যুর সময় আমি বিদেশে ছিলাম। তার কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কোনো বইয়ের সন্ধানে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। আমি কথা বলতে বলতে তাঁকে পণ্ডিতিয়ার মোড় অবধি এগিয়ে দিলাম। মারাঠা ইতিহাসের বিষয়ে কী বলতে বলতে তিনি ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর হাত মুঠো করে বললেন, 'the mailed fist of Wellesley broke through the cobwebs of Maratha intrigues.' এই বলে আলোয়ান গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে শীতের কুয়াশা ও অন্ধকারে দ্রুত মিলিয়ে গেলেন। এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আমি প্রায় বেকার। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। গবেষণার জন্য ডিগ্রি পেয়েছেন এরকম লোক খুব বেশি ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে এরকম শুধু একজন ছিলেন। কিন্তু চাকরি পেতে হলে ডিগ্রি ছাড়া আরও অনেক জিনিস দরকার।

সামান্য ব্যতিক্রম হয়েছিল। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন দু'তিন মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রের ইতিহাস পড়াবার লোক ছিল না। আমি হাতের কাছে ছিলাম। আমাকে পার্টটাইম লেকচারার করে নেওয়া হল। সপ্তাহে দু'দিন কাজ। মাইনে একশো টাকা। খুশি হয়েছিলাম। ক্লাস না থাকলেও অন্যদিনও যেতাম। তখনও বুঝিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবাই সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না। কারুর কারুর জন্য এই রকম সুড়ঙ্গপথ থাকে।

সময় দেখতে দেখতে কেটে গেল। কিন্তু পাকা চাকরি হয়ে যাবার আগেই বিয়ে করলাম। বিয়ে করলাম বলা ঠিক হল না, বিয়ে হয়ে গেল। সেকালে তাই হত। আমাদের পরিবার ও আমার ভাবী শ্বশুরবাড়ি একমত হলেন। আমি আপত্তি করেছিলাম। তার বড় কারণ আমার যা উপার্জন তাতে নিজেরই খরচ কুলাবে না। তখনকার দিনে এসব আপত্তি কেউ শুনত না। আমার স্ত্রীকে কি আমি বিয়ের আগে দেখেছিলাম? মনে হয় দেখিনি। কাজেই তিনিও আমাকে দেখেননি। কিন্তু তাঁর আপত্তি ছিল মনে হয় না। আমি শ্বশুরবাড়ির সবাইকে ছেলেবেলায় চিনতাম, কেবল পাত্রীকে চিনতাম না। যখন আমার সাত-আট বছর বয়স তখন দেখেছি আমাদের বাড়ির মাঠে বিকালে অনেক ছেলেমেয়ে খেলতে আসত। সব মায়েরাই দুরাশা পোষণ করতেন মেয়ের মাথা দু'চার বার কামিয়ে দিলে তাঁদের কন্যারা কালে কেশবতী হবে। অস্পষ্ট মনে পড়ে বিকালে

যে সব খুকিরা খেলা করে আসত তাদের মাথায় ছোট ছোট চুল, শেষ বার মাথা ন্যাড়া করবার পর বেশি তখনও বাড়েনি। যাদের অল্প চুল দেখা দিয়েছে, তাদের সেই চুলে লোহার পিন গোঁজা। সে রকম পিন পরে আর দেখিনি। লোহার তৈরি, উপরে খুব ছোট চিনেমাটির মূর্তি—মূর্তির বিষয় মুরগি, গরু, হাঁস ইত্যাদি। এই দলে কি আমার ভাবী পত্নী কখনও ছিলেন ? মনে হয় না। আমার ভাবী শ্বশুরবাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে ছিল না। তবে একেবারে কাছেও নয়। তাঁকে পরে যা দেখেছি তাতে তিনি অতটা রাস্তা ভেঙে অন্য পাড়ায় খেলতে আসবেন ভাবা ঠিক হবে না।

ঘটা করে ক্যামাক স্ট্রীটে বৌভাত হয়ে গেল। অনেক লোক, আলো, ফুল। একমাত্র আমিই ম্লানমুখ। একটি পয়সা তখন উপার্জন করি না। তাছাড়া অনেক সংসারে এত অশান্তি দেখেছি যে, সেই সংসারমঞ্চে প্রবেশ করবার ইচ্ছা ছিল না। অশান্তি করতে ভালবাসেন এরকম ঘরের কিংবা বাইরের মহিলা সব পরিবারেই আছেন। আমার স্ত্রী, সুপ্রিয়া, রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে বি· এ· পাস করেছিলেন কয়েক বছর আগে। এম· এ· পড়তে হলে কলকাতায় আসতে হয়। সেটা তাঁদের বাড়ির পছন্দ ছিল না। তার ফলে তিনি কিছু ভাল করে বুঝবার আগেই একজন বেকার যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল।

আমার বিয়ের কয়েক বছর পর যখন রংপুরে আমাদের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, তখন মাঝে মাঝে রংপুরে যেতাম। মন্মথনাথ গোঁসাই নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নামে গোঁসাই, কাউকে কাউকে মন্ত্রও যে দিতেন না তাও নয়, কিন্তু আহারে গোস্বামীসুলভ আচরণ ছিল না। সেই নিয়ে তার সঙ্গে সবাই রসিকতা করত। সংসারের কোনো কষ্ট তাঁর মুখশ্রী ও রসিকতাকে ম্লান করতে পারেনি। আমার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বহুদিন নেই, কিন্তু যারা তাঁকে চিনতেন তারা তাঁর কথা বিস্মৃত হতে পারেননি।

অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র একদিন তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে একটি বিজ্ঞাপন পড়তে দিলেন। বিজ্ঞাপনটি আমারও চোখে পড়েছিল। কিন্তু এই ধরনের চাকরিতে কোনো উৎসাহ ছিল না বলে এ সম্বন্ধে কিছু ভাবিনি। অল ইণ্ডিয়া রেডিও বিজ্ঞাপন দিয়েছিল তাদের জনতিনেক প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। তাদের সাহিত্য, লঘু সঙ্গীত, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, নাটক ও শিল্পকলা এই রকম একটি বিষয়ের চর্চা থাকা চাই। অধ্যাপক মৈত্রর খুব ইচ্ছা ছিল আমি আবেদনপত্র পাঠাই। আমি দু'একদিন ইতস্তত করে আবেদনপত্রের ফর্ম চেয়ে পাঠালাম। বাড়িতে এসে আমার স্ত্রীকে বললাম, অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে একটা চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়েছে। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করতে হবে ?' আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি এল, আমি বললাম, 'অনেক ধরনের কাজ, যেমন, ধরো···' বলেই তখনকার একজন নামকরা সিনেমার অভিনেত্রীর উল্লেখ করে বললাম, 'তিনি যখন স্টুডিওতে গাইতে আসবেন, তখন তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গত করতে হবে।' আমার যে গানবাজনা আসে না সে কথা তাঁর মনে পড়ল না। গম্ভীর হয়ে বসে

থেকে একটু পরে উঠে গেলেন। সৌভাগ্য যে, তিনি বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারতেন না।

কলকাতায় রেডিওর আপিসে তখন যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের নাম আজকাল সবাই জানেন। নৃপেন মজুমদার, নলিনীকান্ত সরকার, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। তাহলেও কর্তাদের নানা কারণে মনে হয়েছিল আপিস একটু ঢেলে সাজানো দরকার।

খবরের কাগজে কিছুদিন আগে থেকেই ছিটেফোঁটা খবর বের হচ্ছিল। ক'হাজার দরখাস্ত পড়েছে সেই খবর অমৃতবাজার পত্রিকায় বক্স করে ছাপা হল। এও গোপন রইল না যে, যাঁরা দরখাস্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে কিছু নামকরা সাহিত্যিক আছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক। যেদিন ইন্টারভিউ দিতে গেলাম একটি বিখ্যাত মাসিক কাগজের সম্পাদককেও দেখলাম। নানা বয়সের লোককে ডাকা হয়েছিল। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর আপিস তখন ১ নম্বর গার্স্টিন প্লেসে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের বাড়ি। উঁচু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় যেতে হয়। এ বাড়ির সঙ্গে আমার অল্প পরিচয় ছিল। সংস্কৃত কলেজে পড়াবার সময় একদিন এদের স্টুডিওতে এসেছিলাম। দোতলা ও তেতলায় স্টুডিও। সাজ সরঞ্জাম তখন বিশেষ কিছু ছিল না। একটা প্রোগ্রাম শেষ হলেই তাড়াতাড়ি পরের প্রোগ্রামের জন্য তৈরি হতে হত। তখন শ্রোতারা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন, "আমরা একটু সময় নিচ্ছি।" যাই হোক, এই ইন্টারভিউয়ের সময় বোঝা গেল, কর্তারা কেন রেডিওর কাজকর্মের জন্য লোক খুঁজবার চেষ্টা করছেন। দিল্লি থেকে রেডিওর বড়কর্তা লাওনেল্ ফিলডেন এসেছিলেন। কলকাতা স্টেশনের ডিরেক্টার স্টেপলটন সাহেব, নৃপেন মজুমদার ও আরও কে কে ছিলেন সবার নাম মনে নেই এখন। এখানকার সহকারী স্টেশন ডিরেক্টার অশোক সেন কমিটির সেক্রেটারি। আমাকে ডাকবার আগে পাশের ঘরে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। ঘরে একটি রেডিও সেট ছিল। ছোট ছেলেদের আসর হচ্ছিল। একজন সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলছিলেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্য করছিলাম কী রকম ইন্টারভিউ হচ্ছে। একজন দরখাস্তে লিখেছিলেন তিনি নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শী। তৎক্ষণাৎ তাঁকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে নৃত্যবিদ্যায় তাঁর দখল কতখানি পরীক্ষা করা হল। শুনলাম তিনি বেরিয়ে আসবার সময় প্রতিবাদ করছেন, 'আমি নাচতে জানি সে কথা তো লিখিনি, আমি বলতে চেয়েছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি।'

অবশেষে আমার ডাক পড়ল। প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হল, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে এখানে চাকরির কথা ভাবছি কেন ? সত্যি কথা বললাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চাকরির সম্ভাবনা নেই বলে। দ্বিতীয় প্রশ্নও ঐ ধরনের। জিজ্ঞাসা করা হল, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ চাকরি পেয়ে যাই তবে কী করব ? বললাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাব বলে মনে হচ্ছে না। তবে পেলে চলে যাব। আমার দরখাস্তে ছিল আমাকে দিয়ে বইয়ের সমালোচনা, বাংলা থিয়েটার, বাংলা ও বিদেশী সিনেমার আলোচনা করানো যেতে পারে। সেইসব নিয়ে কথাবার্তা হতে লাগল। কী ধরনের বই সম্প্রতি পড়েছি, কী ধরনের ছবি দেখতে ভালবাসি,

এইসব। একজন প্রশ্ন করলেন, আমি যদি কলকাতার ব্রডকাস্টিংয়ের কর্তা হতাম কী কী পরিবর্তন করতে চাইতাম। বললাম, 'এ প্রশ্নের উত্তর তো সহজে দেওয়া যাবে না, তবে পাশের ঘরে বসে থাকতে থাকতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের জন্য যে আলোচনা শুনছিলাম সেটিকে প্রোগ্রামে জায়গা দিতাম না। কথিকাটি কোথাও কোথাও অর্থহীন। এমন কোনো খবর নেই, যা ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে শোনা দরকারী মনে হবে। তাছাড়া দু'একটি কথা লেখা উচিত হয়নি।' একজন বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও যে, বড়দের আর ছোটদের জন্য লেখার মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না?' আমি বললাম, 'কখনও কখনও তফাত না রাখলেও চলে। তবে ছোটদের জন্য লেখার মান আছে। সেটি মেনে চলতে হয়।' একটু পরে দেখলাম একটি ফাইল এসে জমা হল। মনে হল আমি যে-লেখাটির প্রশংসা করতে পারিনি সেই লেখার ফাইল। যাঁরা বাংলা জানতেন তাঁরা দু'একজন লেখাটি দেখতে লাগলেন। এরপরে লণ্ডনের ও এদেশের স্টেজ সম্বন্ধে আমার একটু পরীক্ষা হল। তারপরে একজন জিজ্ঞাসা করলেন রেডিওতে বিলিতি ছবির সমালোচনা আমার কী রকম মনে হয়। তখন সপ্তাহে একদিন, বোধহয় রবিবার সকালে, বিদেশী ছবির আলোচনা হত। একটি ছবির কথা বলতে গিয়ে সমালোচক একজন অভিনেতার খুব প্রশংসা করেছিলেন, বলেছিলেন তিনি অখ্যাতনামা কিন্তু আশ্চর্য অভিনয় করেছেন। বক্তা অবশ্য জানতেন না যে এই 'অখ্যাতনামা' ব্যক্তিটির নাম র‍্যালফ্ রিচার্ডসন। মঞ্চে ও ছবিতে তাঁর সমান অধিকার। অল্পদিন পূর্বে তিনি নাইটহুড পেয়েছেন। আমি বেশি স্পষ্ট করে বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে, যারা শোনে তারা একেবারে মূর্খ নয়। এই সব মন্তব্য না জেনে করা উচিত নয়। মনে হল স্টেপলটন সাহেব একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। যাই হোক, ইন্টারভিউ সমুদ্র পার হয়ে গেলাম। শেষ হবার আগে আর একবার প্রশ্ন করা হল, বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেলে আমি কী করব? সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করেছি, প্রায় যখন শেষ ধাপে পৌঁছেছি তখন উপর থেকে এক ভদ্রলোক আমাকে "ও মশায়, শুনুন" বলে ডাকলেন। ফিরে দেখি নৃপেন মজুমদার মশায়। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'আর একদিন আপনাকে আসতে হবে সাহেবরা বলতে বললেন। আসছে সপ্তাহে অমুকদিন এতটার সময় আসবেন। ভুলবেন না যেন।' ভুলব না প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। দু'তিন দিন পরে গুজব শুনলাম আমার চাকরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা বলি আপিস থেকে অনেক গোপন খবর ফাঁস হয়ে যায়। এ ব্যাপার তখনও ঘটত। আমার এক বন্ধু অমিয়প্রসাদ মৈত্র উত্তর কলকাতায় থাকে। সে আমাকে টেলিফোন করে জানাল চাকরিতে আমাকে নেওয়া স্থির হয়ে গিয়েছে। আপিসের একজন বলেছেন, কে যেন এক গুপ্ত বিলাত থেকে এসেছে, সাহেবদের তাকে পছন্দ। তাকেই নেবে।

যাই হোক পূর্ব কথামত আর একদিন গেলাম। এবার কথাবার্তা খুব সংক্ষিপ্ত। আমাকে শুধু দুটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। এক, আমি কত তাড়াতাড়ি কাজে যোগ দিতে পারব। উত্তর দিলাম, 'খুব তাড়াতাড়ি পারব।' দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেলে সেখানে চলে যাব কিনা। 'বিশ্ববিদ্যালয় কেন

আমাকে ডাকবেন ?' এই কথা যখন বলেছিলাম, তখন সত্যি মনে করেই বলেছিলাম। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই অদৃষ্টের কৌতুকে হিসাবের গোলমাল হয়ে গেল।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর চাকরি না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে এলাম। আমার স্ত্রী খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কাজ নিয়ে যে এত ব্যস্ত থাকব তিনি ভাবেননি। এমন জিনিস পড়াতে হত যা আমি আগে পড়িনি। আমার স্ত্রী বুঝতে পারতেন না, কেন ব্যস্ত থাকি, কেন লাইব্রেরি থেকে এত দেরি করে ফিরি। কেউ কেউ মজা দেখবার জন্য নানা রকম কথা বলত। তিনি প্রথমটা বিশ্বাস করতেন। পরে হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন। আমাদের দেশে মেয়েদের প্রশংসা করবার সময় সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু একথা খেয়াল থাকে না যে, গয়না গড়াতে গেলে খাদ মেশাতে হয়, না হলে কিছু গড়া যায় না। সুপ্রিয়ার চরিত্রে সেই খাদের অভাব ছিল। সেজন্য দুঃখও পেয়েছেন।

পরিবারের ঘনিষ্ঠ মহলে সুপ্রিয়াকে অনেক সময় 'ডাচেস' বলা হত। আমার ভাইয়েরা তো বলতেনই। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও কেউ কেউ বলতেন। ডাচেস শব্দটির একটু ইতিহাস আছে। লণ্ডন থেকে ফিরবার সময় ওদেশেই ভাবী রাজা ডিউক অফ উইণ্ডসর সম্বন্ধে গুজব শোনা যাচ্ছিল। জাহাজে দেখলাম মহিলারা সবাই মিসেস সিম্পসনের উপর খড়্গহস্ত। পুরুষদের মনোভাব একটু অন্যরকম। দেশে ফিরেও দেখলাম ডিউক অফ উইণ্ডসরের কাহিনী অনেকের খুব পরিচিত। আমি বাড়ির বড় ছেলে, তাই আমাকে রসিকতা করে 'ডিউক' বলে ডাকা হত। বছর তিনেক পরে রংপুরবাসিনী মহিলা যখন আমাদের বাড়িতে এলেন তখন বাড়ির কেউ কেউ তাঁকে ডাচেস বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিল। তিনি প্রতিবাদ করেননি। সহাস্য কৌতুকের সঙ্গে নামটিকে গ্রহণ করেছিলেন।

যেমন আমার বিবাহ, সেই রকম আমার চাকরির জন্যও প্রস্তুত ছিলাম না। নবাবজাদা আবদুল আলির পর আমার মাস্টারমশায় সুরেন্দ্রনাথ সেন দিল্লির মহাফেজখানার কর্তা হয়ে দিল্লি চলে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে এমন একজন নতুন লোকের কথা ভাবতে হল, যে প্রধানত মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়াতে পারবে। আমার ডাক পড়ল। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন আমাকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু তখন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেন্টের প্রেসিডেন্ট। তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'একে তো চিনি।' চিনবারই কথা। আমি তাঁর কাছে আইন পড়েছিলাম। মারাঠাদের ইতিহাস পড়াব, সে তো ঠিকই ছিল। কিছুদিন পরে ঠিক হল আমি মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস অর্থাৎ মুঘলদের আগেকার ইতিহাস পড়াব। আগে কখনও ভাল করে পড়িনি, বিশেষত যাকে সোর্স মেটেরিয়েল বলে। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাস পড়াতে প্রথম-প্রথম আমার খুব পরিশ্রম হত। কিন্তু ধীরে ধীরে অনেক জিনিস জানতে হল, যার সঙ্গে আগে আমার ভাল পরিচয় ছিল না। পরে বুঝতে পেরেছি কত উপকৃত হয়েছি। এ বিষয়ে কোনো গবেষণা করিনি, সে-বিদ্যা আয়ত্ত করতে

পেরেছিলাম একথা কখনও বলব না। কিন্তু এর ফলে সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমার ভাল করে জানবার সুযোগ হয়েছে। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসও পড়িয়েছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশের ইতিহাস প্রথম থেকে পড়াতাম।

১৯৩৯ থেকে ১৯৬১—এই একুশ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের রীতি তখন অন্যরকম ছিল। মুখের কথাতেই সব হত। আমি কোনো লিখিত হুকুমনামা পাইনি চাকরির। বোধহয় চোদ্দ-পনের বছর পরে পেয়েছিলাম। তখন আর দরকার ছিল না। চাকরিতে ঢোকার দু'তিন বছর পরে খুব সাহস করে একজন কর্তাব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের কী হবে। তিনি খুব মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'কেন মাইনে কি পাচ্ছ না?' মাইনে ঠিকই পাচ্ছিলাম, কিন্তু অসুবিধাও হচ্ছিল। মাসের প্রথমে যে তারিখে সবাই মাইনে পেতেন, সে তারিখে পেতাম না। পেতে অন্তত দশ-বারো দিন দেরি হত, বেশিও হত। তাছাড়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রথম সাত বছর পাইনি। চেষ্টা করলে এসব সংশোধন করে নেওয়া যেত, কিন্তু যে উপায়ে করা যেত, তাতে আমার মন সায় দেয়নি। আমার মাস্টারমশায়রা বলতেন, তোমার তো টাকার দরকার নেই। কথাটা সত্য নয়। তার চেয়েও আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়েরও একটা বাঁধা নিয়ম থাকা উচিত। আমার মনে হত আমার স্ত্রী সন্দেহ করতে পারতেন আমি এতই খারাপ পড়াই যে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ঠিক মাইনে দেবার দরকার মনে করে না। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার একটি গল্প বলতেন। স্যার আশুতোষের কীর্তির মধ্যে একটি হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি তৈরি করা। এত বড় কাজ আর কারু দ্বারা সম্ভব হত না। তিনি বিলেত থেকে অনেক সময় বই আনাতেন। বিদেশে কোনো ভাল লাইব্রেরি কিংবা ব্যক্তিগত সংগ্রহ বিক্রি হবে শুনলে তিনি রেজিস্ট্রারকে সে সব বই আনাতে হুকুম দিতেন। প্রথমত কোনো ভাউচার সব সময় থাকত না। অডিট ভাউচার চেয়ে পাঠালে রেজিস্ট্রার নাকি বলতেন, 'ভাউচার কি দেওয়া যায়, ভাউচার তো কর্তার মুখের কথা।' এ সব আমার সময়ের অনেক আগেকার কথা। আমার সময় এই প্রথার সুবিধা কিছু পাইনি, অসুবিধা সহ্য করতে হয়েছে। আমার মাইনে সাত বছর ধরেই এক আছে। এই ব্যাপার নিয়ে কানাকানি হতে আরম্ভ হয়েছিল। তখন বিশ্ববিদ্যালয় কিছুটা ভুল শুধরে নিয়েছিল, কিন্তু সবটা নয়। এখনকার ভাষায় যাকে 'সোচ্চার প্রতিবাদ' বলে তা অবশ্য আমি কখনও করিনি। কারণ আমরা বুঝতেই পারতাম না যে, কী করে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলহ করা চলে। এখন দিন বদলেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো পক্ষেই কর্তব্যবুদ্ধি বা মমতার লেশমাত্র নেই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়াতে আরম্ভ করলাম তখন আমার পূর্বপরিচিত কেউ কেউ ছিলেন। ইতিহাসে নির্মলচন্দ্র সিংহ, যিনি এখন তিব্বতের ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ। আর ইংরেজি বিভাগে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীচন্দ্র সেন। কয়েকজনকে অবশ্য নামে ও চেহারায় চিনতাম। কেউ কেউ আমার পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। যেমন, সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বটকৃষ্ণ ঘোষ, মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্পদিনের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হল, তাঁরা হচ্ছেন নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়, অমিয়কুমার সেন, তমোনাশ দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন গুপ্ত। শিবপদ সেনের সঙ্গে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াতেন। তিনি পার্টটাইম লেকচারার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন।

ডঃ সুকুমার সেনের ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর শিক্ষক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, আর গণিত বিভাগের অধ্যাপক মোহিত ঘোষ মশায়ের সঙ্গে। শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত 'উর্দেস্কিত' কবিতার জন্য কেউ কেউ তাঁকে মনে রাখতে পারেন। মোহিতবাবুর কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। সহজে স্নান করতে চাইতেন না বলে জনপ্রবাদ ছিল। বাজারের সিঙাড়া কচুরি খেয়ে দিনের পর দিন কাটাতে পারতেন, বোধহয় পছন্দও করতেন। ভূতে বিশ্বাস করতেন এবং নিজে অনেকবার ভূত দেখেছেন বলতেন। দেশী ও বিলাতি অনেক ভূতের গল্প ও ডিটেকটিভ গল্প পড়েছিলেন এবং সেই সব গল্প নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসতেন। মোহিতবাবু দীর্ঘজীবী হননি। ডঃ সুকুমার সেনের সঙ্গে মোহিতবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। বোধহয় দু'জনেই ভূত আর গোয়েন্দা গল্প পছন্দ করতেন, সেইজন্য। সুকুমারবাবুর সঙ্গে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবার পরেই পরিচয় হয়েছিল। আমি কলেজে ঢুকবার আগেই কোনো একটি পত্রিকায় অশোকনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর একটি বিতর্ক পড়েছিলাম। তার কিছুদিন পরে পড়েছিলাম তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'। সুকুমারবাবুর সঙ্গে দেখতে দেখতে বন্ধুত্ব জমে উঠল। ক্লাসের পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা বসে গল্প করতাম। কখনও ক্লাসের পর সুকুমারবাবুর গোয়াবাগানের বাড়িতে বৈঠক বসত। সন্ধ্যা হয়ে যেত, পাশের বাড়ির উনুনের ধোঁয়া জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করত, সুকুমারবাবুর ছেলে বাবুসাহেব খেলতে যেত না, ম্লানমুখে বসে থাকত। কিন্তু আমাদের গল্প ফুরোত না।

সে সময় যাঁরা অল্পবয়সী অধ্যাপক ছিলেন তাঁদের নিজেদের শিক্ষালাভের দুটি প্রকৃষ্ট উপায় ছিল। প্রথম হচ্ছে আশুতোষ বিল্ডিংয়ের উপরতলার গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগার আমরা যখন পড়েছি তখন দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে ছিল। পড়ার ব্যবস্থা যে আদর্শ ছিল সে কথা বলব না, কিন্তু বই চাইলে পাওয়া যেত। যাদের জুনিয়ার স্টাফ বলা হয় তাদের মধ্যে কয়েকজন কাজে পটু ছিলেন। আমরা তো সাধারণ ছাত্র। আমাদের যা দরকার ওখানেই মিলত। তখন ছাত্রের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। অল্পসংখ্যক আসন অর্থাৎ পিঠ হেলান দেওয়া যায় এমন কয়েকটি লম্বা বেঞ্চি। কিন্তু বসবার আসন নিয়ে কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না। গরমের সময় ঘরগুলি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকত। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ করলাম তখন গ্রন্থাগারের চেহারা এবং স্থানের পরিবর্তন হয়েছে। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং থেকে গ্রন্থাগার চলে গিয়েছে আশুতোষ বিল্ডিংয়ের চারতলায়। কাগজে আগেই দেখেছিলাম তিনদিকের দেয়ালে ফ্রেস্কো

করে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন কালের ছবি আঁকা হবে। ছবি হয়েছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। অন্যতলার তুলনায় চারতলার ছাত কম উঁচু। কাজেই বড় আকারের ছবি সেখানে খুলবার কথা নয়। তা ছাড়া আমার মনে হত, অনেক ছবি অতিরিক্ত অলঙ্করণের ফলে ভারাক্রান্ত, রঙে, রেখায় ও বেশির ভাগ ছবিতে লোকের ভিড়ে। উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু কাজ ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক পাঠ্যপুস্তকের মতো অপরিচ্ছন্ন। বড় বড় চিত্রকররা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসে ছবি ও অলঙ্করণের কাজ করেছেন। সে-কাজ রেখায় এবং বর্ণবিন্যাসে সুন্দর, কিন্তু এখানে তাঁদের হাতের কাজ খোলেনি।

এ তো দোষের কথা। কিন্তু একজন অল্পবয়সী অধ্যাপকের শিখবার জায়গা এর চেয়ে ভাল আর ছিল না। নতুন গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক নীহাররঞ্জন রায়। এক জায়গায় হাতের কাছে সমস্ত বই পাওয়া যেত। ধুলো ঘাঁটতে আপত্তি না থাকলে নেড়েচেড়ে দেখবার কোনো বাধা ছিল না। এখানে এমন এমন বইয়ের সন্ধান পেয়েছি এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক পৃষ্ঠা করে পড়েছি যা অন্য কোনোখানে সম্ভব হত না। বেশি অসুবিধা হত এপ্রিল-মে-জুন মাসে খুব গরমের সময়। সূর্যের তাপে ঘরের দেওয়াল ভাজা-ভাজা হয়ে যেত, এবং ভয় হত কয়েক বছরের মধ্যে বইয়ের পাতা পাঁপড়ের মতো হয়ে যাবে। ওখান থেকে বেরিয়ে কাউণ্টারের সামনে ডেস্ক নিয়ে পড়তাম। গবেষক ছাত্রছাত্রীরাও পড়তেন। জুলাই মাসে বর্ষা এলে একটু নিশ্চিন্তে কাজ করা যেত। এখানেও গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে আমাদের রোজ কাজ করতে হত, তাদের ভদ্র ব্যবহার ও দাক্ষিণ্যের কথা বিস্মৃত হওয়া কঠিন। আশা করি এখনকার কোনো কোনো অধ্যাপকদেরও সেই কথা মনে হবে। ১৯৩৬ সালে নীহাররঞ্জন রায় লাইডেন থেকে পড়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সুনাম ছিল।

আর একটি জায়গা ছিল আশুতোষ বিল্ডিংয়ের তেতলা, অর্থাৎ গ্রন্থাগারের নীচের তলা, অধ্যাপকদের বসবার ঘর। অনেকে বলতেন এটিকে বসবার ঘর না বলে বড় স্টেশনের ওয়েটিং রুম বলা উচিত। যাঁরা আসল অধ্যাপক, তাঁদের জন্য আশুতোষ বিল্ডিংয়ের পশ্চিম প্রান্তে কয়েকটি ছোট ছোট খুপরির মতো ঘর ছিল। আমাদের বলা হত অক্সফোর্ডের টিউটোরিয়াল ঘরের কথা মনে রেখে ঐসব ঘর করা হয়েছে। অক্সফোর্ডের টিউটোরিয়াল ঘরের সঙ্গে এর অবশ্য কোনো মিল নেই। এখানকার অধ্যাপকরা বেশির ভাগ সময় এই ঘরে বসতে চাইতেন না। তেতলার লম্বা বড় ঘরের একদিকে ছোট পার্টিশন দেওয়া থাকত। মাস্টারমশায়দের অনেকে সেই পার্টিশনের আড়ালে বসে সিগারেট খেতেন। আমি আসবার পর এখানে চা-টোস্টের ব্যবস্থা হল। এর কথা একজন প্রাক্তন অধ্যাপক বিস্তারিত ভাবে বলেছেন।

স্কুল-কলেজে পড়বার সময় আমার বন্ধুদের সংখ্যা যে কম ছিল তা নয়। এখন সেই সংখ্যা কিছু বাড়ল। কয়েকজনের নাম আগে বলেছি। আরও

কয়েকজনের নাম বলব। যাঁরা আমাদের পরিবারের বন্ধু ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমে নাম করতে হবে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। প্রমথ চৌধুরীকে যখন দেখেছি তখন আমার বয়স অল্প, যখন হাফপ্যান্ট পরে স্কুলে যেতাম। 'সবুজপত্রে'র প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। তখন তাঁর একটি সবুজ রঙের গাড়ি ছিল। সেই গাড়িতে সপ্তাহে দু'দিন তিনি আমাদের বাড়ি আসতেন। গাড়ির চালকের নাম ছিল মাখন। আর যে পরিচারকটি বাড়িতে তাঁকে দেখাশোনা করত তার নাম ছিল ননী। প্রমথ চৌধুরী যৌবনে সুপুরুষ ছিলেন। সে কথা তাঁর সে-বয়সের একটি ছবি দেখলে বোঝা যায়। তিনি আমাকে একাধিকবার বলেছেন যৌবনে তিনি 'রাজা ও রানী'তে কুমারসেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আমি যখন থেকে তাঁকে দেখেছি তখন অবশ্য তাঁর কুমারসেন সাজবার চেহারা ছিল না, মুখের কথাও একটু স্খলিত। তিনি নানা বিষয়ে গল্প করতে ভালবাসতেন। প্রৌঢ় বয়সে তিনি ল' কলেজে পড়ানো শেষ করে কমলা বুক ডিপোতে গিয়ে বসতেন। সেখানে কিছু বই কিনে ময়দানে ঘুরে সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ি আসতেন। এটা আস্তে-আস্তে প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাবা কাজে ব্যস্ত থাকতেন, কাজেই আমার ডাক পড়ত। কোনো কোনো দিন বাবার সঙ্গে দেখা হত না। আমাদের সঙ্গে গল্প করে আটটার মধ্যে বাড়ি রওনা হয়ে যেতেন। এখানে গল্প করার সময় তিনি অনেকক্ষণ ধরে এক গ্লাস ঠাণ্ডা কমলালেবুর রস খেতেন। পুজোর সময় প্রতিবারের মতো আমরা কলকাতার বাইরে গিয়েছি। তিনি কী মনে করে একদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত। খালি বাড়ি, কেবল ঠাকুমা ছিলেন। তিনি যে ঘরে বসতেন, খুলে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পরে বাড়ির ভিতর থেকে এক গ্লাস কমলালেবুর রস এল। তিনি অনেকক্ষণ ধরে কমলালেবুর রস খেলেন। খুশি হয়ে পরের দিন বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী সব সময় সিগারেট খেতেন। সিগারেট খেতেন বলা একটু ভুল হবে, দু' আঙুলের মাঝে সিগারেট পুড়তে থাকত। সব সময় মুখে দিতেন না। শেষ বয়সে হাত কাঁপত, সিগারেট ধরাতে পারতেন না। তখন ইন্দিরা দেবী সিগারেট ধরিয়ে দিতেন। আমাদের পরিবারের এরকম অকৃত্রিম সুহৃদ আর ছিলেন না।

ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁরা তাঁকে 'বিবিদি' বলে ডাকতেন। তিনিও লিখতেন, তবে বেশি নয়। তাঁর নিজের সাম্রাজ্য ছিল অন্যত্র, গানের জগতে। এক সময় 'সঙ্গীত সম্মিলনী' উপলক্ষ্যে প্রতিভা চৌধুরীর সঙ্গে গভীর যোগ ছিল। সুরূপা বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। ছেলেবেলায় প্রথম যখন তাঁকে দেখেছিলাম, তখন তাঁকে দেখে অন্য মহিলাদের চেয়ে স্বতন্ত্র বলে মনে হয়েছিল। বাঙালি মেয়েদের চেয়ে দীর্ঘ, মুখের গড়ন বাঙালি মেয়েদের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। লক্ষ করলে মনে হবে ঠাকুরবাড়ির কারুর কারুর মুখের আদল ঠিক বাঙালির মতো ছিল না। বাঙালি বাড়ির মহিলারা একটু বয়স হলেই রঙিন জামাকাপড় পরা প্রায় ছেড়ে দিতেন। তখন সাদা কিংবা হাল্‌কা রঙের শাড়ি পরাই রীতি ছিল। ইন্দিরা দেবী তার ব্যতিক্রম ছিলেন। সম্ভবত বহু দিন ধরে মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করবার ফলে তিনি রং, অর্থাৎ ঘোর রং ব্যবহার

করা পছন্দ করতেন। যা পরতেন, তা-ই তাঁকে মানিয়ে যেত। জীবনে সুখ ও দুঃখ দুইই সমভাবে পেয়েছেন, এবং দুইই সমভাবে গ্রহণ করতে জানতেন। আমাদের ছেলেবয়সে 'মহীয়সী মহিলা' বলে একটি কাব্যগ্রন্থের নাম শোনা যেত। চেনাশোনার মধ্যে এই একটিই মহীয়সী মহিলাকে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ এক সময় লিখেছিলেন 'সত্যের প্রতিবিম্ব' তাঁর ভিতরে 'অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়'। এটি স্নেহের অত্যুক্তি নয়।

আর একজন মহিলার সঙ্গে আমার ছাত্রবয়সের স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে। তিনি প্রিয়ম্বদা দেবী। তাঁর মা প্রসন্নময়ী দেবীও এক সময় নিয়মিত লিখতেন। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে কবি বলে তাঁর নাম ছিল। এঁরা ৪৬ নম্বর ঝাউতলা রোডে থাকতেন, একটি পুরনো ধরনের একতলা বাড়িতে। বাগান থেকে কয়েক ধাপ উঠতে হয়। প্রসন্নময়ী দেবীর তখন অনেক বয়স হয়েছে। প্রিয়ম্বদা দেবীর বার্ধক্য এসেছে, একথা তখন বলা চলত না। তবে তাঁরও চুলে পাক ধরেছে। প্রিয়ম্বদা দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময়। তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় আমার অল্পবয়স থেকে। পুরনো বাঁধানো 'মুকুল'-এ তাঁর লেখা পড়েছিলাম বলেছি। শিমুলতলার ল্যাটুপাহাড়, ছাতি পাহাড়, হলদি ঝরনা এবং তিলুয়ার হাটের গল্প আমার মনে মোহ বিস্তার করেছিল। প্রিয়ম্বদা দেবীর লেখা কয়েকটি বই পড়লাম, একটি বইয়ের নাম 'অনাথ'। বিলিতি গল্প ভেঙে দেশী ছাঁচে লেখা হয়েছে। কলকাতার কাছে ডায়মণ্ডহারবার লাইনে কয়েকটি জায়গার নাম, বর্ষাকাল, বৃষ্টির জলে সব ভিজে থৈ থৈ করছে। তারপরে এল 'কথা ও উপকথা', পঞ্চুলাল, এও বিদেশী গল্পকে ছোটদের উপন্যাস করা হয়েছে। তখন চোখে পড়ল প্রিয়ম্বদা দেবীর অজস্র কবিতা মাসিকপত্রে। পুরনো 'সন্দেশ' কিংবা 'মৌচাক'-এ। প্রিয়ম্বদা দেবী বাড়ির বন্ধু, কিন্তু বিশেষ করে আমারও বন্ধু ছিলেন। যখন বিলাতে ছিলাম, হেনডনের ঠিকানায় নিয়মিত চিঠি লিখতেন। হঠাৎ চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল। প্রিয়ম্বদা দেবী কয়েকদিনের অসুখে মারা গিয়েছেন।

পারিবারিক বন্ধু বলতে 'সবুজপত্র'-এর দল, যেমন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও হারিতকৃষ্ণ দেব। ডঃ বাগচীর প্রেততত্ত্বে খুব আগ্রহ ও বিশ্বাস ছিল। তাঁর নাকি একবার নানারকম ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমি কখনও ডঃ বাগচীকে একথা জিজ্ঞাসা করিনি। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে বাড়িতে আসতে বিশেষ দেখিনি। ঢাকা থেকে ফিরে যখন কলকাতায় এলেন, তখন প্রায়ই আসতেন, এবং গরমের সময় হলে পাঞ্জাবি খুলে ফেলে ঠাণ্ডা মেজের উপর গড়িয়ে নিতেন। দ্বিতীয় বঙ্গবিভাগের কথা যখন চলছে, সেই সময় একবেলার জন্য এসে কয়েক সপ্তাহ আমাদের বাড়িতে থেকে গেলেন। আসার সময় বাড়িতে কিছু বলে আসেননি। আমরাই তাঁর বাড়িতে খবর দিলাম ও জামাকাপড় আনিয়ে নিলাম। হারিতকৃষ্ণ দেবকে প্রায় ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। একই রকম চেহারা। কলেজে পড়বার সময় তাঁকে যখন দেখতাম, আমার মিশরীয় রাজাদের মূর্তির কথা মনে পড়ত। খুব মিষ্টভাষী ছিলেন। নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবী যখন এ-পাড়ায় এসে বাড়ি

করলেন, তখন বাবার সঙ্গে তো বটেই, আমার সঙ্গেও বন্ধুত্ব হল। আগে থেকেই পরিচয় ছিল। দু'জনেই প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে আসতেন। সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য আসতেন, সবুজপত্রে মানিকগঞ্জের ভাষায় গল্প লিখেছিলেন। সতীশচন্দ্র ঘটককে একসময় খুব দেখেছি, যখন জ্যোতি বাচস্পতির সঙ্গে উদ্ভিদবিদ্যার প্রবন্ধ লিখতেন। 'পরিচয়' যখন প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছিল, তখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও কান্তিচন্দ্র ঘোষ আসতেন অনেক রবিবার দুপুরে বারোটা নাগাদ। কান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রকৃতপক্ষে 'সবুজপত্র' দলের। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকেও কখনও কখনও দেখেছি। একবার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে দেখেছিলাম, 'মানসী ও মর্মবাণী'র লেখার জন্য বাবার কাছে এসেছিলেন। বেশি দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ একজন লেখকের গল্প সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'হাসে যখন, সর্বাঙ্গ দিয়া হাসে।' প্রভাতবাবুর গল্পও তাই। কিন্তু প্রভাতবাবু নিজে গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। সহজে হাসতে চাইতেন না। আমাদের আইন পড়বার সময় তিনি ল' কলেজে পড়াতেন। তারকেশ্বর মোহান্তর মামলা আমাদের পড়তে হত। ছেলেরা মামলাটিকে গল্পের মতো করে প্রভাতবাবুকে দিয়ে বলাবার চেষ্টা করে সফল হল না। প্রভাতবাবুর শেষ উক্তি হল, 'তখন এলোকেশী হাকিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুজুর, আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেসা করবেন না।' এই বলে এলোকেশী চুপ করে রইল।' প্রভাতবাবুও চুপ করলেন। তাঁকে দিয়ে আর একটি কথাও বলানো গেল না। আমি অবশ্য তাঁর সেকশনের ছাত্র ছিলাম না। এ আমার শোনা কথা।

যাঁদের কথা এতক্ষণ বলা হল তাঁরা প্রায় সবাই 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর লোক। আমার মামা কিরণশঙ্কর রায় তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চায় আমাকে বাল্যকালে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, সে-কথা পূর্বে বলেছি। কুটুম্বিতা ছাড়াও বাবার সঙ্গে তাঁর যে আসল বন্ধন, সে সাহিত্যের বন্ধন।

বয়স একটু বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা বেশি আসতেন তাঁদের মধ্যে মনে পড়ে মুজফ্‌ফর আহমেদ, আব্দুল হালিম ও শচীন সেনগুপ্ত যাঁকে শুধু নাট্যকার বলে এখন পর্যন্ত লোকে মনে রেখেছে। প্রিয়রঞ্জন সেন ও তাঁর দাদা কুমুদরঞ্জন সেনকে আরও আগে থেকে দেখেছি। বিশেষত প্রিয়রঞ্জন সেন পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার আগে স্প্যাট্ সাহেব কয়েকবার এসেছিলেন। তাঁর চেহারা মনে নেই, কিন্তু হাফপ্যাণ্ট পরতেন সেকথা মনে আছে। আর একজন আসতেন, 'কলিকাতা দর্পণ'-এর গ্রন্থকার শ্রীরাধারমণ মিত্র। সেই ছেলেবেলার পর প্রথম দেখা হল অল্পদিন আগে। অনেক দিনের পর, কিন্তু চিনতে অসুবিধা হয়নি।

পরবর্তীকালে 'কল্লোল', 'কালিকলম' গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। দীনেশরঞ্জন দাশকে কখনও আমাদের বাড়িতে দেখেছি বলে মনে করতে পারি না। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় আসতেন। বাবা 'কল্লোল'-এ কখনও কখনও লিখেছেন। 'কালিকলম' দলের মুরলীধর বসু আসতেন। তিনি যে বড় সাহিত্যিক ছিলেন তা নয়, কিন্তু কিছুদিন 'কালিকলম'-এর দলকে একসঙ্গে ধরে রেখেছিলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। শৈলজানন্দ যখন যুদ্ধের

সময় সিনেমার ছবি করতে লাগলেন, তখন প্রথম প্রথম তাঁর প্রত্যেকটি ছবিতে অর্থপ্রাপ্তি হয়েছিল। মুরলীধর বসু মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষক ছিলেন। হঠাৎ সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে শৈলজানন্দবাবুর সঙ্গে যোগ দিলেন, কিন্তু সিনেমালক্ষ্মী তখন শৈলজানন্দবাবুকে ছাড়ব-ছাড়ব করছেন। মুরলীধর বসু যোগ দেবার কিছুদিন পরে শৈলজানন্দবাবুর ছবি তোলা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে এল।

বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, অজিতকুমার দত্তকে বাবা খুব পছন্দ করতেন। আমার মনে হত, বাবা বুদ্ধদেব বসুকে বোধহয় অন্যদের চেয়ে বেশি স্নেহ করতেন। এঁদের মধ্যে কারুর কারুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল পরে। যখন 'কালিকলম' প্রথম প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে তখন কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের দোতলায় তার আপিস ছিল। মুরলীধর বসু একদিন আমাকে বললেন, 'চলো, তোমাকে তারাশঙ্কর বলে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' তারাশঙ্করবাবু সেদিন 'কালিকলম' আপিসে আসেননি। কয়েকদিন পরে তাঁকে দেখলাম। আসল বয়সের চেয়ে তাঁকে অনেক কম বয়সের দেখাত। মুরলীধর বসু খুব ভুল করেননি। 'কালিকলম'-এর আপিসে সেই একদিন গিয়েছিলাম। তবে বেশি গিয়েছি এম· এ· পড়বার সময় 'ফরোয়ার্ড', 'লিবার্টি' ও 'বঙ্গবাসী' আপিসে শেয়ালদা স্টেশনের প্রায় উল্টো দিকে যে বাড়িতে এখন শ্রীসরস্বতী প্রেস হয়েছে। তখন সরোজকুমার রায়চৌধুরী কিছুদিন 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি ন্যাশনাল কলেজ থেকে পাস করেছিলেন, কিরণশঙ্কর রায়ের ছাত্র। রবিবারের বিশেষ পৃষ্ঠাগুলির সম্পাদনা করতেন নীহাররঞ্জন রায়। তখনও তাঁর সঙ্গে ভাল আলাপ হয়নি। সুবোধ রায়ের সঙ্গেও এখানে দেখা হত। 'বিজলী' কাগজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও শচীন সেনগুপ্ত ছেড়ে দেবার পর সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও সুবোধ রায় সম্পাদনা করতেন। এণ্টালি অঞ্চলে আপিস ছিল। সেখানে মাঝে মাঝে গিয়েছি। সুবোধ রায় চুঁচুড়ায় থাকতেন। একবার তাঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন। স্টুডিও তখন গঙ্গার ধারে ছিল। তখন সেখানে কয়েকটি গঙ্গার ছবি দেখে ভাল লেগেছিল। অনেকদিন পরে, চল্লিশ বছরের বেশি হবে, আর একবার এই স্টুডিও দেখতে গিয়েছিলাম। স্টুডিও তখন গঙ্গার ধার থেকে শহরের মধ্যে এসেছে। আমি সে সময় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। সেখানকার জন্য ছবি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছি। অন্য ছবি দেখতে এসেছিলাম। এসে দেখলাম আমার সেই যৌবনে দেখা গঙ্গার ছবিগুলি তেমনি দেয়ালে টাঙানো আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তখন বেশি টাকা ছিল না। আমি কয়েকটি ছবি তখনই কিনে নিয়ে গেলাম। কয়েকদিন পরে বাকি ছবি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

কয়েক বছর আগে মণীন্দ্রলাল বসুকে দেখলাম ময়দানে বইমেলায়। এখন বয়স হয়ে গিয়েছে। আমাদের বালক বয়সে এবং প্রথম যৌবনে মণীন্দ্রলাল বসু বিখ্যাত রোমান্টিক লেখক ছিলেন। 'ভারতবর্ষ' এবং 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত ছোট গল্প এবং 'রমলা' উপন্যাসে তরুণ-তরুণীর মনোহরণ করেছিলেন। এক সময়

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ নিয়ে ভারতবর্ষে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। বছর কয়েক আগে যখন বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মরশুম, তখন একবার আমাকে বলেছিলেন, তিনি মোগলদের শেষ সময় নিয়ে একটি উপন্যাস লিখবেন। কাজে হাত দিয়েছিলেন কিনা জানি না।

যা লিখেছি তা থেকে বোধহয় বোঝা যাবে ছেলেবেলায় সাহিত্য ইতিহাস রাজনীতি, এই তিনটির আওতায় বড় হচ্ছিলাম। ইতিহাস আমার পেশা হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু সাহিত্যের আকর্ষণ পরিণত বয়সেও আমাকে একেবারে ত্যাগ করেনি। রাজনীতি ও রাজনৈতিকদের অনেক দেখেছি কিন্তু রাজনীতি কখনও আমাকে আকর্ষণ করেনি। অল্প বয়সে রাজনীতির যা ফল হয় তাই বোধহয় হয়েছিল, রাজনীতির ভালমন্দ সবই চোখে পড়ত। আমি দোতলার যে ঘরে থাকতাম তার সামনে ছোট রাস্তার উপরে একটি গ্যাসের আলো জ্বলত। গ্যাসপোস্টটি ঘিরে একটি লতা উঠেছিল। কখনও তাতে ছোট ছোট ফুল দেখা যেত। বৃষ্টির সন্ধ্যায় সেই গ্যাসবাতির গায়ে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে পড়ত। কিছুদিন আগে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি কবিতা বেরিয়েছিল, 'সার্সিতে জল সারেং বাজে'। আমার মনের মধ্যে সেই কবিতার সুর বাজত। কিন্তু স্বর্গোদ্যানেও সাপ থাকে, আমার বাগানেও ছিল। প্রায়ই দেখা যেত একটি লোক ঐ গ্যাসপোস্টের কাছে এবং সন্ধ্যা হলে একেবারে গ্যাসপোস্টের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকক্ষণ। তিনি কে ? এর উত্তর পেতে কষ্ট করতে হত না। তখন এরকম সতর্ক প্রহরী অনেক জায়গায় দেখা যেত। প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। অসুবিধা বুঝলে তিনি একটু দূরে সরে যেতেন অল্পক্ষণের জন্য। আবার এসে স্বপদে আসীন হতেন। একদিন সকালে একজন পুলিশ কর্মচারী বাড়ির মধ্যে উদয় হলেন। বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। কী হল জানি না, তারপর তিনি বললেন তিনি বাড়ির ঠিকানা ভুল করেছিলেন। তখন ঢাকায় একজন কংগ্রেসী নেতা ছিলেন—নাম অতুলচন্দ্র সেন, তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর বাড়ি। বাড়ি চিনতে পুলিশের এত সহজে ভুল হয় জানতাম না। তিনি তারপর পাশের ঘরে এলেন এবং আমাকে নানারকম উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। ঘটনাটা অল্পের উপর দিয়ে গেল। বাংলার মুখ অল্প বয়সে আমি নানাদিক থেকে দেখেছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন চাকরি শুরু হল, তখন হিন্দুস্থান পার্কে পুলিনবিহারী সেনের বাড়িতে প্রতি রবিবার আমাদের একটি বৈঠক বসত। তার নাম হয়ে গিয়েছিল জিলিপি ক্লাব। যাঁরা আসতেন তাঁদের জিলিপি খাওয়ানো হত। সঙ্গে সিঙাড়া কচুরি থাকলে আপত্তি ছিল না। দুটি অলিখিত নিয়ম ছিল। এক, কারুর ভাল চাকরি হয়ে গেলে তিনি আর সদস্য থাকতে পারবেন না। দুই, মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। দুটি নিয়মেরই ব্যতিক্রম হয়েছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের যখন ভাল চাকরি হল, তাঁকে বিতাড়ন করার কথা ওঠেনি। যুদ্ধের সময় অনেকের বাড়িতে কাজ করবার লোক থাকত না। রবিবার দিনই লোক খোঁজবার সময়। অনেক স্বামী 'দেখি ঝি পাই কিনা' বলে বাড়িতে দু' পেয়ালা চা খেয়ে জিলিপি ক্লাবে এসে বসতেন। অনেক বেলা হলে তাঁদের স্ত্রীরা পলাতক

৯৬/১ ল্যান্সডাউন রোড

স্বামীদের খোঁজে বের হতেন। বেশিরভাগ সময় তাঁদের এখানেই পাওয়া যেত। গৃহিণীরা কখনও কখনও বাজারের শূন্য থলি হাতে পলাতক স্বামীকে আবিষ্কার করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন। প্রথম ও চিরস্থায়ী সভাপতি হয়েছিলেন ডঃ শচীন সেন। সাহিত্যিক বলে তাঁর পরিচয় ছিল। পাটনার 'ইণ্ডিয়ান নেশন' কাগজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের নাম নিজেই প্রস্তাব করেছিলেন। পুলিনবিহারী সেনকে আমরা সবাই মিলে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করেছিলাম। কারণ তাঁর বাড়িতেই সভা হবে, জিলিপি সিঙাড়া কচুরির খরচ তাঁরই দেওয়া উচিত। কেউ কেউ বলত, জিলিপি খাওয়া হয় বলেই 'জিলিপি ক্লাব' নাম। একথা ঠিক নয়। আসল অর্থ, সদস্যদের মধ্যে খানিকটা মিষ্টত্ব থাকতে পারে, কিন্তু জিলিপির মতো প্যাঁচও আছে। জিলিপি ক্লাবে কারা আসতেন? শচীন সেন, নীহাররঞ্জন রায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, নরেন্দ্র দেব, হিরণকুমার সান্যাল, ভবশরণ সরকার, বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, কানাইলাল সরকার, কবি অজিত দত্ত, রবি চক্রবর্তী। আর্যকুমার সেন, দু'একবার অমিয় চক্রবর্তী, কলকাতায় এলে শান্তিদেব ঘোষ। সব বিষয়েই আলোচনা হতে পারত, রাজনীতি ছাড়া। দশ বছরের বেশি জিলিপি ক্লাব নিয়মিত চলেছিল। সদস্যরা কেউ কেউ প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগোতে লাগলেন, কেউ কেউ কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন। আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু অনেক বাঙালির কাছে ব্যক্তিগত শোক মনে হয়েছিল। জিলিপি ক্লাব থেকে রেডিওতে অভিনয় করে সামান্য কিছু টাকা স্মৃতি তহবিলে দান করবার কথা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল 'রাজা ও রানী' অভিনয় হবে। সবাই জানেন 'রাজা ও রানী' এক ঘণ্টায় অভিনয় হওয়া কঠিন। রেডিও স্ক্রিপ্ট সেই জন্য কেটেছেঁটে করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় বলেছিলেন যে, দুটি কাহিনীকে এক করতে গিয়ে নাট্যাংশের ক্ষতি হয়েছে। স্ক্রিপ্ট লিখবার সময় সেই কথা মনে রাখা হয়েছিল। স্ক্রিপ্ট প্রধানত বিক্রমদেব ও সুমিত্রার কাহিনী। ইলাকে খানিকটা রাখা হয়েছিল। কিন্তু সুচিত্রা মিত্র হঠাৎ দল ছেড়ে চলে যাওয়াতে ইলাকে একেবারে ছেঁটে বাদ দেওয়া হল। এছাড়া আমাদের আর উপায়ও ছিল না। যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাধামোহন ভট্টাচার্য ও প্রমথনাথ বিশী। সুমিত্রার অংশ নিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের মীরা চট্টোপাধ্যায় ও কুমারের অংশে ছিলেন নির্মল চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া ছিলেন নরেন্দ্র দেব, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, তখনকার পরিচিত সাহিত্যিক আর্যকুমার সেন, তাঁর পত্নী ও করুণা সাহা। উল্লেখযোগ্য খবর হচ্ছে যে একটি ছোট অংশে ছিলেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে 'পথের পাঁচালী'র সর্বজয়া। মহুয়ার প্রথম কবিতা, 'ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু'—এইটিকে নাটকের সূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। কীরকম অভিনয় হয়েছিল সে আর নিজমুখে কী করে বলব।

এর অল্প পরে স্টেজে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় আয়োজন করা হল। দু'দিন অভিনয় হয়েছিল উত্তর কলকাতার নাট্যমন্দিরে আর একদিন হয়েছিল দক্ষিণ

কলকাতার কালিকা থিয়েটারে। অভিনয় করেছিলেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, চারুপ্রকাশ ঘোষ, অরুন্ধতী দেবী, দেবকুমার চৌধুরী ও তাঁর গৃহিণী কল্যাণী মুখোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ রায়ের ভাবী পত্নী বিজয়া দাস।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের কথা আগেও বলেছি। জিলিপি ক্লাবের সদস্য ছিলেন, এখনকার ভাষায় সক্রিয় সদস্য। একসময় মেদিনীপুরে কংগ্রেসের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা প্রথমে কী করে আরম্ভ হল মনে নেই। হয়তো জিলিপি ক্লাবের জন্য। অনেক বছর আগে তিনি যখন হিন্দুস্থান রোডে থাকতেন, তখন তাঁর এক পুত্রের কঠিন ব্যাধি হয়েছিল। সেই সময় প্রায় প্রতি দিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়িতে গিয়ে বসেছি। আমি যখন প্রথম ছেলেমেয়েদের পাঠ্যবই লিখতে আরম্ভ করি তখন তিনি অনেক সন্ধ্যায় আমার পাঠ্যবই লিখবার প্রথম প্রচেষ্টা ধৈর্য ধরে শুনেছেন। এখন তাঁর পরিণত বয়স, স্বাস্থ্যও ভাল নয়। কিন্তু এখনও পূর্বেকার মতো মিষ্টভাষী ও মিষ্টান্নপ্রিয়।

শিশিরকুমারের 'সীতা' প্রথম অভিনয়ের পনের বছর পরে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এর মধ্যে পুরনো থিয়েটারের দলের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কেবল পুরনো দিনের কোনো কোনো অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম নতুন দলের প্রাচীরপত্রেও দেখা দিত। আগে যাঁরা প্রধান নট ও নটী সাজতেন তাঁদের কারুকে কারুকে ছোট ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছি। স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে, এদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। পুরনো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে প্রাচীন খ্যাতিমান নাট্যকারকে দিয়ে নাটক লিখিয়ে অভিনয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। লিখতে গিয়ে অমৃতলাল বসুর 'যাজ্ঞসেনী' নাটকের কথা মনে পড়ল। খুব ঘটা করে আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু অল্পদিনেই বন্ধ হয়ে গেল। নীল রঙের জমিতে সুদৃশ্য অক্ষরে ছাপা দেওয়ালে মারা পোস্টারের কথা মনে আছে।

অগ্রবিজ্ঞাপনী/ নাট্যযজ্ঞে যাজ্ঞসেনী/ অমৃতভাষিণী মিনার্ভার/

বিজ্ঞাপনের ভাষা এখন একটু খটমট মনে হলেও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে মনে হত না। খুব প্রচারও হয়েছিল। নাটকটির ভাষাও তখনকার দর্শকের মনোহরণ করেনি। কাজেই অমৃতলাল বসুর নাম সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ দেখতে পেলেন, 'পাবলিকে নিলে না।' এই কয়েক বছরে অভিনয়মঞ্চে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। শুধু যে অভিনয়ের ধরন বদলে গেল তা নয়, অন্য রকমের দর্শকও নিয়মিত থিয়েটারে আসতে লাগল। শিশিরকুমারের জন্যই এই পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু সে-সুবিধা শিশিরকুমার ধরে রাখতে পারেননি।

স্টার থিয়েটারের 'চিরকুমার সভা' কিংবা 'গৃহপ্রবেশ' বাংলা অভিনয়ের ধারাকে নতুন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকেও যে ফিরে আসা সম্ভব, পরবর্তীকালে অভিনয়মঞ্চগুলি তা প্রমাণ করে দিয়েছে। বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র অভিনীত 'নবান্ন' রসিক লোকের অসংখ্য সাধুবাদ সত্ত্বেও হাতিবাগানের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সে সময় যাঁদের

লেখা বই বেশি অভিনীত হত, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত এবং আরও কিছু পরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের নিজের লেখা নাটক সংখ্যায় কম। 'দুই পুরুষ' অনেকদিন ধরে অভিনীত হয়েছিল। অন্য নাটকটির ভাগ্য সেরকম প্রসন্ন ছিল না। যুদ্ধের সময় স্টার থিয়েটারে মহেন্দ্র গুপ্তর লেখা নাটক কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার নাট্যরূপ এবং শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস থেকে দেবনারায়ণ গুপ্তর নাটক অনেকদিন ধরে চলেছিল। তখন থিয়েটারে টিকিট কিনতে হলে বেশি কষ্ট হত না, বিশেষত যতদিন জাপানি আক্রমণের ভয় ছিল। সেই সময়কার মহেন্দ্র গুপ্তর অভিনীত অনেক নাটক দেখেছিলাম। 'রাজসিংহ' দেখে ভাল লেগেছিল অনেকটা গল্পের গুণে। অভিনেতারাও গুণপনা দেখিয়েছিলেন। অভিনেত্রীদের কথা বলতে চাই না। 'শকুন্তলা' দেখে হতাশ হয়েছিলাম। কণ্বমুনির আশ্রমের দৃশ্যে একটি হরিণ বাঁধা থাকত। ধর্মতলার মোড়ে কোনো ফলওয়ালার দোকানেও একটি হরিণ বাঁধা থাকত। আমাকে একজন বলেছিল 'শকুন্তলা' অভিনয়ের সময়ে ঐ হরিণটি ভাড়া করে কণ্বমুনির আশ্রমে নিয়ে আসা হয়। আমাকে মিলিয়ে দেখতে বলা হয়েছিল 'শকুন্তলা' অভিনয়ের সময় হরিণটি ফলওয়ালার দোকানে বাঁধা থাকে কি না। কখনও মিলিয়ে দেখা হয়নি। এর কিছুদিন পরে তারাশঙ্করের উপন্যাসের নাট্যরূপ মহেন্দ্রবাবু অভিনয় করেছিলেন। ভালমন্দ বলতে চাই না, কিন্তু জনপ্রিয় হয়েছিল বলাই ঠিক হবে। শিশিরকুমার শেষ বয়সে যেসব নাটক অভিনয় করেছিলেন তার কোনোটিই দীর্ঘজীবী হয়নি। এই সময়কার তাঁর অভিনীত ভাল নাটক তখৎ-ই-তাউস। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর লেখা ঐতিহাসিক নাটক, আর্ভিনের 'লেটার মুঘল্‌স' থেকে গল্পাংশ গ্রহণ করা। এই বোধহয় এযুগের একমাত্র ঐতিহাসিক নাটক, যা ইতিহাসের দিক থেকে ত্রুটিবিহীন। প্রযোজনার একটি বড় ত্রুটি ছিল, তার জন্য নাট্যকার দায়ী নন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে যোগ দেবার আগেই ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের কাজে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। ১৯৩৬ সালে পুনা শহরে এর সূচনা হয়। পরের বছর থেকে আমি এর বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিতে আরম্ভ করি। ইতিহাস কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন এলাহাবাদের স্যার শাফায়াত আহমেদ খান, ডঃ তারাচাঁদ, কলকাতার অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পুনার মহামহোপাধ্যায় দত্ত বামন পোতদার। আরও কয়েকজন প্রথম থেকে জড়িত ছিলেন, যেমন আলিগড়ের অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব। যে সব ঐতিহাসিকরা নিয়মিতভাবে এর অধিবেশনে যোগ দিতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ কালীকিঙ্কর দত্ত, ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ডঃ পি এম যোশী, ডঃ ভি জি হাতলকর, ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ জি এম মোরায়েস, ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, ডঃ বসন্ত রাও, ডঃ শশিভূষণ চৌধুরী, ডঃ বিনয়চন্দ্র সেন, কুমার রঘুবীর সিং, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত। কখনও কখনও নীহাররঞ্জন রায়। এঁদের মধ্যে অনেকে এখন নেই। ইতিহাসের অধ্যাপক নন অথচ ইতিহাসের অনুরাগী এমন কয়েকজনের

নাম মনে পড়ছে—ডঃ সুকুমার সেন, শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীপদরাও টিকেকর, ভি জি দিঘে ও মহাশ্বেতা দেবী। বহু অধিবেশনে সুকুমার সেন ও টিকেকর যোগ দিয়েছেন।

গবেষণার কাজের জন্য আমাকে মাঝে মাঝে মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুদের সাহায্য নিতে হত। কলকাতায় বসে মহারাষ্ট্রের সাহিত্য ও ইতিহাসের সব খবর পাওয়া কঠিন। কারুর সাহায্য দরকার হয়। মহারাষ্ট্রে আমার বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা কম ছিল না। শ্রীপদ রাও টিকেকর নিজে ঐতিহাসিক নন। তাঁর পরিচয় এই যে, তিনি প্রধানত সাংবাদিক। তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার বহুদিন পূর্বে একটি বন্ধনসূত্র রচিত হয়েছিল। সে-বয়সে যতবার বোম্বাই ও পুনা গিয়েছি, তিনি আমার দিক্‌দর্শনে সাহায্য করেছেন। কয়েক বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সেই ক্ষত শুকোয়নি।

আমার সহপাঠী শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কথা এই সূত্রে বারে বারে মনে পড়ছে। তিনি আইনের লোক হলেও মূলত সংস্কৃতজ্ঞ। আরও নানা বিষয়ে তাঁর

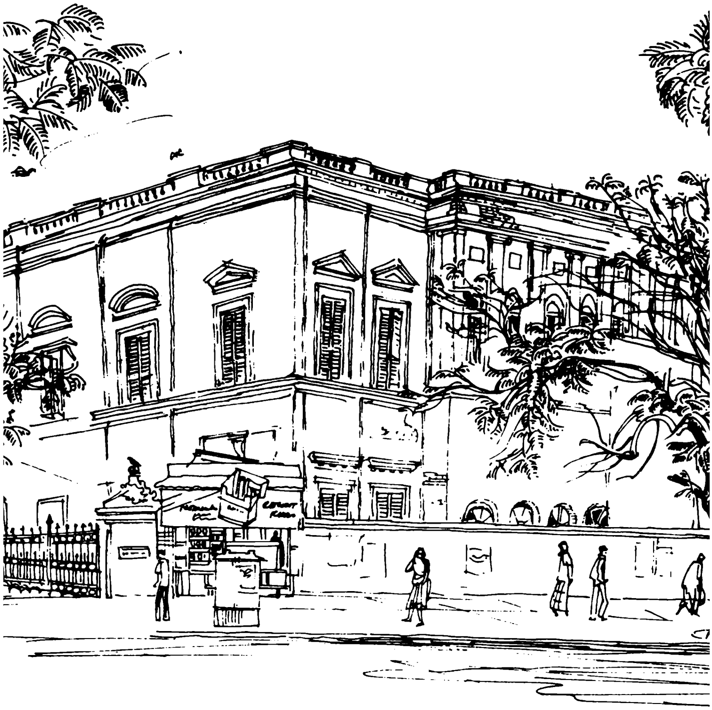

এশিয়াটিক সোসাইটির পুরনো বাড়ি

অধিকার ছিল। তিনি ইতিহাস কংগ্রেসে যোগ দিয়ে এর একজন উৎসাহী সদস্য হয়ে দাঁড়ালেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে যাবার সময় আমাদের রেলের বগি জোগাড় করা ইত্যাদি কাজে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। ইতিহাস কংগ্রেস ছাড়া তিনি মৃগাঙ্কমৌলি বসুর সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির অনেক উপকার করেছিলেন। মৃগাঙ্কমৌলি বসু বিশ্বভারতী ও এশিয়াটিক সোসাইটি, এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে অনেক সাহায্য করেছিলেন।

তিন দিনের অধিবেশন হত। প্রথম দু'এক বছর পুজোর ছুটিতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসত। তারপর থেকে বড়দিনের ছুটিতে সরিয়ে নেওয়া হল। প্রায় সব ঐতিহাসিক আসতেন, কেবল একজনকে আমরা পাইনি। তিনি স্যার যদুনাথ সরকার। তিনি ইতিহাস কংগ্রেস এবং যাঁরা এর সঙ্গে জড়িত তাঁদের কয়েকজনকে বিশেষ পছন্দ করতেন না। তিনি একাধিক বার বলেছেন ইতিহাস সম্মেলনের এরকম 'তামাসা'য় তিনি বিশ্বাস করেন না। অনেকের মনে পড়বে এক সময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে একজন 'তিনদিনের তামাসা' বলেছিলেন। যাঁকে পেলে এই উৎসব পূর্ণ হত তিনিই অনুপস্থিত থাকতেন। আর একজনের কথা এই প্রসঙ্গে বলা যায়। তিনি খ্যাতিমান মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই। প্রথম কয়েক বছর ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক রাখেননি। জয়পুরে যখন অধিবেশন হয়, তখন তিনি মূল সভাপতি হয়েছিলেন।

প্রথম দিকে অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে অধিবেশনের সময় বিশেষ ধুমধাম হত। কোনো সরকার থেকে আমন্ত্রণ এলে তো কথাই নেই। বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ করলে খরচপত্র স্বভাবতই একটি হিসাব করে করতে হত। বিশ্ববিদ্যালয় কিছু দিতেন, বাকিটা চাঁদার টাকার ভরসা। ১৯৩৯ সালে কলকাতায় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। ঠিক দু'দিন আগে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় অধিবেশনে যোগ দিতে পারিনি। খুব জাঁকজমক হয়েছিল শুনেছি। লাহা পরিবারের বদান্যতার শেষ ছিল না। অনেক ঐতিহাসিকের সমাগম হয়েছিল। মূল সভাপতি হয়েছিলেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়, সেকথা আগে বলেছি। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ছ'সাত বছর পর থেকে আমি সহকারী কর্মসচিব ছিলাম। আমাদের বার্ষিক কার্যবিবরণী ও প্রবন্ধসংগ্রহ মুদ্রণের কিছু অসুবিধা হচ্ছিল। আমি সহকারী কর্মসচিব হবার পর থেকে কলকাতায় ছাপাবার ব্যবস্থা হয়। তখন শ্রীসরস্বতী প্রেস আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন। ১৯৫২ সালে গোয়ালিয়রে অধিবেশনের সময় কোনো-কোনো ব্যাপারে মতান্তর হয়েছিল। সদস্যদের মধ্যে অনেকে মনে করেছিলেন যদিও প্রতি বৎসর কর্মকর্তারা নতুন করে নির্বাচিত হন তাহলেও একই দল বারে বারে নির্বাচিত হয়ে আসছেন, এটা বাঞ্ছনীয় নয়। গোয়ালিয়র কংগ্রেসে এই নিয়ে কিছু মনোমালিন্য হয়েছিল। ফলে পরের তিন বছর আমি কর্মসচিব ও ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ডঃ বিশ্বেশ্বর প্রসাদ ও ডঃ বারাণসী প্রসাদকে পদত্যাগ করতে হল। এই ব্যাপারে যে তিক্ততা হতে পারত, তা হয়নি। তাঁরা

যতদিন জীবিত ছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। ভবিষ্যতে কেউ তিন বছরের বেশি কোনো পদে থাকতে পারতেন না। আমার পরে ডঃ কালীকিঙ্কর দত্ত তিন বছর কর্মসচিব ছিলেন, পরের তিন বছর ডঃ শিবপদ সেন।

আমার সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অনেকদিন যোগ নেই। ইতিহাস কংগ্রেস এখন অনেক বড় হয়েছে। অর্থকষ্টও আশা করি কম। সরকারি সাহায্য চাইলে পাওয়া যায়। আমরা সব সময় অর্থকষ্টে ভুগতাম। প্রথমদিকে যতদিন রাজামহারাজারা ছিলেন, তাঁদের রাজ্যে কোথাও অধিবেশন হলে সাহায্য করতেন। পরে সরকারি সাহায্যের জন্য চেষ্টা করতে হত। সব রাজ্যের সরকার এক রকম ব্যবহার করেন না। নামকরা ঐতিহাসিকদের অনেককেই আসতে দেখেছি। তাঁরা তিনদিন ধরে প্রবন্ধপাঠ, বক্তৃতা এবং নানা আলোচনায় যোগ দিতেন। যাঁরা বিশেষ আসতেন না, তাঁরা কখনও কখনও বলতেন, এই অধিবেশনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গবেষণার কতটুকু সাহায্য হয়! যাঁরা আসেন, তাঁরা তিনদিন আমোদআহ্লাদ করে ফিরে যান, এবং কেউ কেউ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হবার চেষ্টা করেন। আমার বিশ্বাস, এই ধরনের সমালোচনা অধিকাংশ সময় ঠিক নয়। চল্লিশ বছর আগে ভারতবর্ষের এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের পরিচয় এত গভীর ছিল না। যে কোনো অল্পবয়স্ক অধ্যাপকের কাছে ভারতবর্ষে কত বিভিন্ন বিষয়ে লেখাপড়া হচ্ছে এবং যে সব ঐতিহাসিকদের নাম শুনেছেন তাঁরা যুক্তিতর্ক দিয়ে একটি সিদ্ধান্তকে কীভাবে গ্রহণ করেন কিংবা বিশ্লেষণ করেন, তা বুঝবার জন্য এর চেয়ে ভাল উপায় আর ছিল না। এইভাবে এক প্রদেশের দ্বার অন্য প্রদেশের কাছে উদঘাটিত হয়েছে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ একসঙ্গে কাজ করার এমন উদাহরণ তখন আর কোথাও পাওয়া যেত না। যাঁরা অধিবেশনে যোগ দিতে আসতেন তাঁদের থাকার জন্য ভাল ব্যবস্থা করা সম্ভব হত না। কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ করে একই লোক প্রতি বৎসর অধিবেশনে যোগ দিতে আসছেন ভাবতে ভাল লাগছে। প্রত্যেক বছর অধিবেশনের সময় গল্পের মতো ঘটনা ঘটত। একটির কথা বলছি। আহমেদাবাদ অধিবেশনে যোগ দিতে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের আত্মীয় জি· সি· তাম্বে এসেছিলেন। তাম্বের বয়স হয়েছিল। তাহলেও কয়েক বছর পরপর আসতেন। সঙ্গে একটি কালো স্টিল ট্রাঙ্ক থাকত। সেই বাক্স আমরা কখনও খুলতে দেখিনি। আমরা প্রায়ই জল্পনা করতাম বাক্সের মধ্যে কী থাকা সম্ভব। ঝাঁসির রানীর পারিবারিক কাগজপত্র? যা দেখলে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের ইতিহাসের নতুন কথা জানা যাবে, না অন্য কিছু? আমরা জল্পনা করতাম যদি সত্যিই ট্রাঙ্কভর্তি ইতিহাসের দলিলপত্র থাকে, তবে সে সব তিনি কাকে দিয়ে যাবেন? আহমেদাবাদ পৌঁছে দেখি তাম্বে সাহেব প্রতিনিধিদের বাসস্থানে এসে উঠেছেন। তিনি অসুস্থ। তার দু'একদিন আগে মহাশ্বেতা দেবীও এসেছেন। তখন তাঁর ঝাঁসির রানীর বইয়ের কাজ চলছে। তার আগে চারপাশে কয়েকটি জায়গা ঘুরে এসেছেন। আমি দেখলাম তিনি অসুস্থ তাম্বের জন্য এক বাটি গরম দুধ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন। তাম্বে দু'দিনে অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। আমরা আশা করলাম কাগজপত্র শেষ পর্যন্ত মহাশ্বেতা দেবীর ভাগ্যেই

জুটবে। মহাশ্বেতা দেবী যে খুব বুদ্ধিমতী সে আমরা সবাই জানতাম। দেখতে দেখতে তাম্বে সাহেব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়ে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাম্বে সাহেব তাঁর বাক্স খুললেন না। কিছুদিন পরে মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। তাঁকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। তাম্বে সাহেবও কিছুকাল হল গত হয়েছেন, কিন্তু কালো বাক্সের রহস্য এখনও পরিষ্কার হয়নি। কী ছিল, কেউ জানে না, কিছু ছিল কিনা তাও কেউ জানে না।

আর একটি কাহিনী বলছি। এর সঙ্গে ইতিহাসের যোগ নেই, কিন্তু ইতিহাস কংগ্রেসের আছে। ১৯৫৩ সালে ওয়ালটেয়ারে অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। আমরা দলবেঁধে আলাদা বগি করে গেলাম যেমন প্রায়ই যাওয়া হত। আগেই ঠিক করেছিলাম প্রতিনিধিদের শিবিরে না উঠে আমরা চারজন একটা হোটেলে উঠব—ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশিমবাজারের সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও তাঁর স্ত্রী এবং আমি। যে হোটেলে আমরা উঠেছিলাম, তার নাম শুনেই ঠিক করা হয়েছিল। শুধু এই জানতাম যে, হোটেল সমুদ্রের ধারে। হোটেলের ঘরভাড়া ইত্যাদি তখনকার হিসাবে সস্তা নয়। কাজেই ভেবেছিলাম খারাপ হবে না। হোটেলের কাছে পৌঁছে আমাদের সব উৎসাহ নিবে গেল। বড় রাস্তা থেকে পিছন দিক দিয়ে ঢুকতে হয়। মনে হল বিলাতে পুরনো গোলাবাড়ির ভিতর ঢুকছি। মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দোতলায় থাকবার ঘর। সেও মন ভোলাবার মতো নয়। ঘরের আসবাবপত্র সবই পুরনো এবং ছোট মাপের। এ সব জিনিসের এখন আর চল নেই। মনে হবে দেড়শো বছর আগে কেউ ভাঙ্গাচোরা আসবাব ফেলে দিয়েছিল, সে সব কুড়িয়ে এনে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া জলের অসুবিধা। মনে আছে নীচ থেকে বালতি করে জল এনে স্নান করতে হয়েছিল। হোটেলের একটি আলাদা অংশ আছে, সেটি নতুন একতলা বাড়ি। বারান্দার পরেই খাবার ঘর। স্নানটান করে খেতে গিয়ে সব দুঃখ ভুলে গেলাম। এত ভাল খাবার অনেকদিন খাইনি। ইংরেজরা দেশ থেকে চলে যাবার পরে বিলিতি রান্নার খুব তাড়াতাড়ি অধোগতি হয়েছে। চিকেন কারিকে বিদেশী খাবার বলা উচিত হবে না। আগে অনেক স্টেশনের রেস্টুরেণ্টে কিংবা রেস্তরাঁ কারেও ভাল কারি পাওয়া যেত। সে সব এখন স্মৃতিমাত্র। ওয়ার্লটেয়ারে হোটেলে বসে আমি ভাল খাবারের স্বাদ অনেকদিন পরে পেলাম। কোনোদিন খাবার সময় 'কারি' টেবিলে আসেনি। কিন্তু যা এসেছিল, মনে হল পুরনো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় বোধহয় এই রকম ভাল রান্না হত। প্রচলিত তিন কোর্সের বেশি, স্বাদ গন্ধ সবই মুগ্ধ করবার মতো। কোনো ম্যানেজার, কি সে রকম কাউকে দেখলাম না। একজন সর্দার খানসামা মনে হল হোটেল চালাচ্ছে। তিন দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। যেদিন চলে আসব, সেদিন ব্রেকফাস্টের পর খানসামা এসে বলল যে, হোটেলের মালিকের অনেক বয়স হয়েছে। তিনি উঠতে পারেন না। তিনি বলেছেন একবার যদি যাবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

গিয়ে দেখি চওড়া বারান্দা, তার সামনে কিছু ঝাউগাছ এবং ঝাউগাছের

পিছনে সমুদ্র। বারান্দায় ইজিচেয়ারে একটি দীর্ঘ মূর্তি শুয়ে, লম্বা দাড়ি এবং মাথায় দীর্ঘ চুল। একটি মোটা সাদা খদ্দরের লুঙ্গি পরা এবং একটি বড় খদ্দরের চাদর দিয়ে গা ঢাকা রয়েছে। বয়স অনেক হয়েছে। ভদ্রলোকের উঠে বসবার সামর্থ্য নেই। প্রথম দর্শনে মনে হল যেন সমারসেট মমের গল্পের কোনো চরিত্র। আমাকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম এইজন্য যে, শুনেছি আপনি বাঙালি, কিন্তু খাবার টেবিল থেকে ভাল পেঁপে এবং পুডিং ফেরত এসেছে। কোনো বাঙালি ফল ও মিষ্টি পছন্দ করে না এ আমি আগে দেখিনি।' আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাঁচির "ক্লেটন হোটেল'-এর নাম জানেন?' আমি বললাম, 'অবশ্য।' ভদ্রলোক বললেন, 'আমি সেই ক্লেটন। রিটায়ার করে এইখানে শেষ জীবন কাটাচ্ছি।' আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'হোটেল চালাচ্ছে কে? একটি সর্দার খানসামা ছাড়া তো আর কাউকে দেখলাম না।' ক্লেটন বললেন, 'আমার মেয়ে সব করে। সে এখন ইংলণ্ডে গিয়েছে।' ইজিচেয়ারের পাশে একটি টেবিলে একস্তূপ বই রাখা ছিল। ব্যবহারে জীর্ণ। দেখে মনে হয় সবই বোধহয় উনবিংশ শতাব্দীতে কিংবা বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ছাপা। তাতে হাত দিয়ে বললেন, 'এ সব বেশির ভাগই পাইরেসির গল্প। হিন্দুরা তো পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে, কিন্তু আমাদেরও যদি পুনর্জন্ম থাকে তাহলে ইচ্ছা করে পাইরেট হয়ে জন্মাব।' আমি হোটেলের বিলের অঙ্কটাকে স্মরণ করে মনে মনে বললাম যে এই জন্মেই পাইরেট হয়ে জন্মেছ। হোটেলের খরচ যেরকম বেড়েছে, তাতে আমার এরকম ভাবা বোধহয় উচিত হয়নি।

পরের বছর সত্যেন্দ্রনাথ সেনের ওয়ালটেয়ারে যাবার দরকার হয়েছিল। তাকে সেই হোটেলেই যেতে বলেছিলাম। সত্যেন ফিরে এসে খবর দিলে, বুড়ো ক্লেটন বেঁচে নেই। তাঁর মেয়ে আছে। সে হোটেল তুলে দিয়ে দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করছে।

আর একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত ছিলাম। সেটি ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন। এটি সম্পূর্ণ সরকারি ব্যাপার। তবে যাঁরা আধুনিক কালের অর্থাৎ ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের কাজের সুবিধা হয়। পূর্বে কলকাতা থেকে ব্যবস্থা হত। সরকারি মহাফেজখানা যখন দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন থেকে দিল্লির আপিস এর দেখাশোনা করে। কখনও রেকর্ডস কমিশন ও ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন প্রায় একসঙ্গে একই জায়গায় হয়েছে, কিন্তু ইদানীং সে রকম ব্যবস্থা করা আর সম্ভব হত না। এখানে স্যার যদুনাথ সরকার অধিপতি ছিলেন। পূর্বকালের রাজপুরুষরাও আসতেন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন দিল্লির মহাফেজখানার ভার নিয়ে যাবার পর মহাফেজখানার এবং রেকর্ডস কমিশনের খুব উন্নতি হয়েছিল। তিনি সৌরীন রায় প্রমুখ কয়েকজন সুযোগ্য সহকারীর সাহায্য পেয়েছিলেন। এই কমিশনের সদস্যদের মধ্যে অনেকে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের গবেষক বলে পরিচিত ছিলেন। এঁদের সাহায্যে মহাফেজখানা থেকে বহু বছর ধরে কিছু রেকর্ড সম্পাদনা করে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বে ইংরেজ আমলে যে ধরনের রেকর্ড সম্পাদনা হয়েছে, সম্ভবত সে কথা এঁদের মনে ছিল।

ছেলেবেলায় বাড়িতে দেখেছি সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা খণ্ড খণ্ড। তখন কখনও কখনও মনে হয়েছে যে, পুরনো পুঁথি অথবা রামায়ণের বিভিন্ন পাঠ প্রকাশ করবার দরকার কী। তখন অনেক জিনিস বুঝতাম না। সে বয়সে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, তবে পরিচয় মাত্র আরম্ভ হয়েছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর প্রথম সংস্করণের সঙ্গে এইভাবেই আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁর একটি গ্রন্থ, 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' স্কুলে পড়বার সময় দেখেছি। দীনেশচন্দ্র সেনের কোনো কোনো গবেষণাকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাজ যে কত মূল্যবান সে-কথা পরে বোঝা গিয়েছে। তাঁর লেখার প্রসাদগুণ সম্বন্ধেও দ্বিমত নেই। 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' নিয়ে দু'একটি গল্প চলিত আছে, সেগুলি প্রকাশ করা চলবে না। সাহিত্য সম্মেলনের কথাও প্রথম জানতে পারি বাংলা মাসিক পত্রিকা থেকে। ষাট-সত্তর বছর আগেকার মাসিক পত্রিকার যে প্রাপ্য পাওয়া উচিত, এখনকার পাঠকদের কাছ থেকে সে প্রাপ্য কখনও তাদের দেওয়া হয় না। তখনকার মাসিক পত্রিকায় সাহিত্য সম্পর্কিত লেখা ছাড়া ইতিহাস দর্শন ভ্রমণকাহিনী সবই পড়তে পাওয়া যেত। সাহিত্য-সম্মেলনের সঙ্গেও আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার পাতায়। ভারতবর্ষে, বোধহয় দ্বিতীয় বছরে, প্রকাশিত বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনের বিবরণী পড়ে ভাল লেগেছিল। সেবারকার সাহিত্য সম্মেলন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ ডেকেছিলেন। বিবরণীতে আদর-আপ্যায়নের বিশদ বর্ণনা ছিল। চায়ের সঙ্গে কী কী জলখাবার দেওয়া হয়েছে তাও লেখা ছিল। এসব পড়তে ছেলেবেলায় কার না ভাল লাগবে? আমি বড় হয়ে এক সাহিত্য সম্মেলনীতে গিয়েছিলাম এবং হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলাম। কারণ মূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসতে পারেননি। সেটি ভবানীপুর সাহিত্য সম্মেলনী, ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখন যেখানে গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল হয়েছে তখন সেখানে অনেকটা খালি জায়গা ছিল। এই সভা নিয়ে সরস্বতীর কমলবন কিঞ্চিৎ কর্দমাক্ত হয়েছিল। কাজেই কথাটা একটু খুলে বলা দরকার। আমি তখন এম· এ· ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। অধিবেশনের আগের দিন আপিস থেকে কার্ড আনতে গিয়ে শুনলাম অল্প গুঞ্জন হচ্ছে। কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন যে, কবি আসতে পারবেন না বলে নাকি খবর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলার বাইরে ছিলেন। কর্মকর্তাদের উত্তরে ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার হল না। পরদিন সভাতে উত্তেজনার আভাস ছিল। স্বয়ং মূল সভাপতি অনুপস্থিত। শ্রোতারা যাঁরা এসেছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কথা শুনবেন বলে এসেছেন। সভার উদ্যোক্তরা ভাব দেখালেন যে, তাঁরা এ-বিষয়ে কিছু জানতেন না, সব দোষ রবীন্দ্রনাথের। তিনি আসতে পারবেন না এ খবর জানাননি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শ্লেষ ও ক্ষোভ বর্ষিত হল। কিন্তু সভা সে রকম আর জমল না। গাণ্ডীবের টঙ্কার শুনতে এসে ছোটখাট অস্ত্রধারীদের বিক্রম দেখে মন ভরে না। পরদিনও গিয়েছিলাম। সেই প্রথম সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মশায়ের বক্তৃতা শুনলাম। এই সব গোলমাল যখন হচ্ছে তখন তার মূল কারণ কলকাতা থেকে

বহুদূরে। পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন, তিনি যে আসতে পারবেন না, একথা কর্তৃপক্ষকে আগেই জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মতো যারা তাঁর কথা শুনতে এসেছিলেন তাঁদের সেকথা বলা হয়নি। 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে উত্তর ছাপা হয়েছিল। কর্মকর্তারা কোনো প্রতিবাদ করেননি।

এর কয়েক বছর পরে সাহিত্য সম্মেলনীতে আবার যোগ দিয়েছিলাম। সে হচ্ছে চন্দননগর সাহিত্য সম্মেলন, ১৯৩৭ সাল। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথ চৌধুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, কিন্তু সভায় নয়, চন্দননগরে একটি নৌকায় তাঁর আবাস। কেউ কেউ দেখা করতে গিয়েছিলেন। আমার সাহসে কুলোয়নি। এর পরে সাহিত্য সম্মেলনীতে গিয়েছিলাম বোম্বাই শহরে। সেবার একই শহরে সাহিত্য সম্মেলন ও ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। প্রায় একই সঙ্গে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষে আমাদের দুটি অধিবেশনই দেখবার সুযোগ হয়েছিল। এখানকার বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে খুব ঐশ্বর্যের ছটা দেখেছিলাম এবং অনেক অবাঙালিকে এতে অংশ গ্রহণ করতে দেখেছিলাম। তার মধ্যে কেউ কেউ তখনকার সর্বভারতীয় রাজনীতির আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা। তাঁদের মধ্যে দু'একজন অবাঙালি বাংলায় বললেন। পরবর্তীকালে সাহিত্য সম্মেলনের প্রকার এবং চরিত্র অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। ১৩১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসম্মেলনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি ভাবমূর্তি কল্পনা করেছিলেন। তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিকাশের সময়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি আদর্শ চিত্র সর্বদা তাঁর মনে জাগ্রত ছিল। পরবর্তীকালে নানা কারণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর যোগ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। ১৩১২ সালে বরিশাল সাহিত্য সম্মেলনের নিমন্ত্রণপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সভার উদ্দেশ্য 'সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রীতিস্থাপন ও মাতৃভাষার উন্নতি সাধন।' রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে ঠিক একমত ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন সভা স্থাপন করে প্রীতিস্থাপন হয় 'তার প্রমাণ তো সর্বদা পাওয়া যায় না ; বরঞ্চ উল্টা হয় এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখানো যাইতে পারে।' রবীন্দ্রনাথ সাধুবাদের সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন যে-প্রদেশে সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হবে প্রধানত সেই প্রদেশের ইতিহাস, প্রাকৃত সাহিত্য, লোকবিবরণ ও তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হলে সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হয়। সাহিত্য সম্মেলনে এই কাজ যে একেবারে করা হয়নি তা নয়, কিন্তু সে-কাজ মন্থর। তাছাড়া দৃঢ়হস্তে এই কাজের ভার গ্রহণ এবং গবেষকদের চালনা করতে পারেন সেরকম সাহিত্য-নেতা দুর্লভ। সাহিত্য পরিষদ যন্ত্রটি কিঞ্চিৎ দুর্বল এবং সবসময়েই চালকের অনুরক্ত থাকে না। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসও অনেক কাজের ভার নিয়েছিল যা কেবল সদস্যদের একলার কাজ নয়, ইতিহাস পরিষদেরই কাজ ; সেই কাজও আশানুরূপ অগ্রসর হতে পারেনি। কারণ সম্ভবত একই। প্রথম অবস্থায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অর্থের অভাব বিশেষ ছিল না বলে মনে হয়। দেশের ধনীদের একাংশর বদান্যতা চিরকাল স্মরণীয়। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস সম্বন্ধে সে কথা বলা যেত না।

ইতিমধ্যে প্রায় দশ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি। বছর চারেক

পড়িয়ে আর কোনো বাড়তি সময় পাইনি। ইতিহাস কংগ্রেস ও রেকর্ডস কমিশনের জন্য কিছু লিখতাম। তার চেয়ে বেশি কিছু করা হয়ে উঠত না। সবাই জানেন যে, ইতিহাসের বই লিখবার পর সেই কাজের কিছু কিছু অংশ পড়ে থাকে, তখনই ব্যবহার করা যায় না। ক্ষেত থেকে ফসল কেউ নিয়ে গেলে তখন যেরকম শস্যের দানা ছড়িয়ে থাকে। পরে সে সব দিয়ে কিছু তৈরি করা সম্ভব হয়। আমার প্রথম বই 'বাজিরাও দি সেকেণ্ড অ্যাণ্ড দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সময়কার ফেলে রাখা ঐতিহাসিক মালমশলা যা হাতের কাছে ছিল, একটি বই লেখা যেত। দ্বিতীয় বাজিরাও যুদ্ধে হেরে ১৮১৮ সালে ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁকে বছরে আট লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়ে কানপুরের কাছে বিঠুরে সরিয়ে দেওয়া হয়। বিঠুরে তিনি ১৮৫১ সাল অবধি বেঁচে ছিলেন। নিরুদ্বেগ অলস জীবন, পূজা-পার্বণ করতেন। প্রাত্যহিক জীবন যে খুব পবিত্র ছিল, তা নয়। কিছু শুচিবায়ুগ্রস্থ ছিলেন। পালকিতে ঘটা করে তাঁর পেনসনের টাকা আসত। একবার কোনো কারণে পালকিটির স্পর্শদোষ ঘটে। বোধহয় কোনো নিচুজাতীয় লোক ভুল করে একে স্পর্শ করেছিল কিংবা তার ছায়া একে স্পর্শ করেছিল। বাজিরাওয়ের হুকুমে টাকাসুদ্ধ পালকি গঙ্গাজলে ডুবিয়ে রাখতে হল। পালকিটি সাধারণ পালকি ছিল না, ভূতপূর্ব পেশোয়ার খাস পালকি। ভিতরে ভেলভেটের গদি, সোনারুপোর কাজ করা পর্দা। গঙ্গাজলের স্পর্শে 'পেনসনে'র টাকা পবিত্র হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পালকিটি আবার ব্যবহার করা গিয়েছিল কিনা জানি না। এই দীর্ঘজীবী, সহায়হীন, বিস্মৃতপ্রায় বৃদ্ধ ত্রিশ বছরের উপর এইভাবে বেঁচেছিলেন। যত দিন যেতে লাগল, ইংরেজ সরকারের কাছে তাঁর কদর তত কমতে লাগল, কিন্তু সে কথা তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। গঙ্গার কাছে অনেকটা জায়গা জুড়ে তিনি তাঁর ইটের প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। সিপাহি যুদ্ধের সময় তার কাছে তাঁর দত্তক পুত্র নানাসাহেবের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল। একুশ বাইশ বছর আগে আমি একদিনের জন্য বিঠুর দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম সেই প্রাসাদ প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সমস্ত জায়গা জুড়ে অড়হরের চাষ হচ্ছে, সর্বত্র ইটের স্তূপ আর সাপের আস্তানা। এখানে যেতে গ্রামের লোকেরা আমাকে প্রথমে বারণ করেছিল। এ থেকে একটু দূরে গঙ্গার ধারে অনেক শিবমন্দির। হঠাৎ দেখলে বাংলাদেশের গঙ্গার ধারের শিবমন্দির বলে ভুল হয়। দ্বিতীয় বাজিরাওয়ের জীবন ঠিক ধর্মীয় জীবন বলতে এখন আমরা যা বুঝি তা ছিল না। অত মন্দির, কিন্তু একটিতেও সন্ধ্যার দীপ জ্বলে না। পূজা হয় না। গ্রামের একজন লোক আমাকে একটি মন্দির দেখিয়ে বলল, 'বাবুজি, গত সপ্তাহেও এখানে পূজারী ছিল। সে সাপ পুষত। সেই সাপ কদিন আগে তাকে কেটেছে।' এই কথা বলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবুজি, কখনও সাপকে বিশ্বাস করতে নেই। একদিন না একদিন তোমাকেও কাটবে।' মন্দিরের কাছে রামচন্দ্র রাওয়ের বাড়ি। রামচন্দ্র রাও পুনা শহরে পেশোয়ার দেওয়ান ছিলেন। পেশোয়ার সর্বনাশের পর তিনি তাঁর সঙ্গে এখানে চলে এসেছিলেন। এ বাড়ির অবস্থা অনেক ভাল। অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে ইংরেজ ও সিপাহি দুই দলের হাত

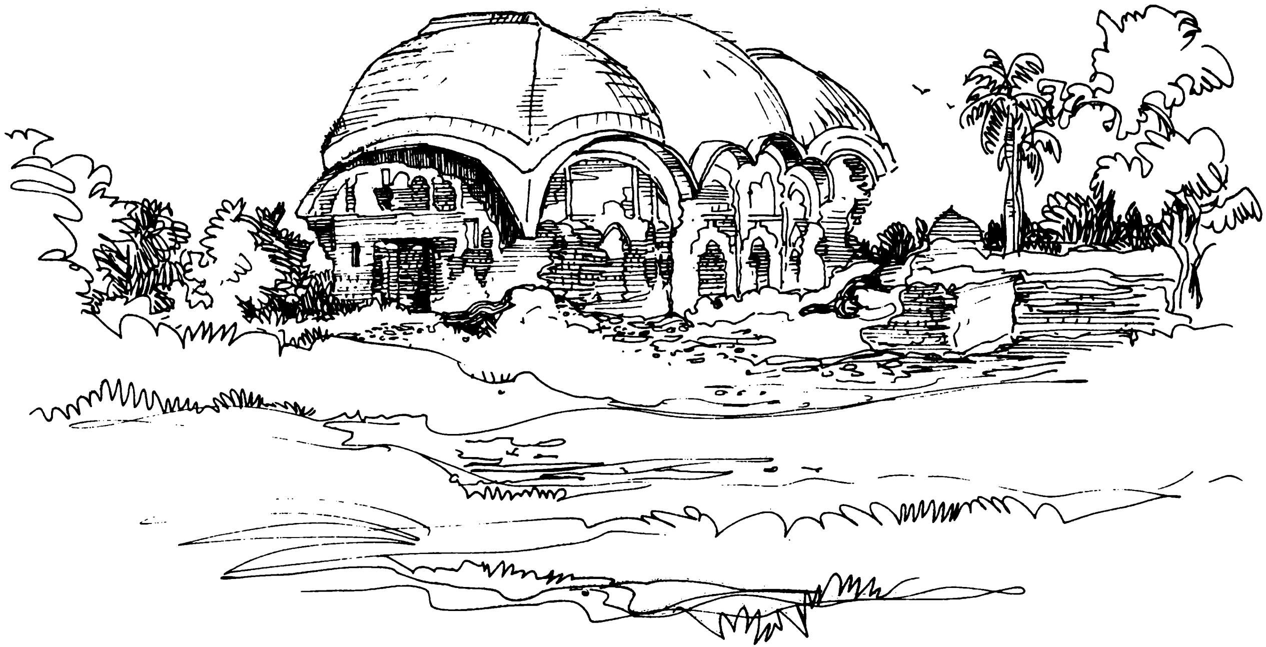

বিঠুরের মন্দির

থেকেই বেঁচেছে। শুনেছিলাম এই বাড়িতে একটি স্কুল করবার কথা হচ্ছে। এতদিনে নিশ্চয় হয়েছে।

ইতিহাস চর্চার সবটাই যে খুব নীরস তা নয়। কখনও কখনও বিনা পরিশ্রমেও ইতিহাসলক্ষ্মী করুণা করেন। আমার জীবনে একবার এরকম ঘটনা ঘটেছিল। সে কথা বলছি। এশিয়াটিক সোসাইটির নতুন বাড়ি তৈরি হবার আগেকার কথা। আমি তখন সোসাইটির সেক্রেটারি কিংবা পাবলিকেশন সেক্রেটারি, ঠিক মনে নেই। পুরনো বাড়ির দোতলায় কিছুদিন থেকে দেখছিলাম একটি বড় লম্বা ধরনের সিন্দুক পড়ে আছে। একটু ইতস্তত করে সিন্দুকটি খুলে ফেলা হল। বোধহয় সিন্দুকে চাবি দেওয়া ছিল না। বেশির ভাগই দেখলাম কর্নেল কলিন ম্যাকেঞ্জির কাগজপত্র। কলিন ম্যাকেঞ্জি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মাদ্রাজে এসেছিলেন। ১৮১৯ সালে সারভেয়ার জেনারেল অফ ইণ্ডিয়ার পদ পেয়েছিলেন। ইতিহাসের উপাদান হতে পারে এমন অনেক কাগজ, হাতে আঁকা ছবি তাঁর মৃত্যুর পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কিনে নিয়েছিলেন। তাঁর কিছু প্রবন্ধ এশিয়াটিক অ্যানুয়াল রেজিস্টার ও এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বেশির ভাগ কাগজপত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁর পরিবারের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। সামান্য কিছু ভারতবর্ষে ছিল। আমি যা দেখেছিলাম এর অংশ কিংবা তার নকল। ম্যাকেঞ্জির কাগজপত্র ছাড়া আর একটি কীটদষ্ট বাঁধানো খাতা আমার চোখে পড়েছিল। এটি পলিয়ারের লেখার পাণ্ডুলিপি। পলিয়ারের নাম অপরিচিত নয়। ম্যাকেঞ্জির মতো ইনিও কোম্পানির সামরিক বিভাগে এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁর কাজের সুনাম ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় কলকাতার ময়দানে নতুন ফোর্ট উইলিয়াম নির্মিত হয়। পলিয়ার সেখানেও কাজ করেছেন। গঙ্গার ধারে ওয়াটারগেট তিনিই তৈরি করেছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাহলেও তাঁর চাকরিতে বেশি উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। তার কারণ পলিয়ার খাঁটি ইংরেজ ছিলেন না। তাঁর রক্তে ফরাসি ও সুইস রক্তের মিশ্রণ ছিল। সে সময় ফরাসিরা ইংরেজের প্রধান শত্রু। উইলিয়াম ড্যানিয়েলের আঁকা একটি বিখ্যাত ছবিতে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে পলিয়ারের ছবি আছে। পলিয়ার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাজ ছেড়ে দিয়ে শাহ আলমের গোলন্দাজ বাহিনীতে চাকরি নিয়েছিলেন। কাজটা বুদ্ধিমানের মতো হয়েছিল কিনা সে অন্য প্রশ্ন। তখন শাহ আলমের অবস্থা ভাল ছিল না। কিছু দিন পূর্বে পাটনায় খাবার টেবিলের উপর বালিশ সাজিয়ে তাকে মসনদের চেহারা দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। তার উপরে বসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লিখে দিয়েছেন। তাঁর রাজ্য কমতে কমতে শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। দিল্লিতে একটি ছড়া প্রচলিত ছিল—

বাদশাহ শাহ আলম
দিল্লি সে পালম্।

বাদশাহ শাহ আলমের রাজ্য দিল্লি থেকে পালম গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত।

পালম গ্রাম শাহজাহানাবাদ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে, এখন যেখানে দিল্লির এয়ারপোর্ট। সেদিন পর্যন্ত এয়ারপোর্টে ঢুকবার সময় তার ভগ্নাবশেষ দেখা যেত। বাংলার ভূতপূর্ব নবাব মিরকাশিম যুদ্ধে হেরে গিয়ে দিল্লির কাছে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন। শাহ আলম মিরকাশিমের এত কাছাকাছি থাকা বিশেষ পছন্দ করতেন না। কিন্তু পলিয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন মিরকাশিমের উপর ভাল করে নজরদারি করবার। পলিয়ার লিখেছেন সকালে উঠে মিরকাশিম নিজের হাতে রান্না করেন। তারপর প্রায় প্রত্যহ নিজের কোষ্ঠী বিচার করেন। নিজের ভবিষ্যৎ গণনায় তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল। মিরকাশিমের জ্যোতিষগণনায় বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একটি উপন্যাসে নিপুণতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। মিরকাশিম মনে করতেন তাঁর দুর্ভাগ্য সাময়িক, বাংলার সিংহাসন তিনি আবার অধিকার করবেন। অনেক ভবিষ্যৎবাণীর মত এটিও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর যখন মৃত্যু হল, তখন তাঁর দেহের উপযুক্ত আবরণ হতে পারে এরকম কাপড়ও পাওয়া যায়নি। বলা বাহুল্য, পলিয়ারের লেখা ইতিহাসের বইটি সম্পাদনা করে খুব খুশি হয়েছিলাম।

শেষ বই দুটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন ইংরেজি বইয়ের চাহিদা খুব। কিন্তু বিক্রি করবার একটি সূত্র থাকা চাই। আমার ছিল না। যিনি আমার প্রথম বইয়ের প্রকাশক ছিলেন, তাঁর অখ্যাত লোকের বই নিয়ে ভাববার ইচ্ছা বিশেষ ছিল বলে আমার মনে হয় না। 'বাজিরাও দি সেকেণ্ড অ্যাণ্ড দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। সে বই বহুদিন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এ্যালায়েড পাবলিশার্স কিছু উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। বোধহয় যাঁরা এম. এ. পড়বার সময় কিংবা গবেষণার জন্য মহারাষ্ট্রের পতনের শেষ অধ্যায় খুঁটিয়ে পড়তে চাইতেন তাঁদের দরকার হত। দ্বিতীয় সংস্করণও বহুদিন পাওয়া যায় না। প্রকাশকের ইচ্ছানুসারে 'দি লাস্ট পেশোয়া অ্যাণ্ড দি ইংলিশ কমিশনার্স'-এর কিছু অংশ এই বইয়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা হয়েছিল। পলিয়ারের লেখা তো কারুর পরীক্ষার কাজে লাগবে না। যাঁর ঐ সময়কার ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়বার অনুরাগ আছে, শুধু তাঁরই ভাল লাগবে। পলিয়ারের বইটি ফুরিয়ে যেতে বেশি দেরি হয়নি। আমার কাছে এটা বিস্ময়কর মনে হয়েছে।

কোন্ বই বিক্রি হবে, কোন্ বই হবে না, সে কথা বলা সম্ভব নয়। তা নিয়ে ভেবে ফল নেই। একেবারে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য বইয়ের বাজার নেই ভেবেই লিখতে বসা উচিত। আমার লেখা অন্য বইয়ের কথা বলছি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে দিল্লির মহাফেজখানাকে পুরনো কাগজপত্র সম্পাদনা করিয়ে কয়েক খণ্ড প্রকাশ করবার ভার ভারত সরকার দিয়েছিলেন। তার একটি খণ্ড যখন আমাকে সম্পাদনা করতে দেওয়া হল, তখন আমার বয়স বেশি নয়। স্বভাবতই গৌরব বোধ করেছিলাম। যথাসাধ্য পরিশ্রম করে কাজটি শেষ হল। তারপর এর প্রুফ দেখতে এবং নির্ঘণ্ট তৈরি করতে সরকারের দশ বছর লাগল এবং বের হতে আরও কিছুদিন। এর পরে সরকারি কাজ করতে বললে উৎসাহ কমে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

এ তো তবু বই বের হতে দেরি হয়েছিল। আমার আর একটি অভিজ্ঞতা বিচিত্রতর। গল্পটা শুনলেই বুঝতে পারবেন সবার নাম প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আগে যে ঘটনার উল্লেখ করেছি, সে ভারত সরকারের ব্যাপার। এটি হচ্ছে বোম্বাই সরকারের। বোম্বাই সরকার এক সময় ঠিক করেছিলেন যে পুনা দরবারের রেসিডেন্টদের লেখা চিঠিপত্র এবং তাঁদের কাছে লেখা চিঠিপত্র সংগ্রহ করে কয়েকটি খণ্ড প্রকাশ কববেন। স্যার যদুনাথ সরকার ও ডঃ সরদেশাই এই কাজের ভার নিয়েছিলেন। স্যার যদুনাথ আমাকে ভার দিয়েছিলেন পেশোয়াদের শেষ সময়ের কিছু পত্র, অর্থাৎ যাকে সাধারণত এলফিনস্টোন পেপারস বলা হয়, সম্পাদনা করার। তখন খুব উৎসাহ করে কাজে নেমেছিলাম। ডঃ সরদেশাই কলকাতায় এসে একবার আমার কাজ দেখে গেলেন। তখন আমার কাজ শেষ হচ্ছে, একটি বড় ভূমিকা লেখা বাকি। ডঃ সরদেশাই যখন কলকাতায় এলেন, তখন আমি মুখবন্ধটিতে হাত দিয়েছি। ডঃ সরদেশাই ভাল করে দেখবেন বলে অনুরোধ করলেন আমি যেন আমার পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে দিই। ইতস্তত করেছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল কাজটি একেবারে সম্পূর্ণ হলে পাঠিয়ে দেব। শেষ পর্যন্ত যদুনাথেরও তাই ইচ্ছা বলে পাঠিয়ে দিলাম। বেশ কিছুদিন কোনো খোঁজ খবর নেই। ভাবছি ডঃ সরদেশাইকে চিঠি লিখে জেনে নেব আমার কাজ তাঁর পছন্দ হয়েছে কি না। একদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব বলে তৈরি হচ্ছি, এমন সময় বোম্বাইয়ের চিঠি এল। অবাক হয়েছিলাম বললে কম বলা হবে। চিঠির মর্ম এই—সরদেশাই জেনেছেন আমার শরীর খুব খারাপ, আমার পক্ষে বই শেষ করা সম্ভব হবে না। তিনি আমার আরোগ্য কামনা করেছেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, পাণ্ডুলিপি তিনি নিজের নামে প্রকাশ করবেন। এই চিঠি পড়ে আমার মেজাজ যৎপরোনাস্তি খারাপ হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে ডঃ সরদেশাইকে চিঠি লিখলাম। লিখলাম যে, নিজের নামে বইটি প্রকাশ না করে বইটি আমাকে ফেরত দিন। ইঙ্গিত দিলাম, যদি না করেন, তাহলে আইনের আশ্রয় নিতে আমি একটুও দ্বিধা করব না। স্যার যদুনাথ তখন দেরাদুনে ছিলেন। তাঁকে চিঠি লিখলাম যে, এই পাণ্ডুলিপি তাঁর নির্দেশে আমি ডঃ সরদেশাইকে পড়তে দিয়েছিলাম। এই ঘটনার পর তাঁর উচিত হবে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে আমাকে ফেরত দেওয়া। এই সব বাদানুবাদের কিছু চিঠি এখনও আমার কাছে আছে। স্যার যদুনাথ আমার উপর ক্রুদ্ধ হতে পারতেন, কিন্তু তা হলেন না। বরং জানালেন যে, তিনি চিঠি লিখবেন যাতে আমি পাণ্ডুলিপিটি তাড়াতাড়ি ফেরত পাই। তিনি চিঠি লিখেছিলেন কিনা জানি না, তবে পাণ্ডুলিপি আর ফেরত আসেনি। মুখবন্ধ আমি পাঠাইনি বলে বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এইসব কাগজপত্র এই সিরিজের বিভিন্ন খণ্ডে ছড়িয়ে আছে একথা মনে করবার কারণ আছে। কিছুদিন পরে ডঃ সরদেশাই আমাকে লিখলেন যে তাঁর 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি'র একটি পুরনো সংখ্যা দরকার হয়েছে। তার উত্তরে আমি একটি চিঠি লিখে পত্রিকাটি তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম। কয়েক বছর পরে জয়পুরে ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা

হল। সাধারণত তৃতীয় দিন অপরাহ্নেই এই সব অধিবেশন শেষ হয়ে যায় কিন্তু জয়পুরের অধিবেশন শেষ হতে দেরি হল। সেদিন রাত্রের গাড়িতে আমরা অনেকে জয়পুর থেকে ফিরে আসব ঠিক ছিল। মিটিংয়ের মাঝখানে আমার আসন থেকে ডেকে নিয়ে ডঃ সরদেশাই আমাকে বললেন, 'গুপ্ত, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, একটু পরে বলব।' আমি বললাম, 'এখন তো আর কথা বলবার সময় নেই, আমি একঘণ্টার মধ্যে স্টেশনে যাচ্ছি। আপনি বরং কলকাতার ঠিকানায় চিঠি লিখবেন।' তিনি একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'Gupta, there are things which one does not like to put on paper.' এরপর তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।

১৯৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করি সে কথা আগেই বলেছি। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ একুশ বছর সেইখানে ছিলাম। মাঝে সামান্য ছেদ পড়েছিল সেই কথা বলছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত সরকার একটি প্ল্যান করেছিলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভারতীয় সৈন্যদের ইতিহাস লেখা হোক। বড় কাজ। কয়েক খণ্ডে লেখা হবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইংরেজ সরকার ভারত সাম্রাজ্যের সৈন্য সম্বন্ধে ইতিহাস লেখার কাজ করেছিলেন। ভারত সরকার তাঁদের কাজের জন্য একটি দল তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে কিছু সেনাবিভাগের লোক এবং কিছু ঐতিহাসিক। এঁদের ডিরেক্টর ছিলেন ডঃ বিশ্বেশ্বর প্রসাদ। তিনি একবার কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কিছুদিন এই কাজে যুক্ত থাকতে রাজি আছি কিনা। আমি অবশ্যই রাজি হয়ে গেলাম। এই ধরনের কাজ করলে অনেক নতুন জিনিস শিখবার সুযোগ পাওয়া যায়। সিমলায় এর আপিস ছিল। আপিসকে বলা হত কম্বাইন্‌ড্‌ ইন্টারসার্ভিসেস। সেখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হল আমাকে যেন কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। আমিও চিঠি পেলাম আমি যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিমলা আসবার ব্যবস্থা করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ করতে গেলাম কবে যেতে পারব। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্তাব্যক্তি আমাকে বললেন তাঁরা আমাকে ছাড়তে পারবেন না, ছাড়লে কাজের ক্ষতি হবে। সরকার চাইলেই যে ছাড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। যিনি আমাকে একথা বললেন তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন না। কিন্তু শোনা যেত তিনিই আমাদের বিধাতা। তাঁর আদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ু প্রবাহিত হত এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হত। মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে এলাম। সিমলার আপিসে টেলিগ্রাম করে জানালাম কাজে যোগ দেবার কোনো সম্ভাবনা নেই। দিন চারেক পরে সিমলা থেকে একটি চিঠি পেলাম। তাতে লেখা আছে, 'বিশ্ববিদ্যালয় তোমার আসা মঞ্জুর করবে। কবে আসবে জানাও।' আবার সেই দ্বারভাঙা বিল্ডিং। সেই আগেকার ভদ্রলোক কথা বললেন কিন্তু অন্য রকম সুরে। বললেন, 'আমরা ভেবে দেখলাম তোমাকে আটকে রাখা উচিত হবে না। তুমি যত শিগগির পারো সিমলায় চলে যাও।' আমি বললাম, 'আমার ক্লাসের কী হবে ?' তিনি বললেন, 'সে সব ব্যবস্থা হয়েই যাবে, তোমার তার জন্য ভাববার দরকার নেই।' বাড়িতে

এসে দেখি সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে যে চিঠি পাঠিয়েছেন তার একটি প্রতিলিপি আমাকে পাঠানো হয়েছে। তাতে লেখা আছে আমাকে যেতে বাধা দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উচিত হয়নি। আমাকে পত্রপাঠ ছেড়ে দেওয়া হোক।

সিমলায় পৌঁছলাম সেপ্টেম্বর মাসে। আপিসে অনেক পুরনো বন্ধুকে দেখলাম। ডঃ বিশ্বেশ্বর প্রসাদের নাম আগেই বলেছি। তাছাড়া ছিলেন সুধীর গুপ্ত, নির্মলচন্দ্র সিংহ, কে· ডি· ভার্গব ও ডঃ ধরমপাল। প্রথম দু'জনকে অনেক আগে থেকেই চিনতাম। সুধীরবাবু একসময় বিশ্বভারতীতে পড়াতেন। নির্মলচন্দ্র সিংহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়াতেন। পরে ন্যাশনাল আর্কাইভসে কাজ করতেন। কে· ডি· ভার্গব ও ধরমপাল ন্যাশনাল আর্কাইভস থেকে এসেছিলেন। আমাদের দলে কয়েকজন পাঞ্জাবি, একজন পার্শি এবং দু'একজন দক্ষিণ ভারতীয় ছিলেন। সামরিক বিভাগের লোক। একজন বিদেশী ছিলেন। তিনি অস্ট্রিয়ান ইহুদি, ফটোগ্রাফির কর্তা। অনেক সময় সকালে তাঁর কাছে যেতে হত। একটি ছোট প্রেক্ষাগারে তিনি ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করতেন। যুদ্ধের ছবি, অর্থাৎ অস্ত্রের কী রকম ব্যবহার করা হয়, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যে-সব টুকরো ছবি বাইরে দেখবার সম্ভাবনা ছিল না তাও এখানে দেখি। সুভাষচন্দ্র কীভাবে সাবমেরিনে সিঙ্গাপুরে এলেন তার সংক্ষিপ্ত ছবিও দেখেছি। আমাকে বলা হয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির) ইতিহাস লিখতে।

সিমলায় যখন গিয়ে পৌঁছই, তখন সেপ্টেম্বর মাস। শীত সবে পড়তে শুরু করেছে। দিল্লি থেকে রাত্রে রওনা হয়ে পরদিন সকালে কালকা। সেখান থেকে সিমলা পর্যন্ত বাস, ছোট রেলগাড়ি কিংবা রেল-কার। আমাকে একজন উপদেশ দিয়েছিলেন প্রথমবার ছোটগাড়িতে যাওয়াই ভাল, পৌঁছতে বিকাল হয়ে যাবে কিন্তু সঙ্গেই জিনিসপত্র থাকবে এই সুবিধা। আমি তাঁর কথামতো ছোট রেলগাড়িতে উঠে বারোগ স্টেশনে ব্রেকফাস্ট সেরে বিকালের দিকে সিমলায় পৌঁছলাম। একা গিয়েছিলাম, কাজেই বাড়িঘরের কথা আর ভাবিনি। গ্র্যাণ্ড হোটেলে প্রায় দু' বছর কাটিয়েছি। গ্র্যাণ্ড হোটেল তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের সময়, সামরিক অফিসারদের জন্য। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর সামরিক বা অন্য কোনো অফিসারকেই সরকার ইচ্ছা করলে ওখানে জায়গা দিতে পারতেন। কিন্তু নিজের রান্না করবার উপায় ছিল না। কেটারারের রান্না খেতে হত। কেটারারের রান্না খাওয়া কখনও কখনও বিপজ্জনক। এখানে বোধহয় আর একটু বেশি বিপজ্জনক, তার পরিচয় পেয়েছি। বন্ধুবান্ধবকে এখানে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে পরদিন তারা কেমন আছে না জানা পর্যন্ত মনের অশান্তি দূর হত না। কেটারারকে বকলে যা উত্তর দিত তা প্রকাশ্যে বলা চলে না। এখান থেকে আমার আপিস, অর্থাৎ কম্বাইন্ড ইন্টারসার্ভিসেস দূরে নয়। তবে একেবারে সোজা নেমে যেতে হয়। খুব সুবিধা। আসবার সময় সে রকম সোজা খাড়াই।

পূর্বে বলেছি আমাকে বলা হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামীরা যে যুদ্ধ করেছিলেন তার বিবরণ লিখতে হবে, অর্থাৎ প্রচলিত কথায় আই· এন· এ-র ইতিহাস। আমি যখন আসিনি তখন সামরিক বিভাগের একজন

ক্যাপ্টেন কিংবা মেজর এই কাজ করতেন। তিনি ত্রিশ-চল্লিশ পৃষ্ঠা লিখেওছিলেন। আমাকে বলা হয়েছিল আবার প্রথম থেকে নতুন করে লিখতে হবে। আমাদের লেখা বিবরণকে সরকারি ভাষায় বলা হত ন্যারেটিভ। ঘটনার রিপোর্ট মাত্র, লেখকের মনের ছাপ এতে পড়বে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুভাষচন্দ্র বসু আসবার পূর্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। বিশেষ করে সিঙ্গাপুরে যেমন বিদেশি সামরিক কর্মচারীদের আসা-যাওয়া ছিল সে রকম স্বদেশী প্রচার প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল না। সেই সিঙ্গাপুরের এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবু ভাল করে দেখলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেকার কিছু-কিছু ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময় রাসবিহারী বসুর নাম ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খুব পরিচিত ছিল। মালয় ও সিঙ্গাপুরে নানা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাসবিহারী বসুর যোগ ছিল। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের একটি বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়াতে ভারতীয়রা অনেকে মনে করেছিল এই দুর্ঘটনায় বিদেশীদের হাত থাকা বিচিত্র নয়। যুদ্ধ যেভাবে দ্রুত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল তার জন্য ইংরেজরা একেবারে প্রস্তুত ছিল না। সিঙ্গাপুর তাদের হাত থেকে জাপানিদের হাতে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নতুন পরিবর্তন দেখা দিল। অনেকে ধরে নিয়েছিলেন যে, সিঙ্গাপুর জাপানিদের কাছে দুর্ভেদ্য বাধা হবে। এত সহজে যে সিঙ্গাপুরের পতন হবে এটা তাঁরা কল্পনা করতে পারেননি। জাপানিরাও ভেবেছিলেন কিনা সন্দেহ। জাপানিরা যখন সিঙ্গাপুর দখল করলেন তখন সব দোকানপাট বন্ধ। কেবল একটি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স খোলা ছিল। বলা হয় তারা যুদ্ধের সময় দোকান কখনও বন্ধ করেনি। জাপানিরা শহরের দখল নেবার আগে ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদ আন্দোলন বেশ কিছু বছর ধরে সিঙ্গাপুরে চলছিল। সিঙ্গাপুরের ডাক্তার, ব্যবহারজীবী, ব্যবসায়ী, প্রহরী, সাধারণ চাকুরিজীবীদের মধ্যে বেশ কিছু ভারতীয় ছিলেন। রাসবিহারী বসুর সঙ্গে এঁদের অনেকের যোগ ছিল। জাপানিরা আসবার আগে এখানে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্‌ডেনস্ লিগ বলে একটি সমিতি ছিল। তার কী উদ্দেশ্য ছিল নামেই প্রকাশ। জাপানিরা আসবার পর দ্রুত ঘটনার পরিবর্তন হতে লাগল। এর কিছু পরে সুভাষচন্দ্র বসু একটি সাবমেরিনে জার্মানি থেকে সিঙ্গাপুরে এসে উপস্থিত হলেন। তখন থেকে সুভাষচন্দ্রের কাজ হল যুদ্ধে বন্দী ভারতীয় সৈন্য ও অন্যান্য ভারতীয়দের নিয়ে একটি বড় বাহিনী গড়ে তোলা। প্রথমে এর সঙ্গে রাসবিহারী বসু ও ইণ্ডিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন মোহন সিং বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং এই আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে জেনারেলের পদ দেওয়া হয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর একসঙ্গে বেশিদিন কাজ করা সম্ভব হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই রাসবিহারী বসু সমস্ত ক্ষমতা সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে সমর্পণ করে জাপানে ফিরে গেলেন। মোহন সিংকেও সমস্ত কাজ থেকে সরিয়ে দিয়ে পরিশেষে বন্দী করে রাখা হল। আমি যখন সিমলায় তাঁকে ১৯৪৮/৪৯ সালে দেখি, আমার প্রায়ই একজন পরলোকগত দেশনেতার, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর, কথা মনে হত। দলের আরও কাউকে কাউকে দেখেছি। কিছুদিন আগে কর্নেল জি· এস· ধীলনকে কলকাতায় দেখলাম। সিমলায় যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন

তিনি যুবক ছিলেন, এখন পরিণত বয়স। তাহলেও মন সেরকম সজীব আছে।

কোনো কোনো সময় ঐতিহাসিকরা দুঃখ করেন যে, সব সময় ইতিহাস লিখবার যথেষ্ট মালমশলা পাওয়া যায় না। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সম্বন্ধে এই আক্ষেপের কোনো কারণ নেই। দু'একটি বিষয়ের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এখনকার যুদ্ধে আগেকার মতো হাতে লিখে বা টাইপ লিখে নির্দেশ দেওয়া হয় না। অনেক সময় যাকে খুব কনফিডেনশাল বলা হয় তারও অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটি সাইক্লোস্টাইল করা থাকে। বিপদের সময় যখন হুকুম হয় সব কাগজপত্র নষ্ট করে পিছু হটে যেতে, তখনও সব কাগজপত্র নষ্ট করা সম্ভব হয় না। কিছু কাগজপত্র হয়তো আগেই অন্যত্র পাঠানো হয়ে গিয়েছে। ঐতিহাসিকরা সে সব খুঁজে পান। এইভাবে 'গোপনীয়' কথাটি কখনও কখনও নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। সিমলায় কাজ করতে করতে এই অভিজ্ঞতা আমার অনেকবার হয়েছে। আমার হিসাবমতো দেড় বছরে আমার লেখার খসড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর পতন থেকে আরম্ভ করে সুভাষচন্দ্রের সাবমেরিনে সিঙ্গাপুর আগমন, সেনাবাহিনী ও ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেনস্ লিগের পুনর্গঠন, ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে ভারতে অভিযান এবং তাঁর শেষ বিমানযাত্রা। দু'একবার নতুন তথ্যের খোঁজে দিল্লি কিংবা কলকাতা আসতে হয়েছে। সরকারেরই কাজ, কিন্তু সরকার যে সর্বত্র সমান সহযোগিতা করেছেন তা নয়। আমার কাজ যখন খানিকটা হয়ে গিয়েছে তখন কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ জেনারেল কারিয়াপ্পা আপিস দেখতে এসেছিলেন। আমার ঘরে ঢুকে একটু অবাক হলেন, বোধহয় একজন সাধারণ অসামরিক ব্যক্তি, সামরিক বিভাগের নয়, এই কাজ করছে দেখে। মুখে বিশেষ কিছু বললেন না, শুধু ডিরেক্টরকে বললেন, 'হোয়াই আর য়ু ওয়েস্টিং অ্যান অফিসার অন দিস্ ?' তিনি চলে গেলে ডঃ বিশ্বেশ্বর প্রসাদ তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে দিতে বললেন। আমি যা অনুমান করেছিলাম, তিনিও তাই সন্দেহ করেছিলেন। তখন পাহাড়ে বসন্ত শেষ হয়ে গিয়ে গ্রীষ্ম দেখা দিয়েছে। আমার স্ত্রী কিছুদিনের জন্য সিমলায় কাটিয়ে গেলেন। তাঁর বন্ধুর অভাব হয়নি। স্নেহাংশুকুমার আচার্যের বোন অল্পদিনেই সখী হয়ে গেলেন। তিনি আর এখন নেই। আর একজন ছিলেন তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু, ডঃ নবগোপাল দাসের স্ত্রী উমা। আমার স্ত্রীর মতো তিনিও রংপুরের মেয়ে। সিমলার কাজ চুকিয়ে আসতে আমার প্রায় পৌনে দু'বছর লেগেছিল। সিমলার জলবায়ু আমার সহ্য হচ্ছিল না। সেটা সিমলার জলের দোষ, না গ্র্যাণ্ড হোটেলের রান্নার দোষ, জোর করে বলতে পারব না। দ্বিতীয়টি সত্যি হতে পারে। সিমলার আপিসে পূর্বপরিচিত অনেকে ছিলেন বলেছি। স্থানীয় বাঙালিদের মধ্যে একজন এঞ্জিনিয়ার ও একজন ডাক্তারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো চেনা মুখের সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে যেত। তাঁরা বসন্তের পাখির মতো অল্পদিনের জন্য বেড়াতে এসেছেন। গ্র্যাণ্ড হোটেলের খুব কাছে কালীবাড়ি। এখানে প্রবাসী বাঙালিরা বেড়াতে এসে কয়েকদিন থাকতে পারতেন। যাঁদের হাতে এটি চালাবার ভার ছিল, তাঁদের কর্তব্যে অবহেলা করতে দেখিনি। কালীবাড়িতে একটি ভাল রঙ্গমঞ্চ দেখেছি। সেখানে বাঙালি ছেলেরা সাধ মিটিয়ে অভিনয় করতেন।

তখন অবশ্য ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে অভিনয় করবার চলন হয়নি। সিমলায় আমি একবার বাঙালি মেয়েদের নিয়ে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' প্রযোজনা করেছিলাম। অনেক সময় শুধু ছোট মেয়েদের নিয়ে লক্ষ্মীর পরীক্ষা অভিনয় করা হয়। আমার বিশ্বাস তাতে ফল ভাল হয় না। সব চরিত্রের মুখের কথার ঠিক অর্থ ছোটরা সব সময় ঠিকমতো বুঝতে পারে না, অভিনয়ের সময় তাদের ঠিক প্রতিক্রিয়া হওয়া কঠিন। এই অভিনয়ে যিনি ক্ষিরি সেজেছিলেন তাঁর নাম এখন খুব পরিচিত। তিনি তখন গীতা গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন, এখন গীতা ঘটক। আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। তখন স্থানীয় কয়েকজন লোক আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। একজন মিউনিসিপ্যালিটির এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মিত্র, আর একজন ডাক্তার, ডাক্তার দাশগুপ্ত। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় মিলিটারি অ্যাকাউন্টস বিভাগে কাজ করতেন এবং বাঙালিদের যে-কোনো উৎসবে তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না। সেদিক দিয়ে সিমলা বাস আমার ভালই ছিল। শীত আমাকে কখনও কাবু করতে পারত না, কিন্তু জেনারেল কারিয়াপ্পার অপ্রসন্ন দৃষ্টি বোধহয় আমার পাণ্ডুলিপির পক্ষে শুভ হয়নি। প্রতিরক্ষা বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারি বিনয় ঘোষ তখন প্রায়ই সিমলায় আসতেন। তিনি আমার পাণ্ডুলিপি পড়ে খুশি হয়েছিলেন এবং তাড়াতাড়ি ছাপাবার জন্য আমাকে একটি ছবিসুদ্ধ প্রেসকপি করে দিতে বললেন। ভেবেছিলাম এই পাণ্ডুলিপির দশা বোম্বাইয়ের মহাফেজখানার কাগজপত্রের মতো হবে না। সেটা মনে করা ভুল হয়েছিল। সরকারি চালচলনের সঙ্গে তখনও অভ্যস্ত হইনি। শুনেছি এই পাণ্ডুলিপির প্রকাশ বিষয়ে বিনয়বাবুর উৎসাহ নানা কারণে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি। এর কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হল।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির কী হল এই নিয়ে বারে বারে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সময় লোকসভায় প্রশ্ন উঠেছিল। নেহরু প্রত্যেকবার জবাব দিয়েছেন, যথাসময়ে প্রকাশিত হবে। শেষবার যে-উত্তর তিনি লোকসভায় দিয়েছিলেন সেটা একটু অন্যরকম। তার অর্থ এই দাঁড়ায়—নানা রকম লোক মিলে এই ইতিহাস লিখেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তার মধ্যে একজন। মন্ত্রীরা আমাদের চেয়েও দুর্বল। তাঁদের হাতে যে উত্তর জুগিয়ে দেওয়া হয়, সেটি বলা ছাড়া তাঁদের আর কোনো উপায় থাকে না। সত্য-মিথ্যা যাচাই করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। যাই হোক, পাণ্ডুলিপি তৈরি হবার পরে আজ তিরিশ বছরের বেশি পার হয়ে গেছে। ইতিহাস অনেক কারণে নিরুত্তর থাকে।

কিরণকুমার রায়ের নাম এখন আর লোকের মনে পড়ে না। আমার সঙ্গেও তাঁর বেশি দিনের পরিচয় ছিল না। একটি মাসিক পত্রিকায় তিনি ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইডের অনুবাদ করেছিলেন 'আলো-আঁধারি' নাম দিয়ে। পড়ে ভাল লেগেছিল। তিনি পরিমল গোস্বামীরও বন্ধু ছিলেন। পরিমলবাবুর কোনো কোনো গ্রন্থে কিরণকুমার রায়ের উল্লেখ আছে। আমার সঙ্গে কিরণকুমার রায়ের পরিচয় হয়েছিল সিমলায়, অল্পদিনের জন্য।

একবার সিমলা থেকে ফিরে একটি যুবকের সঙ্গে পরিচয় হল, তার নাম

শোভন বসু। অল্পদিন পরে এম· এ· দেবেন। শোভন বসুকে এখন আর ঠিক যুবক বলা চলে না। সেই সময় থেকে অনেক কাজে তাঁর সাহায্য পেয়েছি। 'শরদিন্দু অমনিবাস'-এ তিনি আমার প্রধান সহায় ছিলেন। ছাপাখানার কাজে আমার লেখার চেয়ে তাঁর হস্তাক্ষরই বেশি পরিচিত।

কলকাতায় পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে রাস্তায় যত আলো ছিল এখন তার চেয়ে অনেক বেশি। বেওয়ারিস গাছপালা তো অনেকদিন অদৃশ্য হয়েছে। ভূতদের দারুণ অসুবিধা হয়েছে। এখন আর তাদের বেশি দেখা যায় না। ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রেতাত্মা বহুদিন আলিপুরের হেস্টিংস হাউসে আসা ছেড়ে দিয়েছে। অল্প দিন আগেও কোনো কোনো লোক পোড়ো বাড়ি কি রাস্তাঘাটে ভূত দেখতে পেতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রকম ক্ষমতাসম্পন্ন একজন অধ্যাপকের কথা আগেই বলেছি। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে আমাদের রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে এক সন্ধ্যায় ভূতের আসর বসিয়েছিলাম। নানারকম ভূতের গল্প হল। বক্তারা বললেন তাদের স্বচক্ষে দেখা। বাবা উপস্থিত ছিলেন। আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আরও কেউ কেউ ছিলেন, তাঁদের নাম মনে পড়ছে না। অনেক রাত পর্যন্ত ভূতের আসর চলেছিল। শেষের দিকে একজন বক্তা তাঁর দেখা কুকুর-ভূত, ঘোড়া-ভূত ইত্যাদির কথা বলতে লাগলেন। তখন সভা উশখুশ করতে লাগল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ভূতেরা যদি এসে থাকেন, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

অধ্যাপকদের কারুর কারুর ভূত দেখার একটু প্রবণতা আছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাঙালী অধ্যাপকের কথা জানি। তাঁর এমন ভূতের ভয় যে, এদেশে এলে রাত্রে ঘুমুতে পারেন না, একজনকে পাহারা দিতে হয়। তাহলেও ভূতদের সময় ভাল যাচ্ছে না—এই মনে করে অল্পদিন আগে বাড়িতে একটি আসর বসিয়েছিলাম। সুকুমার সেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সেদিনকার বক্তাদের মধ্যে একজন হিমালয়ের পাদদেশে কিন্নর-কিন্নরী দেখেছিলেন জানালেন। সভার কেউ কিছু বললেন না, কিন্তু মুখ দেখে মনে হল ঘটনাটি গ্রহণ করতে পারছেন না। আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁকে তাঁর বন্ধুরা 'ভূতের রাজা' বলেন। কিন্তু তাঁর রাজ্যের ভূত সেদিন দেখা দেয়নি।

১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকীর তোড়জোড় আরম্ভ হয়েছিল। শুনেছিলাম কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপক মিলে একটি স্মারকগ্রন্থ বার করবেন। তাঁদের নামও কাগজে বেরিয়েছিল। ১৯৫৭ সালে স্টেটসম্যান-এ একটি খবর প্রকাশিত হল যে, স্মারকগ্রন্থ লেখার কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। তখন ডঃ নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে এসেছেন। তাঁর স্বভাবতই ইচ্ছা হল পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখবেন। তখন আবিষ্কৃত হল কাজ এগোনো দূরে থাক, সাদা কাগজে কালির আঁচড় পড়েনি। উপাচার্য তখন আগেকার প্রবীণ অধ্যাপকদের কমিটি খারিজ করে স্মারকগ্রন্থ লেখার জন্য

একটি নতুন কমিটি গড়লেন। আগেকার মতো এই কমিটির সভাপতি থাকলেন ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় ও আমি দু'জনে স্মারকগ্রন্থের যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছিলাম। এছাড়া আরও ছ'জন সদস্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন। এই কাজ যখন হাতে এল, তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের মাস ছয়েক বাকি। আমাকে বলা হয়েছিল তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে বলে আমাকে ছ'মাস ক্লাস নিতে হবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অঙ্গীকার পালন করা হয়নি। কয়েকটি ক্লাস থেকে কেবল মুক্তি পেয়েছিলাম, বেশির ভাগ ক্লাস করতে হয়েছে। বাকি সময় আশুতোষ বিল্ডিং-এর তেতলায় একটি ছোট ঘরে আমরা কাজ করেছি। পরিচ্ছেদগুলি নিজেরা লেখা এবং অন্যদের দিয়ে লেখানো ছাড়া একজন ফটোগ্রাফারকে দিয়ে সব ছবি নতুন করে তোলা হয়েছিল। কাজ কিছুতেই সম্পূর্ণ হত না যদি না শ্রীসরস্বতী প্রেসের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যেত। পরলোকগত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের সাহায্য না করলে এ কাজ কখনও সম্ভব হত না। যথাসময়ে, অনুষ্ঠানের পাঁচ-ছ'দিন আগে, বইটি —Hundred Years of The University of Calcutta 1857-1956—প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইয়ে অনেক দুর্লভ ছবি আছে। অনেকে জানেন না মলাটে অধুনালুপ্ত সেনেট হলের ছবিটি সত্যজিৎ রায়ের আঁকা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বইটি প্রচার ও সমালোচনার জন্য পত্রিকায় পাঠাবার কোনোরকম চেষ্টা হয়নি। এতদিনে সংস্করণ শেষ হয়ে এসেছে। প্রবন্ধগুলির মান সর্বত্র সমান নয়। কিন্তু তাহলেও যাঁরা ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কথা জানতে চান তাঁদের কাজে লাগবে আশা করি।

সিমলা থেকে ফিরে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার পড়াতে শুরু করা গেল। কিছুদিনের মধ্যে জানা গেল যে, ইতিহাস কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন কলকাতায় বসবে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ করেছেন। এর আগে কলকাতায় অধিবেশন হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। এবার মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সর্দার কে· এম পানিক্কর। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন নিয়ে তখন দেশে নানারকম আন্দোলন চলছিল। এ সম্বন্ধে পানিক্করের সঙ্গে সবাই একমত ছিলেন না। আশঙ্কা ছিল ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ঢেউ এসে পৌঁছতে পারে। শেষ পর্যন্ত সেরকম কিছু হয়নি কেবল কলেজ স্ট্রিটে একটি ছোট মিছিল বেরিয়েছিল। তখন অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত উপাচার্য ছিলেন। তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৃতপক্ষে কোনো অর্থসাহায্য পাওয়া যায়নি। ১৯৩৯ সালে যখন ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল তখন সব খরচ মিটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচশো টাকা বেঁচেছিল। এবার বিশ্ববিদ্যালয় সেই পাঁচশো টাকা আমাদের দিয়ে সমস্ত দায় থেকে মুক্ত হলেন। ইতিহাস কংগ্রেসে কত খরচ পড়ে যাঁরা এর অধিবেশনে যোগদান করেছেন তাঁদের মোটামুটি ধারণা আছে। কাজেই আমরা বিপদে

পড়লাম। কলকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য আমরা কয়েকজন ছিলাম, যেমন ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শিবপদ সেন, ডঃ গোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী ও আমি। শিবপদ সেন আমাদের মধ্যে কমবয়সী। আমাদের চারজনের মধ্যে আমরা অনিলবাবুকেই বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ বলে মনে করতাম। আমরা অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করে প্রথম দিকে নিরাশ হয়েছিলাম। কিন্তু কলকাতার লোকের এইসব ব্যাপারে এত উৎসাহ যে, দশ টাকা চাঁদা দিয়ে তাঁরা ডেলিগেট হয়েছিলেন, তাতে অনেক টাকা উঠেছিল। আমার দু'জন যুবক বন্ধু মানবেন্দ্র সিংহ ও শৈলেন সেন, কিছু টাকা তুলে দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে এত টাকা সংগ্রহ করে দিলেন যে, আমাদের দুশ্চিন্তা ঘুচে গেল। শেষের দিকে আরও দু'একজন নানা জায়গা থেকে অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত, আর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি ভাষার অধ্যাপক নগেন্দ্র চন্দ। শেষের দিকে তখনকার শিক্ষা সচিব ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেনের সৌজন্যে রাজ্য সরকার থেকে অর্থসাহায্য পেয়েছিলাম। সে টাকা আমরা খরচ করতে পারিনি, ফেরত দেওয়া হয়েছে।

প্রথম দু'দিন সভাপতিদের অভিভাষণ পাঠ, প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ইত্যাদি হল। তৃতীয় দিন বাইরে থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কলকাতার দর্শনীয় জায়গা দেখানো হল। সকলেই জানেন দেখাবার মতো প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান কলকাতায় বেশি নেই। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম এবং আরও দু'একটি স্থান দেখিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটিতে এনেছিলাম। তখনও এশিয়াটিক সোসাইটির নতুন বাড়ি ওঠেনি। দু'জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ফোর্ট উইলিয়ামে ঢুকে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁদের লোক পাঠিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। দু'জনেরই যে রকম পাণ্ডিত্য, সে রকম ভোলা মন, কাজেই গুজব সত্য হওয়া বিচিত্র নয়। তাঁদের মধ্যে একজন মহামহোপাধ্যায় পি ভি কানে, আর একজন ডঃ এ ডি পুসলকার। এক সন্ধ্যায় শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ও শ্রীঅনাদি প্রসাদ বিনোদনে অতিথিদের মুগ্ধ করে রেখেছিলেন।

কলকাতা ইতিহাস কংগ্রেস উপলক্ষে আর একটি কথা বলবার আছে। সর্বত্রই ইতিহাস কংগ্রেসের সময় ঐতিহাসিক দলিলপত্র, মুদ্রা, তাম্রশাসন প্রভৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেবার অন্য অনেক জিনিসের সঙ্গে 'মহারাষ্টা পুরাণ'-এর পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। অনেকেই জানেন এই পাণ্ডুলিপি হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশে বর্গির হাঙ্গামার কাহিনী। নাগপুরের ভোঁসলা রাজার সৈন্যরা এসে পরপর কয়েক বছর ধরে বাংলা দেশকে উচ্ছন্ন করেছিল। পাণ্ডুলিপিকার গঙ্গারাম দত্ত কবি ভারতচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক। পাণ্ডুলিপিতে তারিখ দেওয়া আছে। নাহলে মনে হতে পারত যে, কাহিনীকার কবি ভারতচন্দ্রের পরবর্তীকালের লোক হতে পারেন। মহারাষ্টা পুরাণের কোনো কোনো জায়গায় ভারতচন্দ্রের লেখার ধরনের সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে। মহারাষ্টা পুরাণের সব খণ্ড পাওয়া যায়নি। হয়তো লেখাই হয়নি, কিংবা নষ্ট হয়ে

গিয়েছে। যে খণ্ডটি পাওয়া গিয়েছে তার বিষয় আলিবর্দির সভায় ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যা। সেকালে 'বঙ্গে বর্গি' বলে একটি নাটক খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রথম দিকে দানীবাবু এবং পরে নির্মলেন্দু লাহিড়ী ভাস্কর সাজতেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, একসময় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আমরা রাজপুতানার অধীন ছিলাম। পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্র নিয়ে এত নাটক লেখা হয়েছে যে, বাংলা নাটক সে সময় মহারাষ্ট্রের অধীন ছিল বললে দোষ হয় না।

ষাট-সত্তর বছর আগে প্রায় সব জেলায় মাঝে মাঝে প্রদর্শনী হত তাতে সব রকম জিনিস দেখতে পাওয়া যেত। এই রকম একটি প্রদর্শনীতে বড় সাইজের লাউ, কুমড়ো, বেগুনের সঙ্গে এই পাণ্ডুলিপিটিও প্রদর্শন করা হয়েছিল। উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম আমরা প্রায় ভুলেছি। তিনি সে সময় জেলাশাসক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মহারাষ্ট্রা পুরাণের খণ্ডটি উমেশচন্দ্র বটব্যাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেছিলেন। সেই খণ্ডটি কি এখনও সাহিত্য পরিষদে আছে ? প্রশ্ন করতে ভয় হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যে খণ্ডটি দেখেছি সেটি আশুতোষ মিউজিয়ামে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের মধ্যে ছিল। গায়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহর আছে। তাহলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যে খণ্ডটি থাকবার কথা সেটি কোথায় গেল ? এর একটি ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছে না।

মহারাষ্টা পুরাণ প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়। সম্পাদনা করেছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তাফী। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে সম্পাদনার কাজ সাহিত্য পরিষদের যোগ্য হয়নি। সন্দেহ হয় মুস্তাফী মহাশয় যত্ন করে পাণ্ডুলিপিটি পড়েননি। অথচ পাণ্ডুলিপিটি পরিষ্কার। কোনো কোনো পাঠে ভুল দেখা যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে মুস্তাফী মহাশয়ের যথেষ্ট পরিচয় ছিল না। 'দক্ষিণ ভারতে' একজন 'সাহু রাজা' আছেন। মুস্তাফী মহাশয় এ নিয়েও একটু সন্দেহের মধ্যে পড়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন, 'তাহলে ধরিয়া লওয়া যাউক সত্যই সেসময় দক্ষিণ ভারতে সাহু রাজা নামে সত্যই কেহ ছিলেন।' অর্থাৎ শিবাজির পৌত্র শাহুর অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তাঁর সন্দেহের অবকাশ ছিল। এখনকার গবেষকরা অনেক বেশি সাবধানী হয়েছেন।

ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনের কাজ মিটে গেল। এর কিছু পরে ১৮৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধের শতবার্ষিকী। আমি তখন এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঁচদিনের এক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল সোসাইটির পুরনো বাড়িতে। বক্তারা ছিলেন—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দেন, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ শশিভূষণ চৌধুরী ও আমি। সভায় এত শ্রোতা ও বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের সমাগম হয়েছিল যে বিস্মিত হয়েছিলাম। এই সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সিপাহি যুদ্ধ সম্বন্ধে গ্রন্থ ও পত্রিকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হয়েছিল। সিপাহি যুদ্ধ বাংলা দেশকে তেমনভাবে স্পর্শ করেনি। বাঙালিরা যত বড় স্বদেশপ্রমিকই হন না কেন, সিপাহি যুদ্ধের ঘটনাকে খুব অনুরাগের সঙ্গে দেখেননি। যাঁদের বাংলা দেশে চিন্তাধারার নেতা মনে করা হত তাঁরা তাঁদের মনের কথা লিখে গিয়েছেন। দু'একটি কিঞ্চিৎ হাস্যকর ঘটনা

সবারই মনে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও অল্প বয়সে সিপাহি যুদ্ধের নেতাদের সম্বন্ধে তিন-চারটি প্রবন্ধ লিখেছেন। বলেছিলেন আরও লিখবেন, কিন্তু সে প্রত্যাশা পূর্ণ করেননি। এদের মধ্যে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বাকি প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথ লেখেননি কেন ? সে কি উৎসাহ ফুরিয়ে গিয়েছিল ? না লিখবার যথেষ্ট কারণ মনের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিলেন না ? ১৯৫৭/৫৮ সাল থেকে পশ্চিম বাংলার ঐতিহাসিকরা সিপাহি যুদ্ধের উপর এত বেশি বই লিখেছিলেন যা আর কোনো রাজ্যে লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মশায়ের কথা সবাই জানেন। ডঃ শশিভূষণ চৌধুরী একটি বই লিখেছিলেন। আমার নিজেরও একটি বই লিখবার ইচ্ছা হয়েছিল এবং কাজও অনেকদূর এগিয়েছিল। তবে সব কাগজপত্র কিংবা পুরনো গ্রন্থ এদেশে পাওয়া যায় না। তার জন্য আমাদের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেই হয়। এদেশে যে সব ইতিহাসের মালমশলা পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করা শেষ হয়েছে এবং বইয়ের খসড়ায় হাত দেব মনে করছি এমন সময় আমার পুরনো কলেজ 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' থেকে একটি আমন্ত্রণ পেলাম। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার হাতে তখন কোনো অসমাপ্ত কাজ আছে কিনা। আমি তখন নানাসাহেব সম্বন্ধে বই লিখবার আয়োজন করছি—এই কথা জানা মাত্র তাঁরা বলে পাঠালেন যে, আমি এক বছর তাঁদের খরচে লণ্ডনে থাকতে পারি এবং বইয়ের খসড়া শেষ করতে পারি। একেবারে অপ্রত্যাশিত, এবং অদৃষ্টে বিশ্বাস করতে চাইলে এর চেয়ে ভাল উদাহরণ আর নেই। তখন আমার বইয়ের একটি পরিচ্ছেদের খসড়া লেখা চলছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কোনো আপত্তি করলেন না।

আমি ১৯৫৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে পৌঁছে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে যাতায়াত করতে লাগলাম। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের কথা। আমার দেখা লণ্ডনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগেও লণ্ডনের উত্তর অঞ্চলে হেনডন সেন্ট্রাল ও কলিনডেলে থাকতাম। এবার আরও উত্তরাঞ্চলে মাসওয়েল হিল-এ চলে গেলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এতদূর পর্যন্ত টিউব ছিল না। হেনডন সেন্ট্রাল থেকে বাসে যেতে হত। তখন এই অঞ্চল প্রায় পাড়াগাঁ, দেখতে বেশ সুন্দর, পিকনিক করার উপযুক্ত স্থান। অনেক পুরনো বাড়ি দেখে আমার দেশের কথা মনে হত, মনে হত এইসব বাড়ির সঙ্গে আমাদের কোথাও কোনো মিল আছে। অর্থাৎ বহুদিন আগে বিদেশ থেকে টাকা উপার্জন করে দেশে বাড়ি করলে যেরকম হয় সেইরকম। আমার কল্পনায় কোথাও কোনো সত্য ছিল কিনা জানি না। এবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যখন গেলাম তখন দেখলাম টিউব অনেক দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে এবং পুরনো মাসওয়েল হিল আর চেনা যাচ্ছে না। ইস্ট ফিঞ্চলে টিউব স্টেশনে নেমে যেতে হয়। আগে যেসব বাড়ি দেখে মন কেমন করত সেসব বাড়ির চিহ্ন মাত্র নেই। সেখানে ইউরোপীয় নানা দেশের এবং আমেরিকান ধাঁচে বাড়ি উঠেছে। একটি সুন্দর চওড়া রাস্তা, ফুলের গাছ, নাম লাবার্নাম অ্যাভিনিউ। অন্য পাড়ার লোকেরা রসিকতা করে বলত মিলিয়নেয়ার'স অ্যাভিনিউ। যাই হোক, মাসওয়েল হিলের যে-অংশে ছিলাম সে

অংশ আমার বেশ পছন্দ ছিল। পরে যতবার গিয়েছি, এই পাড়াতে ছিলাম। প্রত্যেকবার কিছু কিছু পরিবর্তন চোখে পড়েছে।

বাড়ি কি করে পাওয়া গেল তার একটি কাহিনী আছে, সে কথা বলি। পুরনো দিনে ছাত্রদের জন্য বাড়ি বলতে ল্যাণ্ডলেডির বাড়ি বোঝাত। ছাত্র ছাড়াও যাঁরা সংসার করেননি তাঁরাও কেউ কেউ এ রকম ব্যবস্থায় খুশি ছিলেন। শার্লক হোমস নিজেও একজন ল্যাণ্ডলেডির ভরসায় থাকতেন। যাঁরা অতদূর উঠতে চান না তাঁরা রবার্ট ব্লেকের ল্যাণ্ডলেডি মিসেস বার্ডেলের কথা মনে করতে পারবেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই প্রথা লোপ পেয়ে গিয়েছে। কোনো কোনো বাড়িতে অবশ্য খালি ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু নিজে রান্না করা ছাড়া উপায় নেই। আমার সে ব্যবস্থা পোযাবে না। কাজেই লণ্ডন ইউনিভার্সিটির কাছে একটি হোটেলে থেকে কোনো সুবিধামতো বাড়ি পাওয়া যায় কিনা চেষ্টা করছিলাম। অনেক খোঁজ করবার পর মাসওয়েল হিলে একটি বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। গৃহকর্ত্রী ব্রেকফাস্ট ও ডিনার দিতে সম্মত। যথেচ্ছ স্নানেরও অসুবিধা নেই। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় আমাকে বলল যে, আগে টেলিফোন করে দেখা যাক। আপনি একা সুবিধা করতে পারবেন না। হোটেলে আমার ঘর থেকে তারাপদ টেলিফোন করল। গৃহকর্ত্রী বাড়ি ছিলেন। তিনি বললেন, একটি বয়স্ক লোক পেলে তিনি নিতে অনিচ্ছুক নন। তারাপদ উত্তরে জানাল, সে একজন বয়স্ক লোককেই নিয়ে যাচ্ছে। এই বলে আমার নামের একজন কাল্পনিক নব্বই বছর বয়সের বৃদ্ধের বর্ণনা করল। ফল বিপরীত হল। গৃহকর্ত্রী ভয় পেয়ে বললেন, ভদ্রলোক হাঁটাচলা করতে পারেন তো? তারাপদ বলল, হ্যাঁ, তা পারেন। তারপর দিনক্ষণ ঠিক করে এক ছুটির দিন সকালে নটা-দশটায় যাত্রা করা গেল। উভয় পক্ষই একটু বিস্মিত হলাম। আমার আশ্চর্য হবার কারণ—পিয়ানোর উপর জয়পুরের মহারাজার ফটোগ্রাফ শোভা পাচ্ছে। আমার ভাবী গৃহকর্ত্রী আশ্চর্য হলেন এই দেখে যে, তারাপদ নব্বই বছরের বৃদ্ধের চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল, আমার সঙ্গে সে বর্ণনা মিলছে না। মিলবার কথাও নয়। ভাবী গৃহকর্ত্রী বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম অনেক বয়স হয়েছে।' তারাপদ বলল, 'হয়েছেই তো, কিন্তু সবসময় বোঝা যায় না।' আমি কথা বাড়ালাম না, যদি বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে যায়। এই বাড়িতে আমি এক বছরেরও বেশি ছিলাম। ভদ্রমহিলার স্বামী চাকরি করেন, দুটি ছেলে তখন স্কুলে পড়ে। এই নিয়ে সংসার। এখানে আমার নানাসাহেবের উপর বইটির কাজ শেষ করেছিলাম। তাছাড়া আরও অন্যান্য ছোট ছোট কিছু লিখেছিলাম। সকালে সবাই বেরিয়ে গেলে আমি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি রওনা হতাম। শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। রাত্রে কাজ সেরে ফিরতে আটটা-সাড়ে আটটা হয়ে যেত। সপ্তাহে তিনচার দিন বাইরে ডিনার খেয়ে বাড়ি ফিরেছি। এইসব কারণে খরচ বেশি পড়ত। বাড়িভাড়াও অপেক্ষাকৃত বেশি। তারাপদর স্ত্রী এমা আমাকে প্রায়ই বলত, তোমাকে ভালমানুষ পেয়ে বেশি টাকা নিয়ে নিচ্ছে। আমি অবশ্য তার সঙ্গে এই বিষয়ে একমত নই। এমা তখন সবে ডাক্তারি শুরু করেছে, কিন্তু দেখতে খুব ছেলেমানুষ মনে হত—যেন কলেজে

পড়ে। একদিন খুব বৃষ্টির পরে বাড়ি ফিরে দেখলাম এমা এসেছে। নীচে বসবার ঘরে ফায়ার প্লেসের পাশে ভিজে বেড়ালের মতো বসে আছে। পাশে গৃহকর্ত্রী একটা বড় তোয়ালে হাতে নিয়ে এমার লম্বা চুল শুকিয়েছে কিনা দেখছেন। সামনে শূন্য চায়ের পেয়ালা, চায়ের পট ইত্যাদি এবং একটা প্লেটে বড় হ্যামের টুকরোর ভগ্নাংশ। তারাপদ ও এমা প্রায়ই আসত সঙ্গে প্যারামবুলেটরে মেয়েকে নিয়ে।

সপ্তাহে একদিন বিকালে স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজে যেতাম। সেখানে অনেক চেনা ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা হত। কেউ কেউ দেশে আমার কাছে আগে পড়েছে। অধ্যাপকদের মধ্যেও কেউ কেউ পূর্বপরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'একজন আমার সঙ্গে পড়েছেন। তখন স্কুলের ডিরেক্টর ছিলেন অধ্যাপক সি এইচ ফিলিপ্স। তাছাড়া এখন যাঁর নাম ভারতবর্ষে খুব পরিচিত, সেই আর্থার ব্যাশাম যাঁর লেখা বই 'দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া' অনেকে পড়েছেন। ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তাছাড়া অধ্যাপক লিউইস, যিনি মধ্যযুগের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। নতুন অধ্যাপকদের মধ্যে বলহ্যাচেট তখন নাম করেছেন। নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন গ্রাহাম বেলী। নিজের শাস্ত্রের অধ্যাপনায় তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল, কিন্তু তাঁর মনের একাংশ পড়ে থাকত ডিটেকটিভ গল্পের দিকে। কাজ থেকে অবসর পেলে তিনি ডিটেকটিভ গল্প লিখতে আরম্ভ করবেন, একথা আমাকে প্রায়ই বলতেন। তাঁর অবসর নেবার সময় বোধহয় এখনও হয়নি। গোয়েন্দা কাহিনী লেখার উচ্চাভিলাষ এখনও আছে কিনা জানি না।

প্রথমবার যখন স্কুলের ছাত্র হিসাবে গিয়েছিলাম তখন বাংলার অধ্যাপক ছিলেন সাটন-পেজ। তিনি 'স্বর্ণলতা'র ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। যাঁরা ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতেন, তাঁদের সেই অনুবাদ পড়ে পাস করতে হত। এই ভদ্রলোক অনেকদিন শ্রীরামপুর অঞ্চলে কাটিয়েছিলেন। তখনকার ডিরেক্টর স্যার ড্যানিয়েল রস বছরে একবার কি দু'বার বড় পার্টি দিতেন। এইরকম একটি পার্টিতে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। আমি তখন তাঁকে চিনতাম না। একজন বৃদ্ধ ইংরেজ এগিয়ে এসে আমাকে বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, বাঙালী বলে মনে হচ্ছে ? তারপর বললেন, কোথা থেকে এসেছেন ? আমি বললাম, কলকাতা থেকে। তার উত্তরে তিনি বললেন, কলকাতায় আপনার বাসা না নিবাস ? ইনি এখন নেই। এরপরে যিনি বাংলার অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন, আনুমানিক ১৯৫৭/৫৮ সালে, তিনিও অতিশয় সজ্জন লোক ছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি দার্জিলিংএ কাটিয়েছেন। এক বছর পরে শিকাগোয় তাঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছিল।

শনি-রবি ছাড়া ইণ্ডিয়া অফিসের কাজের সময় সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা। শনিবার লাইব্রেরি অল্প কয়েক ঘণ্টা খোলা থাকে। অত কম সময়ের জন্য যাওয়া পোষাত না। সেদিন সাধারণত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়েছি। রবিবার কোথাও বেড়াতে যাবার চেষ্টা করতাম, বন্ধুবান্ধবের বাড়ি, তার অর্থ প্রায়ই তারাপদ আর এমার বাড়ি। একটি প্রিয় যাবার জায়গা ছিল গাওয়ার

স্ট্রিটের একটি বাড়ি। বাড়ি না বলে ঘর বলাই ভাল। ট্রপিকাল স্কুল অফ মেডিসিনের কাছে এক বাড়ির একতলায় অনেকগুলি ছোট ঘর। ঘরে রান্না করবার জন্য গ্যাসের রিং। এইরকম একটি ঘরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ছাত্র শৈলেন গুহ থাকতেন। ছোট ঘর, একদিকে টাইমস পত্রিকা জমা করে রাখা আছে, অন্যদিকে ভাত রান্না করবার প্যান বসানো রয়েছে। সুগন্ধি চালের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। আমি অনেক সন্ধ্যায় পুরনো টাইমস পত্রিকা পরিবেষ্টিত হয়ে গুহর রান্না খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছি। অন্নদানের কথাই যদি উঠল তাহলে বলি, আমার অন্নপূর্ণা ছিলেন এমা মুখোপাধ্যায়। তারাপদ বলত সে তার স্ত্রীর চেয়ে ভাল রান্না করে। কথাটা সত্যি হতেও পারে। কিন্তু আতিথেয়তা যাকে বলে, সে ব্যাপারে এমার সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। অনেক রবিবার বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওদের সঙ্গে কাটিয়েছি এবং প্রায়ই শেষ টিউবের আগে বাড়ি ফিরতে পারিনি। এই ব্যবস্থায় একটু অসুবিধা ছিল। তারাপদ ও এমার ভাব ও কলহ পূর্ণিমা-অমাবস্যার মতো পালা করে আসত। কখনও কখনও এই কলহের সময় আমাকে অনুরোধ করা হত মিটিয়ে ফেলতে সাহায্য করবার জন্য। সবাই জানেন এ কাজ সহজে হয় না। কলহ মিটতে অবশ্য বেশি দেরি হত না। কখনও কখনও কলহের মাত্রা বেশি হলে তারাপদ দু'তিন দিনের জন্য কোনও ছুতোয় শহরের বাইরে চলে যেত। আমাকে বলে পাঠাত যে, এমার মন খারাপ আছে, আপনি এসে খবর নিয়ে যাবেন। আর এমা যদি কোনো সিনেমা বা থিয়েটার দেখতে যেতে চায় তাহলে অবশ্যই নিয়ে যাবেন। এই ব্যবস্থার খুব অসুবিধা ছিল। ঝগড়ার পরে এমা প্রত্যেক মিনিটে বলত, 'তারাপদ একটি যথার্থ মহাপ্রাণ ব্যক্তি। সব লোক ওকে সহজে বুঝতে পারে না।' তারাপদ সেইরকম বলত, 'এমা আসলে একসঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। কেন যে ঝগড়া হয়!'

তারাপদদের সঙ্গে অনেকবার বেড়াতে গিয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে মনে আছে একবার ১৯৫৭ সালের শেষ কিংবা ১৯৫৮ সালের প্রথমে এপিং ফরেস্টে পিকনিক করবার কথা। সেদিন রবিবার। আমি যেখানে থাকতাম সেখান থেকে এপিং ফরেস্ট সহজেই বাসে যাওয়া যেত। কিন্তু কী কারণে মনে নেই আমরা গোলডার্স গ্রীন টিউব স্টেশনের সামনে থেকে বাস নিলাম। আগের দিন বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। রাস্তাঘাট ভিজে ভিজে, এপিং ফরেস্টে কোনো কোনো জায়গায় আগের রাত্রের বৃষ্টিভেজা গাছ স্যাঁত-স্যাঁত করছে। তাতে আমাদের আনন্দের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয়নি। মনে এবং বয়সে বৃদ্ধ না হলে এইসব অসুবিধায় অনেক সময় আনন্দ বেড়ে যায়। আমাদেরও তাই হয়েছিল। একটা ভিজে গাছের গুঁড়িতে বসে আগেকার রাত্রের তৈরি লুচি ও আলুর দম দিয়ে লাঞ্চ সারা হল। কিন্তু সেই লুচি ও আলুর দম খেয়ে মনে হল এমন মধুর জিনিস পূর্বে কখনও খাইনি এবং এখন মনে হচ্ছে পরেও কখনও খাইনি। আরও বড় দলে পরে নানারকম সুখাদ্য বহন করে এপিং ফরেস্টে গিয়েছি, কিন্তু এরকম সুখ আর কখনও হয়নি। এই রকম করে রবিবার লণ্ডনের কাছাকাছি বেড়িয়ে, শনিবার মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখে এক বছরের বেশি সময় কেটে গেল। বয়সের জন্যই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণে থিয়েটার এখনকার চোখে আর সে মোহ

লাগাত না। একটি থিয়েটারের কথা খুব স্পষ্ট মনে আছে। প্রথমবার জুলিয়াস সীজার দেখে যে রকম মনে হয়েছিল এও সেরকম অনুভূতি। সেদিন শনিবার। ইণ্ডিয়া অফিস থেকে বেরিয়ে আগাথা ক্রিস্টির 'মাউস ট্র্যাপ' দেখতে গিয়েছিলাম। একে শনিবার, তায় টিকিট করা ছিল না, সুতরাং দেখা হবে না ভেবেই গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম অদূর ভবিষ্যতে টিকিট পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এটা প্রকৃতপক্ষে থিয়েটার-পাড়া। ফিরবার পথে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কালিপদ দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা হল। তিনি একই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন। দু'মিনিট হাঁটলে ডিউক অব ইয়র্ক থিয়েটার। সেখানে অ্যারিস্টোফেনিসের নাটক Lysistrataঅভিনয় হচ্ছে। প্রধান ভূমিকায় জোন গ্রীনউড। শ্রীমতী গ্রীনউডকে অনেক ছবিতে দেখেছি। অ্যারিস্টোফেনিস ও শ্রীমতী গ্রীনউডের আকর্ষণে গ্রীক নাটকের অভিনয় দেখতে গেলাম। বাংলা কাগজে প্রায়ই 'বিমল আনন্দ' কথাটি পাওয়া যায়। আমাকে যদি কেউ 'বিমল আনন্দ' কিসে কিসে পেয়েছি জিজ্ঞাসা করে, তাহলে এই থিয়েটারের কথা অবশ্যই বলব। তবে অ্যারিস্টোফেনিসের এই নাটককে নির্মল আনন্দ বলা বোধহয় উচিত হবে না। অনেক কথা ধ্রুপদী নাটক বলে সেন্সর আপত্তি করেননি। 'মাউস ট্র্যাপ' আমার দেখা হয়নি, কিন্তু তার জন্য দুঃখ নেই।

একটি ধ্রুপদী নাটক দেখতে গিয়ে হতাশ হয়েছিলাম সেকথা বলি। প্রথমবার যখন এদেশে এসেছিলাম তখন স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভনে যাওয়া হয়নি। পরের বার মনে হল যদি এবারেও না দেখা হয় তাহলে দুঃখের ব্যাপার হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভনেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার মধ্যে অ্যাভন নদীর উপর থিয়েটার বাড়ি একটি। এখানে যাওয়ার অন্যান্য অসুবিধা এই যে, লণ্ডনে থাকলে একদিনে বিকালে কি সন্ধ্যায় থিয়েটার দেখে আসা অসম্ভব। এক রাত্রি হোটেলে থাকতে গেলে টিকিট অনেক আগে কিনে রাখতে হয়। হোটেলে জায়গা পাওয়া কঠিনতর। তারাপদ বলল সে-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে। অনেক আগে থেকে টিকিট কেনা হল। আমাদের তিনটি টিকিট লাগবে। যে টিকিট কিনে দিয়েছিল, সে বলল যে টিকিট সহজে হয়নি। একজনের মাসিকে ধরা হয়েছিল। তার আবার এক বোনঝি ঐ থিয়েটারে চাকরি করে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, থাকব কোথায় ঐ রাত্রে ? তারাপদর বন্ধু একজন বাঙালি ডাক্তার, ডাক্তার কুমার স্ট্রাটফোর্ডের মাঝপথে থাকতেন। তাঁর স্ত্রীও ডাক্তারি করেন। ঠিক হল আরও দুটি টিকিট জোগাড় হলে যাবার সময় সবাই মিলে তাদের বাড়িতে থাকা যাবে এবং থিয়েটার দেখে ফিরবার সময়েও একরাত্রি তাদের বাড়ি থাকতে হবে। লণ্ডন থেকে দুপুরে লাঞ্চের পরে বের হলাম। রাত্রে খাবার সময় সেই ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম, যেখানে রাত্রিবাস করতে হবে। পরদিন দুপুরে লাঞ্চের পর স্ট্রাটফোর্ডের উদ্দেশে যাওয়া হল। বিকালবেলা স্ট্রাটফোর্ড ঘুরে দেখা হল। তখন 'টুয়েলফ্‌থ নাইট' আরম্ভ হয়েছে, সেটি বোধহয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় রজনী। টুয়েলফ্‌থ নাইট আমি আগে একাধিকবার দেখেছি। লণ্ডনে ওল্‌ড ভিক্‌-এ, তাছাড়া গরমের সময় রিজেন্ট পার্কে ওপ্‌ন এয়ার থিয়েটারে দেখেছি। স্ট্রাটফোর্ডে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন,

তাঁদের মধ্যে দু'তিনজন খুব নামকরা অভিনেতা ছিলেন। তাছাড়া যিনি অলিভিয়ার ভূমিকায় নেমেছিলেন, তাঁরও তখন খুব নাম। টি·ভি-তে তাঁকে অনেকবার দেখেছি। অভিনয় দেখে খুব হতাশ হলাম। মনে হল অলিভিয়াই যাহোক কিছু করেছে। যিনি ম্যালভেলিও সেজেছিলেন তিনি বড় অভিনেতা এবং প্রযোজক। তাঁকে আগে অন্য বইয়ে অভিনয় করতে দেখে ভাল লেগেছিল। আমার মনে হল এখানে শেক্‌সপিয়রের নাটকের প্রযোজনায় একটু বেশি বাড়াবাড়ি করেছেন। প্রযোজকের অনেক ক্ষমতা আছে, কিন্তু নাটকের ক্ষতি করে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত নয়। অভিনয় দেখে হতাশ হবার পরে থিয়েটারের রেস্তরাঁয় ডিনার খেতে বসলাম। একটু পরে 'অলিভিয়া'ও সেখানে খেতে এলেন। এমা বলল, মেনুর উপরে তাঁর অটোগ্রাফ নিয়ে আসি। তারপর কী ভেবে আর অগ্রসর হল না। আবার সেই ডাক্তার ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত্রিযাপন। লণ্ডনে শেক্‌সপিয়রের যত বইয়ের অভিনয় দেখেছি এটি তার মধ্যে একটি খারাপ অভিনয় ও প্রযোজনার নিদর্শন। লক্ষ্য করলাম টাইম্‌স পত্রিকায় যে সমালোচনা বেরিয়েছে তা 'ঠাণ্ডা' ধরনের এবং যেসব ত্রুটি আমার চোখে পড়েছিল সমালোচকের চোখেও সেইসব দোষ এড়ায়নি।

Lysistrata-র মত এত ভাল লাগেনি, তাহলেও দুটি ভাল অভিনয়ের কথা বলা দরকার। দুটিতেই অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। হিজ ম্যাজেস্টি'জ থিয়েটারে নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। প্রধান চরিত্র দুটি যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তখন তাঁদের খুব নামডাক। কোনো কোনো সময় খুব নামডাক শুনে গেলে হতাশ হতে হয়। কিন্তু এঁরা আমাদের হতাশ করেননি। বছর দুয়েক পরে হাতিবাগানে একটি থিয়েটারে গিয়ে মনে হয়েছিল প্রযোজক হয়তো এই বইটির কথা ভেবেছিলেন। আর একটি অভিনয় এই সময় দেখেছিলাম ভাল লাগবার মত, সেটি হ্যামলেট। নেভিল বলে একজন তরুণ নামকরা অভিনেতা হ্যামলেট সেজেছিলেন। ওফেলিয়া হয়েছিলেন ডরথি টুটিন। ডরথি টুটিনের যে রকম নাম, আমার সে রকম কিছু মনে হল না। এই ভূমিকায় আমি তো আগে পেগী অ্যাশক্রফটকে দেখেছি। হ্যামলেট ও রানী যাঁরা সেজেছিলেন তাঁদের অভিনয় খুব ভাল লেগেছিল। যে কারণে এই অভিনয়ের কথা আমার মনে থাকবে সেকথা বলছি। সবাই জানেন যে হ্যামলেট চরিত্রের অভিনয় অভিনেতাদের কষ্টিপাথর। হ্যামলেটের সেই বিখ্যাত উক্তি 'To be or not to be that is the question' অভিনেতারা নানাভাবে আবৃত্তি করেন। নেভিলের মুখে 'To be or not to be' শুনে মনে হল 'বিসর্জন'-এ জয়সিংহের উক্তি 'দূর হোক চিন্তাজাল, দ্বিধা দূর হোক' বোধহয় এইরকম করে বললে ভাল হয়। এই লাইনের সঙ্গে পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলি একাধিকভাবে বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ কি 'বিসর্জন' লিখবার সময় শেক্সপীয়রের কথা ভেবেছিলেন? অসম্ভব নয়। তাঁর প্রথমদিকের কয়েকটি নাটকে বিদেশী নাটকের আভাস যে নেই একথা বলা চলে না।

দেশে ফিরবার মাস দুয়েক আগে ফিলিপস আমাকে বললেন যে, বি· বি· সি·

একটা বিশেষ প্রোগ্রাম করছে কমনওয়েলথ দেশগুলি সম্বন্ধে। প্রত্যেক দেশ থেকে একজন সে দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে বলবেন। তিনিই প্রযোজনা করবেন। তিনি বি· বি· সি·-র গ্রন্থাগার, রেকর্ড, টেপ ইত্যাদি ব্যবহার করবেন এবং দরকার হলে টুকরো অভিনয় করবার জন্য অন্য লোকের সাহায্য পেতে পারেন। একটু দীর্ঘ প্রোগ্রাম, কাজেই আমার মনে হল একাধিক কণ্ঠস্বর থাকা ভাল। এই কাজ করতে গিয়ে আমার একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা হল। বি· বি· সি·-র গ্রন্থাগারে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত জিনিস আছে কল্পনা করিনি। টেপ ও রেকর্ড অসংখ্য। অনেক টেপ ও রেকর্ড আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। খেটেখুটে স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছিলাম। শুনলাম স্ক্রিপ্টে সবচেয়ে প্রশংসা পেয়েছিল সিংহল। আমি যা চেয়েছিলাম রেকর্ড ও টেপ সবই পেয়েছিলাম। একটি মহিলা-কণ্ঠ চেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বার জন্য। সেটি পাইনি, তার বদলে বি· বি· সি· আমার কাছে একজন প্রৌঢ় ইংরেজ অভিনেতা পাঠিয়ে দিলেন। ব্রডকাস্টিংয়ের দেরি ছিল। ফিরে এসে কলকাতার বাড়িতে বসে শুনলাম। তারও আগে রেডিও থেকে আমাকে দু'একটি প্রোগ্রাম করতে বলা হয়েছিল। বোধহয় সে সব পরীক্ষায় পাস করে গিয়েছিলাম। রেকর্ডিং হয়ে যাবার পরে রেডিওর একজন কর্ত্রী আমাকে তাঁর বাড়িতে ডিনার খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। দেখলাম তিনি রেডিওতে যে কাজই করুন তাঁর মন থিয়েটারে পড়ে থাকে। কাজেই আলাপ জমতে বেশি দেরি হয়নি। তিনি পুরোপুরি ইংরেজ নন, অনেকটা জাপানি। যখন খাবার এল তখন দেখলাম তিনি ভাতের সঙ্গে অক্টোপাস রান্না করেছেন। রান্নার দোষ দিচ্ছি না, রান্না ভালই হয়েছিল। কিন্তু অক্টোপাস খাচ্ছি, এই কথা ভাবতে চাই না। ফুলহাম পল্লীর দেখলাম অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন বোধহয় উপন্যাসে 'দস্যুদলের বাস' বলে পরিচয় দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এখানকার একাংশ নতুন করে গড়তে হয়েছে।

১৯৫৮ সালে শীত পড়বার আগে আমার বই লেখার খসড়া শেষ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরবার সময় হয়েছে। প্রথমে যখন মাসওয়েল হিলের বাড়িতে এসেছিলাম, আমাকে ছোট একটি ঘর দেওয়া হয়েছিল। সেখানে আমার একটু অসুবিধা হত। বাড়িতে আর-একটি বড় ঘর খালি পড়ে থাকত। তখন গৃহকর্ত্রী বলেছিলেন ঐ ঘরটি তাঁরা ভাড়া দেবেন না, নিজেদের জন্য রেখেছেন। তিনচার মাস পরে যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমি সাংঘাতিক লোক নই, তখন আমাকে ঐ বড় ঘরে নিয়ে আসা হল। দেখলাম ঘরটি তাঁদের শখের ঘর। সেইজন্য ভাড়া দিতে ইতস্তত করছিলেন। আশাকরি তাঁদের আসবাবের কোনো ক্ষতি করিনি। কেবল একটি টেবিলে আমার দোয়াতের অনেকখানি কালি পড়ে প্রায় চিরস্থায়ী দাগ হয়ে গিয়েছিল। গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে বছর দুয়েক পরে আবার দেখা হতে তিনি আমাকে সগর্বে বলেছিলেন, তিনি ঐ দাগ তোলবার চেষ্টাই করেননি, স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখে দিয়েছেন। একথা হয়তো সত্যি নয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে খারাপ লাগে না।

নানাসাহেবের পাণ্ডুলিপি হাতে করে পুজোর সময় দেশে ফিরে এলাম। পাণ্ডুলিপি ভাল করে টাইপ করতে করতে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিঠি এল আমি সেখানে এক বছরের জন্য অধ্যাপনা করতে রাজি আছি কিনা। আমার মনে হয়েছিল যাওয়া একেবারে অসম্ভব, এই তো সেদিন দেশে ফিরলাম, কোন্ মুখে ছুটির কথা বলব। বাবার শরীরও ভেঙে পড়েছিল। আমি ইতস্তত করছি জানতে পেরে বাবা আমাকে ডেকে বললেন, তোমার যাওয়াই উচিত। শরীরের কথা মনে করিয়ে দিতে বললেন, 'তুমি কি মনে করো আমার শরীর এর চেয়ে ভাল হবে ? কাজেই তুমি ঘুরে এসো।' ১৯৫৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগো গিয়েছিলাম, বাবার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আর একটি কথা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি মঞ্জুর করা নিয়ে। এবিষয়ে কোনো আপত্তি উঠল না। তখন নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত উপাচার্য ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আমি তো দু'বার ছুটি চাইতে পারি না।' তিনি বললেন, 'দু'বার ছুটি কী রকম ? একটা আপনার ছুটি হতে পারে, আর একটা তো তাঁরাই আপনাকে কাজে নিয়ে যাচ্ছেন।' তবু আমার দ্বিধা যাচ্ছে না দেখে বললেন, 'লাঞ্চের পরে দুটোর সময় আসুন। তখন কথা হবে।' ঠিক দুটোর সময় গেলাম। উপাচার্যের প্রাইভেট সেক্রেটারি আমাকে বললেন, 'ডঃ সিদ্ধান্ত বাইরে গেছেন আজ আর ফিরবেন না।' আমি একটু বিব্রত হয়ে বললাম, 'আমাকে আসতে বলেছিলেন বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করবেন বলে।' প্রাইভেট সেক্রেটারি বললেন, 'সে চিঠি তো চলে গেছে, উপাচার্য জানিয়ে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আপত্তি নেই।' শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গেলাম। কুড়ি বছর চাকরির পরেও আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠ 'রিডার'। তাঁরা আমাকে 'পুরো প্রোফেসর' করে নিয়ে গেলেন। এটা কি তাঁরা জেনেশুনে করেছিলেন, না বুঝতে ভুল করেছিলেন। শিকাগোতে পরে আমার জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। সেই কথায় আসছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে কোনো কোনো আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও কয়েকটি ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যাঁদের আমন্ত্রণ করে আনা হবে তাঁরা এক বছর থাকবেন এবং একটি কি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবেন, এইরকম শর্ত থাকত। এর পূর্বে অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঘুরে এসেছিলেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কিছুদিন শিকাগোতেও ছিলেন। এর আগে শিকাগোর অধ্যাপক স্টিফেন হে ও তাঁর পত্নী এলোইস (Eloise) কিছুদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ধীরে বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল। এখনও বজায় আছে। স্টিফেন হে বাংলা পড়তে পারতেন। তখন রবীন্দ্রনাথের উপর একটি বই লেখা শেষ করে রামমোহন রায়ের লেখা একটি ছোট বই সম্পাদনা করার কথা ভাবছিলেন। তাঁরা যখন কলকাতায় ছিলেন তখনই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি এসে পৌঁছল। আমাকে বলা হয়েছিল প্রথমে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে। সেখানে ছ'মাস পড়াবার পর ক্যালিফোর্নিয়ায় বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন মাসের জন্য পড়িয়েছিলাম। অর্থাৎ

যাকে সে-দেশে 'one academic year' বলে। শিকাগোর সঙ্গে সাধারণত আমাদের পরিচয় গল্প-উপন্যাসে, বিশেষ করে যাকে খুনখারাপি বলে সেই সব গল্পে। শিকাগোর এই খ্যাতি বা অখ্যাতি অমূলক নয়। এই ক'মাস কাটাবার পরও আমি অন্য কাজে শিকাগো এসেছিলাম। তখন শহরে একটি হোটেলে থাকতাম। রাত দশটা অবধি রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, বিপজ্জনক কখনও মনে হয়নি। আমার ধারণা হয়েছিল যে, যে-সব জায়গাকে ব্ল্যাক স্পট বলা হয় তার মধ্যে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস একটি। যাতে বিপাকে না পড়ি সেজন্য হে দম্পতি আমার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ক্লাবে ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন। ছ' মাস সেখানেই ছিলাম। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে ফ্যাকাল্টি ক্লাবের বাড়ি খালি হয়ে যেত। অন্যান্য অধ্যাপক যাঁরা থাকতেন তাঁরা শুক্রবার কিংবা শনিবার থেকে বাইরে চলে যেতেন এবং সোমবার সকালে ফিরতেন। শুক্রবার বিকাল থেকে সোমবার ব্রেকফাস্ট পর্যন্ত খাবারও পাওয়া যেত না। লেখাপড়া করবার পক্ষে প্রশস্ত সময়। ক্লাবে একটি ছোট লাইব্রেরিও ছিল।

আমেরিকান ছাত্রদের অনেকে যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়তে আসেন তখন তারা অনেক কিছু না জেনে আসেন। কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যে নিজেদের তৈরি করে নিতে পারেন। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, প্রতি কোর্সের জন্য আলাদা ফি দিতে হয়। এবং আর একটি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম· এ· ক্লাসের দ্বার অবারিত নয়। ছাত্রদেরও সেই বিষয়ে আগ্রহ না থাকলে অর্থ ও সময়ের অপব্যয় করতে চাইবে না। শিকাগোয় দেখেছি এম· এ· ক্লাসের নীচে, অর্থাৎ আমরা যাকে আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ক্লাস বলি, সে-রকম একটা ব্যাপার আছে, তাতেও ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়তে হয়। সে-ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা বেশি, অর্থাৎ সত্তর-আশি জন। তাতে একদিন আমাকে পড়াতে অনুরোধ করা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে সেটি ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যযুগের কোনো বিষয়। আমাদের দেশে যেমন বড় গ্যালারিওয়ালা ক্লাস থাকে সে রকম ক্লাস। গিয়ে দেখলাম কোনো কোনো অধ্যাপক উপস্থিত আছেন। ছাত্র ও অধ্যাপক একসঙ্গে ক্লাস করছেন সেটা ওদেশে অসাধারণ কিছু নয়। এ দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখিনি। আমাদের দেশে তো ভাবাই যায় না।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা লিখতে গিয়ে কয়েকজন সহকর্মীর কথা বলতে হয়। তার মধ্যে প্রথমে আসে প্রফেসর এডওয়ার্ড ডিমকের কথা। এডওয়ার্ড ডিমকের সঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আমেরিকা যাবার আগে সুকুমারবাবু আমাকে বলেছিলেন, আপনার যদি কোনো অসুবিধা হয় গিয়েই ডিমকের সঙ্গে দেখা করবেন। ডিমকের সঙ্গে পরিচয় হবার পর বন্ধুত্ব হতে দেরি হয়নি। ওখানে শুক্রবার-শনিবার অধ্যাপকরা অনেকে বাড়িতে পার্টি দেন। অনেক রাত অবধি সে পার্টি চলে। একবার ডিমকের বাড়িতে পার্টিতে গিয়েছি। তখন মধ্যরাত্রি হয়ে গিয়েছে, আমি বাড়ি ফেরার কথা ভাবছি। যদিও কেউ বাড়ি পৌঁছে দিয়ে না গেলে বাড়ি ফেরা অসম্ভব। ডিমক আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আমি নতুন কোনো কাজের কথা ভাবছি কিনা। আমি তখন মহারাষ্ট্রী পুরাণ সম্পাদনা করছি। কাজ অনেকদূর এগিয়েছিল। দেশে থাকলে

আশা করছি পুজোর পরে খসড়া শেষ হয়ে যেত। বলতেই ডিমক বললেন, 'ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো ! আমিও মহারাষ্ট্রা পুরাণের কাজ করছি ।' ঠিক হল দু'একদিন পরে আমরা যা কাজ করছি মিলিয়ে দেখব। কাজ অনেকটাই হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকা থেকে ফিরে আসবার পূর্বে বই প্রকাশককে দিয়ে এসেছিলাম। ডিমক ও আমি যুগ্মসম্পাদক। এই সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না।

আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম ছটির মধ্যে একটি মনে করা হয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় শুধু যে আকারে বড় বলে খ্যাতি তা নয়, এত রকম বিভিন্ন বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা এবং তার জন্য যোগ্য অধ্যাপক ওদেশে খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। ছেলেবেলা থেকে শিকাগো শহরের কথা শুনে আসছি দুটি কারণে। একটি স্বামী বিবেকানন্দর জন্য। দ্বিতীয় কারণটি শিকাগোর পক্ষে গৌরবের নয়। বছর পঁচিশেক আগে কলকাতায় একটি, যাকে ক্রাইম প্লে বলা হয়, সে রকম নাটক্ রঙ্গমঞ্চে অনেক দিন চলেছিল। সে যুগের বিখ্যাত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অভিনয়ের সময় তাঁর একটি সংলাপ একাধিকবার উচ্চারিত হত। 'সেভ্‌ন ইয়ারস' এক্সপিরিয়েন্স অব শিকাগো !' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে ত্রাসের শিহরণ দেখা দিত। শিকাগো সম্বন্ধে এই ধরনের কাহিনী অমূলক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আমার দোতলার ঘরের নীচে পার্কের মতো অনেকটা খোলা জায়গা। তার ঠিক উলটো দিকে আইন বিভাগের বাড়ি। দিন পরিষ্কার থাকলে এই পার্কে সমস্ত দিন মহিলাদের ভিড় হত। যাঁদের ওদেশে Faculty wives বলা হয়। অনেকের সঙ্গেই থাকত প্যারাম্বুলেটর, সেলাই বা বই। মনে হত এরকম শান্তির জায়গা আর নেই। কিন্তু বিকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা তাড়াতাড়ি অন্তর্ধান হয়ে যেতেন। সন্ধ্যার সময় একটি প্রাণীকেও দেখা যেত না। বড় বিশ্ববিদ্যালয়, তার ক্যাম্পাসও অনেকটা ছড়ানো। সন্ধ্যার পর সবাই একটু সাবধান থাকত। সপ্তাহের শেষে অধ্যাপকদের বাড়িতে যে সব পার্টি হত তাতে যাঁরা নিমন্ত্রণ করতেন তাঁরা বলে যেতেন ঠিক সময়ে গাড়ি এসে নিয়ে যাবে। সেই গাড়ি আবার পরে ফেরত দিয়ে আসত। সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে নিমন্ত্রণ হলে একসঙ্গে কয়েকজন মিলে যেতেন। ছ'মাসের মধ্যে রাহাজানির কিছু দৃষ্টান্ত আমিও দেখেছি, অথচ আমেরিকান পুলিশ সর্বদা সশস্ত্র এবং সর্বত্রগামী। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব পুলিশ বিভাগ আছে। সে বিভাগেও যথেষ্ট গাড়ি এবং অস্ত্রধারী পুলিশ, কিন্তু যাকে আমরা নিরাপত্তা বলি তার অভাব আছে। অন্য কোনো কোনো শহরেও অল্পবিস্তর অস্বস্তি লক্ষ্য করেছি। শিকাগো থেকে একবার ফিলাডেলফিয়ায় গিয়েছিলাম। সেখানে ইতিহাসের অধ্যাপক হোলডেন ফারবার আমাকে স্টেশনে নিতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, স্টেশনের কাছে কখনও রাস্তায় হাঁটবে না কিংবা বাসে উঠবার চেষ্টা করবে না, যত কাছেই হোক ট্যাক্সি নেবে। নিউইয়র্কে আমি বেশিদিন থাকিনি। কিন্তু লক্ষ্য না করলেও বোঝা যেত সে শহরও ঠগির ভয় থেকে মুক্ত নয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি জিনিস দেখে

আমার খুব আশ্চর্য লেগেছিল। আমরা যাকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস বলি, সেই কোর্সে আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট ও গ্র্যাজুয়েট ছাত্র একসঙ্গে পড়ছে। একসময় আমাদের দেশেও পাস ও অনার্স একসঙ্গে পড়ানো হত। তাতে যে কেউ বিশেষ উপকৃত হতেন, তা আমার মনে হয় না।

শিকাগোয় ছ' মাস কাটাবার পর আমার ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সময় হল। বার্কলেতেও অধ্যাপকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাতেই ছিলাম। ইউরোপের দু'একজন অধ্যাপকও, যাঁরা অল্প সময়ের জন্য পড়াতে এসেছিলেন, সেখানে থাকতেন। অধ্যাপকদের মধ্যে প্রায় জনা বারো ছিলেন যাঁরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। বার্কলের আর একটি নিয়ম ছিল অধ্যাপকদের যে থাকবার ও খাবার জায়গা, সেখানে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ; অধ্যাপিকা হলেও নয়। অধ্যাপকদের স্ত্রীদের কথা একটু বিবেচনা করা হত। তাঁরা স্বামীর অতিথি হয়ে আসতে পারতেন কিন্তু খাবার ঘরে প্রবেশ করতে পারতেন না। বাইরে এক কোণে খানিকটা খোলা জায়গা ছিল, আমরা বলতাম বাগান, সেখানে বসে তাঁরা লাঞ্চ খেতেন। সে নিয়ম এখনও আছে কিনা জানি না। এর উল্‌টো দিকেই অধ্যাপিকাদের থাকার জায়গা। সেখানে অবশ্য বিশেষ উপলক্ষ্যে পুরুষদের নিমন্ত্রিত হয়ে যাবার বাধা ছিল না। এই ব্যবস্থায় কোনো পক্ষই খুব অখুশি ছিল বলে মনে হত না। অন্তত কোনো নালিশ শুনিনি।

শিকাগো থেকে বার্কলে একদিক দিয়ে বড় পরিবর্তন। জানুয়ারি মাসে শিকাগো ছেড়েছিলাম। তখন সেখানে দুঃসহ শীত। পশ্চিমে অর্থাৎ ক্যালিফোর্নিয়াএসে দেখলাম জানুয়ারি মাসে বাগানে গোলাপ ফুটছে। রঙ্গমঞ্চে যেমন ঋতু পরিবর্তন হয় সেই রকম। আর একটি জিনিস আমার চোখে অদ্ভুত লেগেছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'মাইলের মধ্যে কোনো পানশালা থাকা বারণ। যে দেশে প্রতি অধ্যাপকের এবং প্রায় ছাত্রেরই গাড়ি আছে সেখানে দু'মাইলের অর্থ বুঝতে পারিনি। আমাকে একজন অধ্যাপক বুঝিয়ে বললেন যে, আগে তো এরকম অবস্থা ছিল না। দু' মাইল হেঁটে কিংবা সাইকেলে যেতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মনে করতেন দু'মাইল হেঁটে কিংবা সাইকেলে যাবার কথা ভাবলেই অনেক ছাত্রের তৃষ্ণা দূর হয়ে যাবে। বার্কলে এসে আমার মনে হল যেন ইংলণ্ডের কোনো শহরে এসেছি। ইংলণ্ডে যেসব শহরকে ইউনিভার্সিটি টাউন বলে সেইসব জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অধ্যাপকদের একটি বিশেষ খাতির আছে। যাকে আমরা 'সার্ভিস' বলি, আমেরিকার অনেক জায়গায় তার কোনো বালাই নেই। কিন্তু বার্কলের কথা স্বতন্ত্র। দর্জির দোকানে যাবার দরকার হয়েছিল। তারা যত্ন করে জিনিসপত্র দেখাল। জিজ্ঞাসা করল যা কিনলাম তার দাম আমি চেকে দেব না ক্যাশ দেব, বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে কি না। বইয়ের দোকানেও তাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি অনেকগুলি বইয়ের দোকান। এ সব সুবিধা শিকাগোতে পাইনি। শিকাগোতে যাবার মতো একটি বইয়ের দোকান ছিল ফ্যাকালটি ক্লাবের কাছে। সেখানে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টোর্সে না পাওয়া গেলে শহরে যেতে হত। এখানে কাছে বড় শহর সানফ্রানসিস্‌কো। সেখানকার এয়ারপোর্টে নেমে বার্কলে আসতে হয়।

ভালমন্দ কিছু খেতে হলে সেখানে গিয়ে খেয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই। আমেরিকানদের কাছে ডিনার খাওয়ার জন্য চল্লিশ মাইল যাওয়া কিছুই নয়।

বার্কলে আসবার সময় মনে হয়েছিল বাবার শরীর খুব খারাপ। তিনি আর নিজের হাতে চিঠি লিখতে পারছেন না। বার্কলে আসবার কিছুদিন পরে একরাত্রে কলকাতা থেকে টেলিফোনে দুঃসংবাদ এল। বার্কলেতে বাবার মৃত্যুসংবাদ রবি চক্রবর্তী আমাকে টেলিফোন করে জানালেন। আমাদের বাড়িতে অনেকে আসতেন, তারা কেউ কেউ আমার ছোট ভায়েদের বন্ধু কিংবা পিতৃবন্ধু। কিছুদিন পর আমারও বন্ধু হয়ে যেতেন। রবি চক্রবর্তী এখন আমেরিকায় অধ্যাপনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির ছাত্র। কিছুদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকের কাজ করেছিলেন।

তখন আমার দেশে ফিরতে প্রায় তিন মাস দেরি। আরও মাসখানেক পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিঠি এল আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি ওখানকার ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক হতে রাজি আছি কিনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাব আগে কখনও মনে করিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটু দেরি করে জানালাম আমার আপত্তি নেই। বর্ষার সময় কলকাতায় ফিরে এলাম।

কলেজে যখন পড়ি তখন থেকে যাদবপুরের সঙ্গে পরিচয়। এখন যার নাম কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল তখন তার গোড়াপত্তন হয়েছে। কলকাতা থেকে ট্রেনে আসতে হত। দেখতে দেখতে অবশ্য সবই বদলে গেল। যখন প্রথম যাদবপুরকে চিনলাম তখন হাসপাতালে আমার একজন আত্মীয় ডাক্তার ছিলেন, জনাতিনেক রোগী তাঁর ভরসায়। হাসপাতালের পাশেই ছোট করিমের সমাধি ছিল। তার খ্যাতি তখন ওই অঞ্চলে দীপ্যমান। এখন হলে তাকে সমাজবিরোধী ছাড়া আর কিছুই বলা যেত না। হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সেনের শশী বলে একজন ভৃত্য ছিল। বিশিষ্ট অতিথি আপ্যায়ন করতে হলে সে গাছে উঠে ডাব পেড়ে দিত। তাছাড়া অতিথি আপ্যায়নের আর কোনো উপায় ছিল না। তবে শশীর একটি দোষ ছিল, একটু বেশি কল্পনাবিলাসী বলা চলে। কলকাতার বাইরে থেকে রোগীদের দেখতে কিংবা খোঁজখবর করতে কেউ কেউ আসতেন। তার মধ্যে শশী যাদের গোবেচারি মনে করত তাদের কাউকে কাউকে গিয়ে বলত, 'এইসব হাসপাতাল, জমি, বাড়ি তো আমিই করলাম।' কেউ কেউ কখনও কখনও এই উক্তি বিশ্বাস করতেন এবং মনে করতেন এরকম দানবীর দেখা যায় না যিনি তাঁর নিজের দান এরকম গোপন করে রেখেছেন। এক ভদ্রলোক শশীর কথায় একটু বেশি ভুলেছিলেন। তিনি গিয়ে সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বললেন, 'এত বড় মহৎ হৃদয় আর দেখা যায় না। এত টাকা দান করেছেন তবু চালচলন একেবারে সাধারণ লোকের মতো।' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রথমে বুঝতে পারেননি। তিনি বললেন, 'আপনি কার কথা বলছেন ?' সেই ভদ্রলোক বললেন, 'কেন, ঐ যে নিজের হাতে বাসন মাজছে দেখলাম।' শশী এইসব কারণে মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত হত, কিন্তু এরকম সরল, বিশ্বাসী শ্রোতা সে বোধহয় আর কখনও পায়নি। খুব তাড়াতাড়ি

আবহাওয়া বদলে গেল। নতুন নতুন বাড়ি উঠে হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স সবই সংখ্যায় বাড়তে লাগল। বাসে যাবার সময় অনেকদিন পর্যন্ত রেললাইন ও রাস্তার মাঝে ধানক্ষেত দেখা যেত। কখনও কখনও ধানক্ষেতের ওপারে ট্রেন যাচ্ছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৭ সালে। কয়েক বছর পরে আমি যখন যাদবপুরে কাজে যোগ দিলাম তখন বিশ্ববিদ্যালয় সবে গুছিয়ে বসতে আরম্ভ করেছে। ক্যাম্পাস তখনও ভাল করে তৈরি হয়নি। লাইব্রেরি তৈরি হচ্ছে। তুলনায় বিজ্ঞান ও টেকনলজির ফ্যাকালটির কাজ অনেক এগিয়ে গিয়েছে। আর্টস ফ্যাকালটি গড়া তখন আরম্ভ হয়েছে। নতুন বাড়ি শেষ হয়নি। আসবাবপত্র আসতে আরম্ভ করেছে, দেখলে চোখ জুড়োয় না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আর্টস ফ্যাকালটি গুছিয়ে বসতে পেরেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গিয়ে একটি জিনিস চোখে পড়েছিল, নিজের ডিপার্টমেন্ট গড়ে তুলবার কিছু স্বাধীনতা আছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে সবার হয়তো পরিষ্কার ধারণা ছিল না। কিন্তু যাদবপুরে এসে আমি আমার কাজের কিছু স্বাধীনতা পেলাম। মনে হল পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকদিন ছিলাম, একুশ বছর। অনেকের স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছি। তবুও মনে হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত নিজবাসী হতে চেয়েছি তত পরবাসী করে রাখা হচ্ছে। কাউকে দোষ দিচ্ছি না। বোধহয় তখন রীতিই এই ছিল।

আমি যোগ দেবার অল্পদিন পরেই ফ্যাকালটি ক্লাব তৈরি হয়েছিল। ক্লাবের বাড়ি কিছুদিন আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার বাইরের অধ্যাপকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে এলে যাতে এখানে দু-একদিন থাকতে পারেন এরকম ব্যবস্থা ছিল। একতলায় খাবার জায়গা ও বিশ্রাম করার জায়গা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে লাঞ্চ খেতে পারেন। নতুন আসবাব কিনে একতলা সাজানো হয়েছিল এবং অজিত ঘোষ মশায়ের সংগ্রহ থেকে একটি ছবি চেয়ে এনে গৃহসজ্জা সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। এসব কাজে তখনকার রেক্টর ডঃ ত্রিগুণা সেন ও রেজিস্ট্রার প্রবীর বসুমল্লিক সাহায্য করেছিলেন। এর জন্য একটি ছোট কমিটি করা হয়েছিল। তার সদস্যদের মধ্যে বাসন্তী মিত্র ও অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। অন্যদের নাম মনে পড়ছে না।

ইতিহাস বিভাগে একটি সুবিধা ছিল এই যে অল্প দিনের মধ্যেই আরও দুজন অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়েছিল। এর জন্যে আমায় বেশি খাটতে হয়নি। একটি পদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন চিঠি লেখা মাত্রই দিয়েছিল। আর একজন অধ্যাপকের পদ খুব সহজেই পাওয়া গিয়েছিল। এই পাদটির নাম গুরু নানক অধ্যাপক। দেখে খুশি হয়েছিলাম যে ইতিহাস বিভাগ খুব তাড়াতাড়ি সাবালক হয়ে উঠতে পেরেছে।

যাদবপুরে যখন এসেছি তখন আমার ধারণা ছিল এখানকার ডিপার্টমেন্ট গুছিয়ে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাব। কলকাতায় রিডার হয়ে

যেতেও আপত্তি ছিল না। নাড়ীর টান সহজে যায় না। কিন্তু লিয়েন নিয়ে এলেও ফেরা সহজ নয়। সিণ্ডিকেটের দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার ফিরে যাওয়ায় বাধা দিয়েছিলেন বলে সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে একজন আইনজীবী, অন্যজন হিসাবনবিশ। এঁরা বলেছিলেন আমার সম্বন্ধে তাঁদের কোনো ব্যক্তিগত আপত্তি নেই, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। সিণ্ডিকেটের ভিতরে কী হয় আমার জানা সম্ভব নয়, কিন্তু এই সংবাদটি খবরের কাগজে বেরিয়েছিল।

যাদবপুরে আসবার বছর তিনেকের মধ্যে ভারত সরকার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি লিখে জানতে চাওয়া হল যে আমি চার-পাঁচ সপ্তাহ চেকোস্লোভাকিয়া যেতে রাজি আছি কিনা। চেকোস্লোভাকিয়ার চারটি বিশ্ববিদ্যালয়—প্রাগ, ব্রনো, ওলোমুস ও ব্রাটিশ্লাভায় বক্তৃতা দেবার জন্য। তখন গ্রীষ্মকাল। বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের চাপ ছিল। আমি জবাব দিলাম দু'তিন মাস বাদে পুজোর ছুটির সময় যাব।

প্রাগে রওনা হবার দিন দুয়েক আগে দিল্লি এলাম। এখানে আমার নতুন পাসপোর্ট ও প্লেনের টিকিট নিতে হবে। পুরনো পাসপোর্ট রেখে আমাকে একটি সাদা পাসপোর্ট দেওয়া হল, তার অর্থ সরকারি কাজে যাচ্ছি। যে বিভাগ থেকে আমাকে পাঠানো হচ্ছে সেখানকার একজন মহিলা আমাকে তুলে দিতে এয়ারপোর্টে এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এই প্লেনে যে যাচ্ছি সেকথা প্রাগে জানানো হয়েছে কিনা। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে প্লেনে তুলে দিলেন। যখন প্রাগে পৌঁছলাম তখনও ভোর হয়নি। খুব কুয়াশা। যাত্রীদের বলা হল কুয়াশার জন্য আমরা বোধহয় নামতে পারব না, আমাদের লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে। পরে প্রাগে ফিরে আসব। শেষ পর্যন্ত কিছুক্ষণ চক্কর দিয়ে পাইলট প্রাগে নামাই স্থির করলেন। প্রাগে নামামাত্র আমাকে জানানো হল ভারতীয় দূতাবাস থেকে একজন আমাকে নিতে এসেছেন। ভাবলাম দিল্লিতে কাজকর্ম একটু ঢিলে কিন্তু আসল কাজ ঠিকই হয়। যিনি আমাকে নিতে এসেছিলেন তিনি, বাঙালি, নাম ডঃ জোয়ারদার। আমি তাঁকে দেখে ভারি খুশি হলাম কিন্তু তিনি আমাকে দেখে অবাক হলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি ডক্টর গুপ্ত, আমি ভেবেছিলাম যে আমাদের একজন সেক্রেটারি—তিনিও গুপ্ত। আমি ভাবলাম তিনিই আসছেন। কাজেই ভোরে এলাম।' এই ভুল না হলে তিনি নিজে হয়তো শেষরাত্রে আসতেন না। ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় নিলাম। সেই বাড়িতেই তিনি থাকেন। জোয়ারদার সাহেব এয়ারপোর্টে আমাকে দেখে একটু হতাশ হলেও তিনি ও শ্রীমতী জোয়ারদার খুবই অতিথিবৎসল। যে কয়েক সপ্তাহ চেকোশ্লোভাকিয়াতে ছিলাম, তাঁরা যথাসাধ্য করেছেন। একটু পরে তাঁদের কী অসুবিধা বুঝতে পারলাম। কোন্ প্লেনে কবে আসব সে খবর তখনও চেকোশ্লোভাকিয়া সরকার জানতে পারেননি। দুপুরবেলা শ্রীমতী জোয়ারদারের হাতের রান্না খেয়ে বিশ্রাম করা গেল। যখন সন্ধ্যা হয়ে এল তখনও পর্যন্ত কোনো খবর নেই। জোয়ারদার সাহেব শেষ পর্যন্ত অনেকক্ষণ টেলিফোন করে আমার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করলেন। সেই রাত্রি আমি হোটেলে কাটালাম। তার জন্য নিশ্চয় জোয়ারদার সাহেবকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। হোটেলের নাম

'ইউরোপা'। দেখে মনে হল এই হোটেল এক সময় শৌখিন বড়লোকের বাড়ি ছিল। থাকবার ব্যবস্থা বেশ ভাল। একতলায় একটি ছোট রেস্তারাঁ, সেখানে বাইরের লোক খাচ্ছে। বাড়ির সঙ্গে কি রকম খাপ খায় না। পরদিন সকাল ন'টা আন্দাজ ডঃ জোয়ারদার আবার এলেন, আমাকে সরকারি দপ্তরে নিয়ে যাবার জন্য। বুঝলাম এতক্ষণে আমার খবর এসে পৌঁচেছে। যে বাড়িতে আপিস সেটা দেখে মনে হল মধ্যযুগের কাস্‌ল। বাইরের দিকে হাত পড়েনি, কিন্তু ভিতরে পরিবর্তন হয়েছে। আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ ক্রাসা। তিনি বছর কয়েক আগে কলকাতায় এসেছিলেন, এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাজ করতেন। তখন আমার সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে কেতাদুরস্তভাবে অভ্যর্থনা করা হল। আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম যখন একটি মেয়ে বাংলাভাষায় আমাকে স্বাগত জানাল। তার বাংলা উচ্চারণ বিশুদ্ধ। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমি কী কী বিষয়ে বক্তৃতা দেব, সে বিষয়ে আলোচনা হল। আমি কী করে চেকোস্লোভাকিয়া ঘুরে দেখব এবং কী বিষয়ে আমার আগ্রহ বেশি—খেলাধুলা, পর্বত আরোহণ, সঙ্গীত না নৃত্য, সে বিষয়েও আলোচনা হল। পর্বত আরোহণে আমাকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা হল। বলা বাহুল্য, আমি উৎসাহিত হলাম না। শেষে ঠিক হল দেশ ঘুরে দেখার জন্য আমাকে একটি গাড়ি দেওয়া হবে। তার সঙ্গে ড্রাইভার ও একজন ইংরেজি-জানা গাইড। এই গাড়িতে আমি দেশের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে দেখতে পারব। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও গাড়িতে যাওয়া সুবিধা। তখন চেকোস্লোভাকিয়ার উপর রাশিয়ার চাপ রয়েছে। সাধারণ লোক যে এ অবস্থা পছন্দ করছে তা নয়, কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা করতে অনিচ্ছুক। এই মিটিংয়ের পরে ক্রাসা এবং আর একজন অধ্যাপক আমাকে লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে গেলেন ওখানকার সবচেয়ে বড় রেস্তরাঁয়। খাবার ব্যবস্থা খুবই ভাল। রেস্তরাঁর নাম 'মস্কো'। পরের দিন আমি প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। আমার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো অধ্যাপককে দেখলাম যৌবনবয়সে পাঠ নিতে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। একজনের উচ্চারণ শুনে মনে হল কিছুকাল অক্সফোর্ডে কাটিয়েছেন। তাঁর কোটের পকেটে দেখলাম একটি সবুজ পেঙ্গুইনের বই উঁকি মারছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি অক্সফোর্ডে ছিলেন?' তাঁর জবাব হল, 'Yes, but Oxford did not teach me much।' আমি তাঁর বাড়িতেও গিয়েছি। তাঁর স্ত্রী একসময় আইনের ব্যবসা করতেন। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ায় তখন আইনজীবীদের কোনো অস্তিত্ব নেই। দু' দফায় প্রাগে এসেছি। প্রথমে দিন দশেক বক্তৃতা দিয়েছি। তখন এদেশে উৎসাহ ভারতবর্ষের খুব কাছের ঘটনাতে, যাকে আমরা এখনও হয়তো ইতিহাস বলি না। প্রাগের অধ্যাপকদের মতো বিদ্বজ্জনমণ্ডলী এদেশের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা সম্ভব নয়। আমার একটি নতুন অভিজ্ঞতা হল ইন্টারপ্রেটার সঙ্গে রেখে বক্তৃতা দেওয়া। প্রাগে ভারতবর্ষের বিষয়ে নানা রকম পরিচয় পেলাম। সংস্কৃত বিভাগে তখন একটি সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের কথা হচ্ছিল। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বার্নো প্রকৃতপক্ষে এঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির বিশ্ববিদ্যালয়। ওলোমুসে

বিশ্ববিদ্যালয়টি পুরানো। শহরের একেবারে মধ্যে গতযুগের মতো একটি মার্কেট প্লেস। সেই মার্কেট প্লেসের উপরে একটি ছোট হোটেলে দিনদুয়েক ছিলাম। সবশেষে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলাম, সেটি ব্রাটিশ্লাভা। এটি একেবারে চেকোস্লোভাকিয়ার দক্ষিণে, ড্যানিয়ুব নদীর কাছে। আরও দক্ষিণে গেলে ভিয়েনা পৌঁছনো যায়। ব্রাটিশ্লাভার কাজ হয়ে গেলে আবার প্রাগ। ইতিমধ্যে ভারত সরকার থেকে টেলিগ্রাম এল আমি যেন পোল্যাণ্ড ঘুরে আসি। তখন মাঝে মাঝে বরফ পড়ছে। বেশি শীতের উপযুক্ত গরম কাপড় আমার বিশেষ ছিল না। তাছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরও কাজ ছিল। শেষ পর্যন্ত পোল্যাণ্ডে যাওয়া সম্ভব হল না। চেকোস্লোভাকিয়ায় যা দ্রষ্টব্য সবই দেখেছি। অস্টারলিজ যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। শুনলাম রাস্তা খারাপ। অন্য যা কিছু দেখতে চেয়েছি, বাধা হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পরে প্রাগে একটি জিনিস দেখান হত—ম্যাজিক ল্যানটার্ন। 'নিউ স্টেট্সম্যান'-এ এর বিস্তারিত বিবরণ পড়েছিলাম। স্টেজের উপর যে দৃশ্যে রক্তমাংসে গড়া মানুষদের দেখছি, সেই জায়গায় হঠাৎ তারা নিজেরাই ছায়ামূর্তি হয়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে তারা শরীরী মূর্তি হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হয়, শরীর কখন অশরীরী হয় ধরা যায় না। তাছাড়া ব্রাটিশ্লাভায় অপেরা দেখতে গিয়েছি। প্রাগ থেকে তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষত একেবারে মিলিয়ে যায়নি। শহরে ট্যাক্সি দুর্লভ। তবে কয়েক জায়গায় পাওয়া যায়। ট্রাম কলকাতার ট্রামের চেয়ে একটু ছোট। তবে অল্প অপেক্ষা করলেই বসে যাওয়া যায়। ইংরেজি খবরের কাগজ পাওয়া যেত না, 'ডেলি ওয়ার্কার' ছাড়া। বইয়ের দোকানে কিন্তু অনেক ভাল ভাল ইংরেজি বই বিক্রি হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য এত রকমের ভাল ছাপা বই আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। চলে আসার দিন জোয়ারদার সাহেব আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে এলেন। আমার পরিচিত চেক্ বন্ধুরাও কেউ কেউ ছিলেন। তাছাড়া কয়েকজন সরকারি কর্মচারী। একটি চেক্ মেয়ে খুব ভাল বাংলা বলতেন। আমি সেই কথা উল্লেখ করাতে তিনি বললেন, 'আমারও ধারণা ছিল বাংলা জানি। আপনাদের উপাচার্য ডঃ ত্রিগুণা সেন কিছুদিন এখানে ছিলেন। তখন থেকে আমার সে অহঙ্কার চলে গিয়েছে।' আমি বললাম,'কেন ?' মেয়েটি উত্তরে বললেন, 'তিনি যাবার সময় আমাকে একজন বাঙালি কবির বই উপহার দিয়ে গেলেন। সে বই খুলেই বুঝতে পারলাম আমার বাংলা শেখা একেবারেই হয়নি।' এই বলে মেয়েটি সেই বাঙালী কবির নাম বললেন।

১৯৬৫ সালে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে একটি চিঠি পেলাম, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় জানতে চাইছে Smuts Visiting Fellowship সম্বন্ধে আমি উৎসাহী কিনা। উৎসাহী ছিলাম না যে তা নয় কিন্তু কখনো মনে করিনি যে আমাকে Smuts Fellowship-এর জন্য ডাকা হবে। অল্পদিনের মধ্যে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবার চিঠি এল যে আমার যাবার ব্যবস্থা আরম্ভ করার সময় হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি পেতে কোনো অসুবিধা হল না। ন' ম্যাসের জন্য কেমব্রিজ রওনা হয়ে গেলাম।

পূর্বের কথা একটু বলা দরকার। কয়েক বছর আগে থেকে বেগম সমরুর জীবন সম্বন্ধে আমি পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। ছেলেবেলায় 'ভারতবর্ষ'-এ প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বেগম সমরু' পড়েছি। বইটি পরে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের আট আনা সিরিজের গ্রন্থাবলীর একটি হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আরম্ভ করেছি তখন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ব্রজেনবাবু আমাকে একটি গল্প বলেছিলেন। ব্রজেনবাবু তাঁর বেগম সমরুর একখণ্ড যদুনাথ সরকার মহাশয়কে উপহার দিয়েছিলেন। ব্রজেনবাবু বলেছিলেন যদুনাথের কাছ থেকে এই রকম উত্তর এসেছিল—"আপনার 'বেগম সমরু' ইতিহাস হয় নাই, উপন্যাস হইয়াছে।" এর কয়েক বছর পরে ব্রজেনবাবু বইটিকে নানাভাবে পরিমার্জন করে ইংরাজি ভাষায় লেখেন। বইটি এখনও বোধহয় পাওয়া যায়। ব্রজেনবাবুর অবশ্য অনেক অসুবিধা ছিল। তখনকার দিনে কলকাতায় বসে ইতিহাসের সম্পূর্ণ মালমশলা সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। বিদেশে না হোক, কিছু সময় দিল্লিতে কাটানো দরকার হত। আমার মনে হচ্ছিল সমস্ত মালমশলা সংগ্রহ করে বেগম সাহেবার জীবনের কিছু রুদ্ধ দ্বার খোলা যায়। একদিন মধ্যাহ্নে নতুনদিল্লির সরকারি মহাফেজখানায় সৌরীন রায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। প্রথমে মনে করেছিলাম এবিষয়ে সৌরীন রায়ের হয়তো উৎসাহ হবে না। কিন্তু মানুষকে অনেক দিন দেখলেও কতটুকু তাকে চেনা যায়? কথা বলতে বলতে সৌরীন রায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেনএবং বললেন, 'এখনি লিখতে আরম্ভ করুন।' বইয়ের নাম কি হবে সেও ঠিক হয়ে গেল। বেগম সমরুর প্রথম জীবনের কথা কোনো নীতিবোধক গ্রন্থে স্থান পাবার মত নয়। প্রথম বয়সে তাঁর বহু প্রণয়ী ছিল। বেগম সমরু তাঁদের মধ্যে স্বভাবতই অনেককে নিরাশ করেছিলেন। তাঁরা বেগমের উপর রাগ করে 'Witch' অর্থাৎ ডাইনী আখ্যা দিয়েছিলেন। ঠিক হল যে বই লিখব তার নাম হবে 'The Witch of Sardhana'। তাঁর বিফল প্রণয়ীদের মধ্যে আর একটি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে বেগমের গায়ের ওড়না কারুর গায়ে লাগলে তার সর্বনাশ। আমার মনে হল এই অসাধারণ চরিত্রটির কথা লিখবার চেষ্টা করলে ভাল হয়।

অক্সফোর্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা কয়েক শতাব্দী ধরে প্রচার হয়ে আসছে। অক্সফোর্ডের সঙ্গে আগে আমার অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল কিন্তু সে পরিচয় খুব সংক্ষিপ্ত। কেমব্রিজে গিয়ে আমার মনে হল এরকম সুন্দর জায়গা খুব কম আছে। প্রথম যৌবনে দেখা ইটালির কথা আমার মনে হয়েছিল।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে রেলের টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। টিকিটটি কাজে লাগল না। তারাপদ মুখোপাধ্যায় আমাকে তাঁর গাড়িতে কেমব্রিজে পৌঁছে দিলেন। যাবার সময় অক্সফোর্ড স্ট্রিট ও টটেনহাম কোর্টের মোড়ে লায়নস্ কর্নার হাউস থেকে চিকেন রোস্ট ও আলুভাজা কিনে নিয়ে যাওয়া হল। কাজেই কেমব্রিজ যাত্রা অনেকটা পিকনিকের মত দাঁড়াল। তারাপদ তো আমাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলেন, আমি প্রথম কয়েকদিন সেণ্ট জনস্ কলেজে ছিলাম। সকালবেলা স্নান হবার সঙ্গে সঙ্গে একজন পরিচারক এসে বলল

'Your breakfast is ready, Sir.' আমার মনে হল এত আরাম কখনও পাইনি। দু'তিনদিন পরেই আমার একটা থাকবার পাকা ব্যবস্থা করতে গিয়ে মুশকিল হল। কেমব্রিজে কয়েকটি জায়গায় ঘর খালি ছিল কিন্তু দেখে পছন্দ হল না। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমার ঘরের ব্যবস্থা করা হল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশ-কুড়ি মাইল দূরে গ্রামে এক সময়কার বড়লোকের পুরনো বাড়ি। একশ বছর কিংবা তারও আগে ইংলণ্ডের গ্রামের চেহারা কেমন ছিল তার একটি পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়িটির কাছে একটি ছোট দোকান, তাতে সবই পাওয়া যেত। তখন অবশ্য দোকানটিতে পৌঁছনো কঠিন, কিছুদিন আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আমার প্রধান সমস্যা হল কি করে কেমব্রিজে যাব। বিশ্ববিদ্যালয় ধরে নিয়েছিলেন আমার নিশ্চয়ই গাড়ি চালাবার লাইসেন্স আছে। এই অঞ্চল থেকে একটিমাত্র বাস খুব সকালে কেমব্রিজের দিকে যায় কিন্তু এত সকালে যে যাওয়া সম্ভব নয়। এইরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে এবং মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠছি এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের তুরস্কের ইতিহাসের অধ্যাপিকা ডঃ সুসান স্কিলিটার (Dr. Susan Skilliter) একবার এই বাড়ি দেখতে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে অল্প পরিচয় হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এখান থেকে যাতায়াত করবেন কি করে?' আমি বললাম, 'সেটাই তো সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোও কলেজে ঘর খালি নেই।' ভদ্রমহিলা বললেন, 'ওরকম সবাই বলে।' এই বলে চলে গেলেন। দু'দিনের মধ্যে খবর পেলাম যে চার্চিল কলেজে আমার ঘর ঠিক হয়ে গেছে। চার্চিল কলেজ তখন খুব আধুনিক বলে নাম ছিল। বাড়ির গড়ন এবং নিয়মকানুন সবই একটু অন্যরকম। কলেজে যাদের থাকতে হয় তাদের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। চার্চিল কলেজে সেরকম কঠিন নিয়ম ছিল না। একটিমাত্র নিয়ম ছিল, মেয়েরা স্টীলটো হিল পরে ভিতরে আসতে পারবে না। সব ইউনিভার্সিটির বাড়িতে রাত্রি হয়ে গেলে ঢুকবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তারপর নামটাম সই করে ঢুকতে হয়। এখানে সেরকম কিছু ছিল না, ঢুকবার দরজা খোলা। প্রধান রাস্তার বড় দরজার কপাট পর্যন্ত ছিল না। তবে ছাত্রদের ফিরতে বেশি দেরি হলে বোধহয় বলতে হত। আমার ঘরের সঙ্গে একটি ছোট প্যানট্রি ও একটি ছোট রেফ্রিজারেটর ছিল। কোনটিই আমার কাজে লাগত না। এইখানে এসে তো অধিষ্ঠিত হলাম। প্রতি মাসে কয়েকদিন হাই টেবিল খেতে হত। তখন বহু অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ ছিল। এইটাই হাই টেবিলে খাওয়ার যুক্তি। একথা অবশ্য ভোলা কঠিন ছিল যে কয়েক হাত দূরে ছাত্ররা যা খাচ্ছেন সে খাবারে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় কিন্তু অধ্যাপকদের খাবারের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। অধ্যাপকরা ডিনারের পরেই পাশের একটি ঘরে বসতেন। সেখানে ফল ও নানা পানীয় সহযোগে উচ্চচিন্তা করবেন এই আশা করা হত। অন্যান্য কলেজের হাই টেবিলে গিয়ে এত জাঁকজমক দেখিনি। সেন্ট জনস্ কলেজে দেখেছি সেখানে বোধহয় মাসে একদিন ডিনারের পর অধ্যাপকরা একটি ঐতিহাসিক সোনার কৌটো থেকে নস্যি নিতেন। যে কথা ভোলা কঠিন সে হচ্ছে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকদের খাবারের মানের এত তফাৎ।

ভাল থাকবার জায়গা পেয়েছিলাম কিন্তু তাতে আমার সব সমস্যার সমাধান হয়নি। যে সব কাগজপত্র দেখা আমার দরকার সে সব লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। প্রতিদিন সকালের ট্রেনে আমাকে লণ্ডনে আসতে হত। সন্ধ্যেবেলা আবার কেমব্রিজে ফিরে যেতে হত। খরচের কথাও না ভেবে উপায় ছিল না। যখন ফিরতাম তখন কলেজে ডিনার বন্ধ হয়ে যেত। কলেজের খুব কাছে একটি পুরনো ধরনের হোটেল আছে কিন্তু সেখানকার খাবারে কোনো স্বাদ পাওয়া যেত না। জে· বি· প্রিস্টলি তাঁর প্রবন্ধ ও উপন্যাসে এই ধরনের হোটেলের কথা, তার 'soggy vegetables', ও 'watery coffee'র কথা অনেকবার লিখেছেন। এই সব হোটেলে দু'একবার গেলে আর যাবার ইচ্ছা হবে না। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম যে, ফেলোদের একাডেমিক ইয়ারে অন্তত এক টার্ম কলেজে থাকতে হবে। সেই টার্মে অবশ্য লণ্ডন-কেমব্রিজ রোজ ছুটোছুটি করা ছাড়া উপায় ছিল না। লণ্ডনে থাকবার জন্য বাড়ি খোঁজা আর এক সমস্যা। ১৯৫৭ সাল থেকে যে কয়েকবার লণ্ডনে গিয়েছি একই ল্যাণ্ডলেডির আশ্রয়ে থাকতাম। সে কথা আগে বলেছি। জানা ছিল যে সে-বাড়িতে আমার জন্য একটি ঘর থাকবে। কিন্তু এইবার তাতে অসুবিধা দেখা দিল। আমার আশ্রয়দাত্রী ব্রাইটনে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত আমার জন্য একটি থাকবার জায়গা ব্যবস্থা করে দিলেন। ইস্ট ফিঞ্চলে টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে কয়েক মিনিট হাঁটলেই 'টিউডর হোটেলের' বাড়ি। বছরখানেক আগে যখন এসেছিলাম তখন হোটেল চলতে দেখেছি। হোটেলটির দরজা এবার দেখলাম বন্ধ হয়েছে। একটি ট্রাস্ট নতুন মালিক। নতুন ব্যবস্থায় এটি সাধারণত ডাক্তারি ছাত্র ও ডাক্তারদের থাকবার জায়গা। ডাক্তার ছাড়াও অন্য লোকদের জন্য কয়েকটি ঘর রাখা হত। তার একটিতে আমি অধিষ্ঠিত হলাম। এখানে থেকে লণ্ডনে কাজকর্ম করার সুবিধা ছিল। এ-পাড়াও আমার পূর্ব পরিচিত। এইভাবে লণ্ডন ও কেমব্রিজ দু'জায়গায় বসবাস করতে করতে এক বছর কেটে গেল। কাজকর্মের কি হল ? আগেই বলেছি অর্ধেকের বেশি কাজ আমার দেশে থাকতেই হয়ে গিয়েছিল, তথ্য সংগ্রহে যে সব ফাঁক ছিল তা পূরণ করতে বেশি সময় লাগেনি। বছরখানেক পরে ফিরে এলাম। সেই কাগজপত্র সব স্তূপীকৃত হয়ে আছে। এখনও পর্যন্ত বই লেখা আরম্ভ করতে পারিনি। এইবার করতে পারব আশা হচ্চে।

দেশে ফিরে আসার পর থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু পরিবর্তন হতে আরম্ভ করল। ডঃ ত্রিগুণা সেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে চলে গেলেন। সেখান থেকে দিল্লির মন্ত্রিসভায়। যাদবপুরে উপাচার্য হলেন অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ। তখন থেকে প্রায় আট বছর পরে যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিলাম তখনও হেমচন্দ্র গুহ উপাচার্য ছিলেন। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন বৃদ্ধি ও আর্টস ফ্যাকালটি বড় হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একটি করে মহাফেজখানা গড়ে তোলা উচিত। তার প্রাথমিক কাজও আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু বেশিদূর এগোয়নি। শেষের কয়েক বছর আর্টস ফ্যাকালটির ডিনের কাজও করেছি। তার

সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক ছিলাম এবং পরে সাধারণ সম্পাদক। পরিশ্রম বেশি হচ্ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক সময় তাতে মন প্রসন্ন থাকে। ১৯৭০ সাল কিংবা তার পূর্ব থেকেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বদলে যেতে আরম্ভ করল। ছেলেরা অনেকে এবং কয়েকজন মাস্টারমশায় রাজনীতির প্রভাবে পড়েছিলেন এবং পড়ানো কিংবা গবেষণার কাজে কিছু শৈথিল্য এসেছিল। এই সমস্যা অল্পবিস্তর সব বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখা দিয়েছিল। খবরের কাগজের কল্যাণে একটি নতুন শব্দ আমদানি হয়েছিল, বোমাবাজি। সে জিনিস কী তা প্রত্যক্ষ দেখতে হয়েছিল। একটি ছেলে, তার নাম করব না, খুব কাছ থেকে দেখেছি কীভাবে জড়িয়ে পড়ছে। সে একদিন ইতিহাস বিভাগে আমার ঘরে এসে বলল, 'স্যার, এই থলিটা আপনার ঘরে রেখে যাচ্ছি।' একটা র‍্যাশনের থলি। তখন ছেলেরা কেউ কেউ র‍্যাশন ব্যাগ নিয়ে ঘোরাঘুরি করত। আমি তাকে বললাম, 'আমার ঘরে রাখতে হবে না। অন্যত্র নিয়ে যাও।' ব্যাগে বিশেষ কিছু থাকতে পারে আমার সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহ

অরবিন্দ ভবন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

করে বোধহয় ভুল করিনি। যখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম তখন কাগজে পড়েছিলাম ছেলেটিকে উত্তরবঙ্গে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে। আরও সাত-আট বছর পরে শীতকালের এক অপরাহ্নে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হ'ল গঙ্গার ধারে যেখানে রেস্তরাঁ আছে তার কাছে। সঙ্গে একটি মেয়ে। আমাকে বলল, 'আমি বিয়ে করেছি।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন কী করছ ?' বলল, 'এখন নর্থ বেঙ্গলে আছি।' পুরনো ছাত্রকে দেখে খুশি হইনি একথা ভাবলে ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন কারুর মনে শান্তি ছিল না। একবার এঞ্জিনিয়ারিং ও সায়েন্সের অধ্যাপকদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংএ ঘেরাও করে রাখা হল। তার আগে আমাদের একটি মিটিং ছিল। মিটিং শেষ হলে আমাদের ফ্যাকালটির অধ্যাপকরা বেরিয়ে গেলেন। তখন শুনলাম উপাচার্যসুদ্ধ সায়েন্স ও টেকনোলজির অধ্যাপকদের ঘেরাও করা হবে। আমার এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ার কথা নয়। আমার মনে হল যেখানে উপাচার্য ঘেরাও হচ্ছেন সেখানে ডিনদের তাঁকে পরিত্যাগ করে যাওয়া উচিত হবে না। এরকম অভিজ্ঞতা আমার প্রথম। একটু পরে বুঝতে পারলাম এরকম জিনিস যে হতে পারে তার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত ছিলেন। দরজা বাইরে থেকে এবং ভিতর থেকে বন্ধ, কিন্তু ঘরের এক কোণে কিছু খাবার জমা করা আছে। ঘরের সঙ্গে একটি হাত-মুখ ধোবার জায়গা। সেখানে যাতে জলের পাইপ কেটে দেওয়া না হয় তার জন্য বাইরে পাহারার ব্যবস্থা আছে। যতদূর মনে হচ্ছে প্রথমে আমরা এক পেয়ালা চা খেয়ে নিলাম মনোবল ঠিক রাখতে। রাত্রের খাবারও আগে থেকে ঠিক করা ছিল ঘরের মধ্যে। ঘরে আরামদায়ক চেয়ার। যাঁরা বসে ঘুমোতে অভ্যস্ত তাঁদের কোনো অসুবিধাই হয়নি। পরের দিন সকালে ভোর না হতেই জানালা দিয়ে খবরের কাগজ বিতরণ হল। বাড়িতে এত ভোরে কখনও কাগজ পড়তে পাইনি। চায়ের সঙ্গে জলখাবারের ব্যবস্থাও ছিল। ইতিমধ্যে জানালা দিয়ে জবাকুসুম তেল এবং যাঁদের ব্লাডপ্রেসার বাড়বার আশঙ্কা আছে তাঁদের জন্য কয়েক বড়ি 'অ্যাডলফিন' এসে পৌঁছল। দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা ছিল, সেও খারাপ নয়। দুপুরে খাবার সময় একজন অধ্যাপক স্টুয়ার্ডের মতো কালো টাই বেঁধে রাত্রে কে কী খাবেন লিস্ট করে নিতে লাগলেন। প্রায় সবাই বললেন, মুরগি খাব। কোন্ গুপ্ত ব্যবস্থায় আসত জানি না। ইতিমধ্যে বন্দীমুক্তির উপায় ভাবা হচ্ছিল। ওখান থেকেই কী করে খবর দেওয়া হল মনে নেই। বিকাল চারটের আগে বড় এক অধ্যাপকের দল উত্তরদিকে কলেজবাড়িগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলেন। আমরা মুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগলাম। মনে হল সিপাহি যুদ্ধে লখনউয়ের অবরোধ মোচনের দৃশ্য দেখছি। অনেক দূর থেকে ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক জগদীশনারায়ণ সরকার তাঁর ছাতা কাঁধের উপর গদার মতো ঘোরাতে ঘোরাতে দ্রুত বেগে আসছেন। তাঁর সঙ্গে অন্য অধ্যাপকরা। তাঁরা এসে পৌঁছলে ভিতরের দল দরজা খুলে বেরোবার চেষ্টা করলেন। সামান্য ঠেলাঠেলি হল, যাকে ইংরেজিতে বলে স্কাফ্‌ল। তার চেয়ে বেশি কিছু দরকার হয়নি। শুধু এক ভদ্রলোক সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি তারস্বরে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। এর চেয়ে মারাত্মক কিছু ঘটেনি।

এত সহজে গোলমাল মিটল না। দিন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের অবস্থা দুর্বল হতে লাগল। একদিন রাত্রে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বাড়ি ফিরে এসে শুনলাম, হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সি আর পি মোতায়েন করা হবে। উপাচার্য সেই রাত্রেই কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছেন এবং আমাকে অস্থায়ী উপাচার্য করা হয়েছে। পরদিন সকাল দশটায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম তখন দেখলাম, সি আর পি পাহারা বসিয়েছে। এই অবস্থায় আমি একমাস ছিলাম। তার মধ্যে কোনো গোলমাল হয়নি। অস্বাভাবিক সময়। কিন্তু তার মধ্যে রেজিস্ট্রার প্রবীর বসুমল্লিক সর্বদা সাহায্য করেছেন। আমি তখন সকালে দু'একটি ক্লাস নিতাম। তারপর বারোটার সময় অরবিন্দ বিল্ডিং-এ উপাচার্যের ঘরে গিয়ে বসতাম। সেখানেও যথেষ্ট কাজ ছিল না। কাজেই আমার নিজের লেখাপড়ার কাজ কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। ছেলেরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে আসত নানা রকম দাবি নিয়ে। সে সব দাবি পূরণ করা কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা নিয়ে কোনো গোলমাল হয়নি। কিন্তু কোনো কোনো সময় তা হবার সম্ভাবনা ছিল। তাদের পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার কথায় কান দিচ্ছি না দেখে একটি ছেলে আমাকে বলেছিল, এমন করলে আপনি ইউনিভার্সিটি চালাতে পারবেন না। আমার অভিজ্ঞতা যে সব কিছু দাবি মেনে নিয়ে এবং সবাইকে প্রসন্ন রেখে বিশ্ববিদ্যালয় চালানো সম্ভব নয়। একমাস পরে শুনলাম অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ ফিরে আসছেন। যেদিন ফিরে আসবার কথা সেদিন আর আমি অরবিন্দ বিল্ডিং-এ যাইনি। বোধহয় সেই দিনই রাত্রে বাড়ি ফিরে শুনলাম বিকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অরবিন্দ বিল্ডিংয়ের সামনে সি আর পি এবং কিছু ছাত্র ও বাইরের লোকের সঙ্গে মারামারি হয়েছে, এবং তার ফলে বোমা ও গুলি চলেছে। বেশি রাত্রে অধ্যাপক গুহ টেলিফোনে আমাকে এই ঘটনাটি জানালেন এবং অনুরোধ করলেন পরদিন সকালে আমি যেন এস· এস· কে· এম· এবং দক্ষিণ কলকাতার অন্যান্য হাসপাতালে গিয়ে খবর নিই। তাঁকে বলা হয়েছিল অনেক লোক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাঁর কথামতো এস· এস· কে· এম·, বাঙ্গুর হাসপাতাল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল এবং আরও দু'এক জায়গায় খোঁজ নিয়ে জানলাম হাসপাতালে কেউ নেই। দু'পাঁচ জন এসেছিল, তাদের ফার্স্ট-এড নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনা একরকম মিটে গেল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ অবস্থার উন্নতি হল না। এই সময় বিশ্বভারতীতেও নানা রকম অশান্তি দেখা দিতে আরম্ভ হয়েছিল। তার চরিত্র অন্য রকম। কয়েক দিন পরে এক সন্ধ্যায় বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য এবং গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ রণজিৎ রায় উপস্থিত হলেন। তাঁদের বক্তব্য কালিদাসবাবু আর উপাচার্য থাকতে রাজি নন। তাঁর জায়গায় আমাকে নিতে অনুরোধ করলে আমি সম্মত হব কি না। যাদবপুর ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না। প্রথমবারে আমি রাজি হতে পারিনি। ভেবেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা দিতে পারে। কিন্তু সমস্তক্ষণ যদি অশান্তি চলতে থাকে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের লেখাপড়ার কাজ করাও সম্ভব নয়। এর কিছুদিন পরে বিশ্বভারতী থেকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ জানানো

হল আমি যেন তাদের প্রস্তাব আবার বিবেচনা করি। এই প্রস্তাব নিয়ে পুলিনবিহারী সেন ও অন্য আর একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। এবার তাঁদের বললাম যে, আমি প্রস্তাবটি ভেবে দেখতে প্রস্তুত আছি। ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনার ফলে আমার মন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিরূপ হয়েছিল। এক ছুটির দিন আমাকে যোধপুর পার্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার একজন সদস্যের বাড়িতে যেতে বলা হল। উপাচার্য, অধ্যাপক গোপাল সেন, গৃহস্বামী ও অন্যান্য দু'একজন ছিলেন। সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হল আমি যাদবপুরে উপাচার্য হতে রাজি আছি কিনা। আমি এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। শুনলাম অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ অবসর নিচ্ছেন, তাঁর জায়গায় কাউকে দরকার। কয়েক বছর পূর্বে যখন ডঃ ত্রিগুণা সেন উপাচার্য ছিলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সভায় তিনি জানিয়েছিলেন তিনি অবসর নিতে চান, এবং এবার যিনি উপাচার্য হবেন তিনি সায়েন্স কিংবা টেকনোলজির অধ্যাপক হবেন এটা উচিত নয়। আর্টস ফ্যাকালটির কেউ হলেই ভাল। এই প্রসঙ্গে তিনি অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও আমার নাম উল্লেখ করে বললেন, তিনি চ্যান্সেলারকে এই কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠিটি আমাদের পড়ে শোনালেন। তখন আমরা খুবই অবাক হয়েছিলাম।

যোধপুর পার্কের বাড়িতে সকালবেলায় যখন আমার কাছে প্রস্তাব করা হল তখন আমার মনে হল রাজি হওয়া উচিত হবে না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সায়েন্স বা টেকনোলজির লোক না হলে কাজ করা সম্ভব নয়। সে বিশ্বাস আমার এখনও আছে। আমার ধারণা হল কেউ কেউ ভাবছেন আমি বিশ্বভারতীর প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হয়েছি। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম যদি আমাকে পড়াতে এবং গবেষণা করতে দেওয়া হয় এবং ইতিহাস বিভাগকে নিজের মতো গড়তে দেওয়া হয়, তাহলে এ জায়গা ছেড়ে যাবার কথা ভাবব না। আমার অনুমান আমার কথা তাঁরা বিশ্বাস করেননি। যাই হোক, এই আলোচনায় স্পষ্ট হল যে, যাদবপুরে উপাচার্য হবার কোনো আগ্রহ আমার নেই। মনে হল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা আমার উপর একটু বিরক্ত হলেন। যাঁর বাড়িতে এই সভা হচ্ছিল তিনি বললেন, ওঁকে ছেড়ে দিন। ওখানে গেলে ওঁর উন্নতি হতে পারে। ভবিষ্যতের উন্নতির মোহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাইনি।

কলকাতা ও যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করবার সময় অনেক ভিন্ন রকম কাজ করতে হয়েছে। তার মধ্যে ফিল্ম সেন্সরের কাজ একটি। সময় নষ্ট হত, কিন্তু করতে যে ভাল লাগত না তা নয়। ফিল্ম সেন্সরিং-এর সময় সাধারণত সকালের দিকে দশটা-এগারোটার সময়। তখন নিয়ম ছিল যে, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ যে-কোনো জায়গায় ছবি সেন্সর হলেই দেশের সর্বত্র সে ছবি দেখানো যেত। তবে কেউ আপত্তি করলে সেই সব ছবি আবার আঞ্চলিক সেন্সার বোর্ডকে দেখাতে হত। সেন্সরিং কীভাবে করা উচিত এবং কারা এই বোর্ডের সদস্য হতে পারে এ সম্বন্ধে একটি আইন ছিল। প্রথম দিকে দেখেছি

কলকাতার পুলিশ কমিশনার এই বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। সাধারণত সেন্সরিং করবার সময় একজন সদস্য উপস্থিত থাকলেই হত। তাঁর সঙ্গে আর একজন থাকতেন, তিনি পুলিশের লোক, কাগজপত্র রাখতেন। আমি যখন প্রথম সেন্সরের কাজ আরম্ভ করেছি, স্বাধীনতার পরে প্রথম মন্ত্রিসভা তৈরি হয়েছে, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী। যাঁরা সদস্য হতেন তাঁরা দু'তিন বছরের জন্য থাকতেন। পরে তাঁদের আবার নেবার কোনো বাধা ছিল না। আমি এরকম বার দুয়েক সেন্সরের কাজ করেছি। সেন্সরের কাজ শুনতে যত ভাল আসলে কাজে তত নয়। প্রথমে তো সকালবেলায় অনেকটা সময় নষ্ট হয়। তখন সকালে কিংবা বিকালে অধিবেশন হত। সাধারণত নিউ এম্পায়ারের উপরে মিনি থিয়েটারে সেন্সরের কাজ হত। এছাড়া উত্তর কলকাতার কোনো কোনো প্রেক্ষাগৃহেও হয়েছে। যাঁরা সেন্সর বোর্ডের সদস্য তাঁদের নানা রকম প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া হত। মাঝে মাঝে খুব মজার মজার জিনিসও দেখেছি। একটি ব্রিটিশ ছবি কলকাতার সেন্সরে ছাড়পত্র পেল না। একটি ছবি পূর্ব ভারতে বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে অনেক আর্থিক ক্ষতি। যাঁরা ছবি তৈরি করেছিলেন তাঁরা বললেন যে, সেন্সরের কাজ ঠিক হয়নি। এই রকম নালিশ হলে পুরো বোর্ডকে বসে ছবিটি দেখতে হয়। ছবিটি আগাগোড়া দেখে মনে হল, এত ভাল ছবি খুব কম দেখেছি, এবং ছবির একটি ইঞ্চিও বাদ দেওয়া উচিত নয়। যাকে টেকনিক্যাল গুণ বলে তার কোনো ত্রুটি নেই। অভিনয় এবং ডিরেকশন সবই ভাল। আমরা আপত্তিজনক কিছুই পেলাম না। ইংলণ্ডের রেস্টোরেশন পিরিয়ড এবং তখনকার জীবনযাত্রাই ছবির পটভূমি। যিনি দেখে আপত্তি করেছিলেন তাঁর সেই সময়কার বিয়ার পানের দৃশ্য এবং ভোজের সময় গোরু ও শূয়োরের রোস্ট নিয়ে আসা রুচিকে আহত করেছিল। দেখা গেল, তিনি ইংরেজি যথেষ্ট ভাল জানেন না, কাজেই সংলাপ ভাল করে বোঝেননি। কোম্পানি আপত্তি না করলে এ-ছবি আটকে যেত। তবে কি সেন্সরশিপ প্রথা তুলে দেওয়া উচিত? আমার তা মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে আর একটি গল্প বলি। এর কিছুদিন পরে বোম্বাইয়ের একটি ছবি কলকাতায় দেখানো আরম্ভ হল। ছবিটিতে বেশ ভিড় হচ্ছিল। সেই নামে আরও একটি ছবি অল্পদিন আগে হয়েছে। তার সঙ্গে আশা করি পুরনো ছবির কোনো যোগ নেই। যখন পুরনো ছবিটি দেখানো হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে তখন কাগজওয়ালারা কোনো কোনো বিষয়ে ক্ষীণ আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু তেমন কিছু নয়। এই ছবি বোম্বাইয়ে সেন্সর হয়েছে, সুতরাং আমাদের বিশেষ কিছু করবার ছিল না। কিন্তু একটি কাগজ লিখল, তাঁরা খুব আশ্চর্য হয়েছেন যে বোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে এ-ধরনের কুৎসিত ছবি দেখানো হচ্ছে। এই উক্তির পরে ছবিটি না দেখে আর উপায় ছিল না। বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের কাছে একটি কার্ড থাকত, সেটি দেখিয়ে তাঁরা ছবিঘরে ঢুকতে পারতেন। কিন্তু এই কার্ডধারীদের, আমার সন্দেহ হত, সিনেমাওয়ালারা খুব সুনজরে দেখতেন না। কাজেই এই কার্ড আমি ব্যবহার করতাম না, সাধারণ দর্শকের মতো টিকিট কেটে যেতাম। ছবিটি আমি দক্ষিণ কলকাতার একটি সিনেমা হলে দেখলাম। আমার

দেখে মনে হল, ছবিটি যাকে অশ্লীল বলে তা হয়তো নয়, তবে যাকে ভালগার বলে পুরোপুরি তাই এবং বোম্বাই সেন্সর বোর্ড ছাড় করে দিলেও এ ছবি দেখানো উচিত নয়। বাড়িতে এসে সেই মর্মে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লিখলাম। তার ফলে পুরো সেন্সর বোর্ডকে এই ছবিটি দেখতে হল। যাঁরা ছবি দেখাচ্ছিলেন তাঁদেরও কাউকে কাউকে থাকতে হয়েছিল। সেন্সর বোর্ড ছবিটিকে দেখাতে অনুমতি দিলেন না। তবে সব সময় এভাবে এত সহজে কোনো জিনিসের সমাধান হয় না। মনোজ বসুর 'ভুলি নাই' বলে একটি বই আছে। এই গল্প নিয়ে একটি ছবি তোলা হল। খুব ভাল অভিনয়, ডিরেকশন এবং ফটোগ্রাফি। রাধামোহন ভট্টাচার্য, বিকাশ রায় ও সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় খুব ভাল অভিনয় করেছেন। ছবিটি প্রথমে আমি দেখিনি, যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা কোনো কোনো কারণে ছবিটি আপত্তিজনক মনে করেছিলেন। তার ফলে পুরো সেন্সর বোর্ড আবার বসল। আপত্তির কারণ কিছু কিছু ছিল, যেগুলো সরকারপক্ষ থেকে গুছিয়ে বলা হয়েছে। এর ফলে ছবির শেষের দিকে অনেক বদলানো হল। তাতে অবশ্য ছবির শ্রীবৃদ্ধি হয়নি। বিদেশে যারা ছবির প্রযোজক, তারা নিজেরা খানিকটা সেন্সরিংয়ের কাজ করে। আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা নেই। কাজেই সেন্সরিং তুলে দেওয়া উচিত একথা বলা কঠিন।

আমার স্কুল-কলেজের বন্ধুদের কথা কিছু কিছু বলেছি। বেশি বয়সে নতুন করে বন্ধুত্ব হয় না। কিন্তু পরিণত বয়সেও মনের মতো বন্ধু কখনও কখনও পাওয়া যায়। তার দৃষ্টান্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। শরদিন্দুবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল যখন পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের প্রথম যুদ্ধ কেবল আরম্ভ হয়েছে। তাঁর লেখার সঙ্গে অবশ্য অনেকদিনের পরিচয়। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম ব্যোমকেশের গল্প এবং অন্যান্য উপন্যাস ও ছোট গল্প এবং 'শনিবারের চিঠিতে' ছদ্মনামে লেখা কবিতা রসিক পাঠকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি। প্রমথনাথ বিশী আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দিন প্রমথনাথ বিশী কেয়াতলা লেনে আমাকে নিয়ে তাঁর বাড়ির চারদিক ঘুরলেন, কিন্তু পরিচিত বাড়িটি খুঁজে পেলেন না। আমাকে বললেন, 'এখানেই তো ছিল, গেল কোথায় ?' তিনচার দিন পরে আমাকে নিয়ে পরিচিত বাড়ির সামনে এসে বললেন, 'এই তো সে বাড়ি দেখছি।' এমনভাবে বললেন যেন বাড়িটি কোথাও চলে গিয়েছিল, এখন স্বস্থানে ফিরে এসেছে দেখে খুশি হয়েছেন। তখন বছরে একবার করে শরদিন্দুবাবু সস্ত্রীক কলকাতায় এসে তাঁর ছেলের বাড়িতে কিছুদিন থাকতেন। সেবার শরদিন্দুবাবু যতদিন কলকাতায় ছিলেন, প্রায় প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। সে সময় আমাকে মাঝে মাঝে কাজে বোম্বাই যেতে হত। প্রথমবার বোম্বাই থেকে পুনায় গিয়েছিলাম। দেখলাম শরদিন্দুবাবু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। পরে একবার ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় পুনায় গিয়েছিলাম। শরদিন্দুবাবু লিখেছিলেন, ভালই হয়েছে, আপনাদের কংগ্রেসের অধিবেশন আমার বাড়ির খুব কাছেই হবে। ডেলিগেটদের শিবিরে পৌঁছে বিছানাপত্র খুলছি এমন সময়

শরদিন্দুবাবু এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে ব্যবস্থা বিশেষ ভাল ছিল তা বলব না। তবে শিবাজির মাওলি সেনাদের কষ্ট হত না। কিন্তু শরদিন্দুবাবু আমাকে একটি ফটফটিয়ায় তুলে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। তারপর আর কখনও পুনায় গিয়ে অন্যত্র উঠবার চেষ্টা করিনি। পুনায় যতবার গিয়েছি, সে সব দিন আনন্দ দিয়ে ঘেরা। নিজে বারে বারে চা খেতেন বলে তাঁর গৃহিণী তাঁর জন্য একটি ছোট কফিকাপ বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন। সেই কফিকাপের চেয়ে বড় পাত্র তাঁকে দেওয়া হত না। পরে যতবার কলকাতায় এসেছেন, দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তীর বৌবাজারের বাড়ি কিংবা নিউ আলিপুরের নতুন বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমাদের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র ছিলেন বইয়ের পাতার ডিটেকটিভরা কিংবা আসামিরা। সেই বন্ধন দৃঢ়তর হয়েছিল ব্যোমকেশ ও সত্যবতীর জন্য। আমার উৎপীড়নে ব্যোমকেশ—সত্যবতীকে একটি বাড়ি করিয়ে দিয়েছিলেন কেয়াতলা পাড়ায়। কিন্তু ব্যোমকেশকে গাড়ি কিনিয়ে দিতে রাজি হননি। লিখেছিলেন, আমি ওর কোষ্ঠী দেখেছি, কোষ্ঠীতে গাড়ি নেই। শেষ পর্যন্ত খুব বিরক্ত করায় একটি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি কিংবা ট্যাক্সি কিনে দেবার কথা ভাবছিলেন। তাও খুব প্রসন্ন মনে নয়। পুনা থেকে আমাকে একটা পোস্টকার্ড লিখেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সত্যবতীকে ফাঁকি দিয়ে একটি গাড়ি করিয়ে দেওয়া যাবে। এর জন্য আমার উপর প্রতিশোধ নেবারও চেষ্টা করেছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন, সত্যবতীর গাড়ি হবে, কিন্তু একটা খুনের মামলায় পুলিশ আপনাকে কিরকম নাস্তানাবুদ করে দেখবেন। গল্পটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। পুলিশ আমাকে কি করেছিল তাঁর লেখা থেকে জানতে পারিনি। আমাকে লেখা এই শেষ চিঠি।

•

কলকাতায় যখন বড় দাঙ্গা হয় ১৯৪৬ সালে, তার অনেক আগে থেকে নলিনচন্দ্র পালচৌধুরীর সঙ্গে আমাদের পরিবারের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। দাঙ্গার সময় সে একটি মুসলমানপ্রধান অঞ্চল থেকে এসে সপরিবারে আমাদের বাড়িতে ছিল। নলিনের তখনও বিয়ে হয়নি। তার মা ছিলেন না, কাজেই আমার মা'ই তার বিয়ের উদ্যোগ করে দিয়েছিলেন। সে আমাদের বাড়ি থেকেই বিয়ে করতে গিয়েছিল। নলিন কখনও এসব কথা বিস্মৃত হয়নি। নলিন এখন নেই, কিন্তু তার কাছে আমাদের অনেক ঋণ।

যাদবপুর ছেড়ে আসবার আগে আর একবার বিদেশে গিয়েছিলাম, অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া যাবার আমার সেরকম কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। ছেলেবেলায় অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে যে সব খবর পেতাম, সে মুখরোচক নয়। ১৯৬৮ সালে অস্ট্রেলিয়ায় কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকা হয়। সাধারণত এই সব সম্মেলনে উপাচার্যরাই আসেন। যাদবপুরের উপাচার্য নিজে যেতে না পারায় আমাকে যেতে বললেন। আমি তখন যাদবপুরের আর্টস ফ্যাকালটির ডিন-এর কাজ করছি।

কোনো সম্মেলনে যাওয়া মানেই খুব অল্পদিনের জন্য যাওয়া। তাতে কোনো

দেশ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না। বিশেষত অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে আমাদের মনে ছেলেবেলা থেকেই কিছু পরিমাণে বিরাগ সঞ্চিত ছিল। মনে পড়ে অনেকদিন আগে 'প্রবাসী'তে অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। প্রবন্ধটির বিষয় কিছু মনে নেই। প্রবন্ধটির প্রথম পাতায় অস্ট্রেলিয়ার একটি মানচিত্র আঁকা, তার উপরে খুব বড় অক্ষরে 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা। সেই কথা মনে আছে। আজকাল অবশ্য এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তাহলেও অস্ট্রেলিয়ায় বসতি এখনও সামান্য এবং বিদেশী লোকের সংখ্যা খুব কম। অস্ট্রেলিয়া যাওয়া উপলক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হল। না হলে ব্যাঙ্কক, কুয়ালালামপুর, হংকং প্রভৃতি জায়গা না দেখা থেকে যেত। মেলবোর্নে আমাদের অধিবেশন হল। সেখানে ছ'সাত দিন ছিলাম। এত অল্পসময়ে আমার ধারণা যে নির্ভুল হবে একথা মনে করি না। আমার মনে হয়েছিল যে, মেলবোর্ন শহর খানিকটা আধুনিক, বাকি অংশ দেখলে মনে হয় মহারানী ভিক্টোরিয়া এখনও বেঁচে আছেন, অনেক পাড়ায় সেইরকম বাড়িঘর এবং দোকানপাটের চেহারা। আর একটি জিনিস চোখে পড়েছিল যে, যদিও ট্যাক্সি চাইলেই পাওয়া যায়, তবু শুধু একজন যাত্রী হলে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে যাওয়াই রীতি। পিছনের সিট খালি থাকে। এইখানে ব্রতিশঙ্কর রায় এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হল। অধিবেশনের শেষ দিন সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ ডেলিগেটদের ডিনার দিলেন। তার আগে আমাকে একজন কর্মকর্তা অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করেছিলেন ডেলিগেটদের মধ্যে কাদের সঙ্গে আমি পরিচিত হতে চাই। আমি সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নাম বললাম। তিনিও ইতিহাসের লোক। বি· বি· সি-র সরকারি ইতিহাস তাঁর লেখা। বইটি তার অল্পদিন আগে পড়েছিলাম। ডিনারের সময় দেখি এক টেবিলে অধ্যাপক ব্রিগস এবং তাঁর স্ত্রীর আসন দেওয়া হয়েছে। দেখে মনে হল বিখ্যাত অভিনেতা চার্লস লটনের অল্পবয়সের চেহারার সঙ্গে তাঁর মিল আছে। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর তিনি আমাকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর একটি ইতিহাস লিখতে বললেন। সরকারি ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমার একবার হাত পুড়েছে কাজেই খুব উৎসাহ দেখালাম না। আর একটি কারণে এই ডিনার মনে থাকবে। আগে কখনও অয়েস্টার খাইনি, এই প্রথম চেখে দেখলাম। নিশ্চয়ই খুব ভাল অয়েস্টার, কিন্তু আমার বর্বর রুচিতে মনে হল যাচ্ছেতাই। কাঁচা মাছ, মাংস কিংবা গুগলি খাওয়া আমাদের অভ্যাস নেই। আমার আগে টেবিলের অয়েস্টার সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলল। ফেরবার রাস্তায় ক্যানবেরায় গিয়েছিলাম। একেবার আধুনিক শহর। বিশ্ববিদ্যালয়টি নতুন এবং ছাঁদও অতি আধুনিক। এইখানে আমার পুরানো বন্ধু আর্থার ব্যাশামের সঙ্গে দেখা হল। ব্যাশাম তখন লণ্ডন থেকে এসে এইখানে বসবাস করছিলেন। ব্যাশামের সঙ্গে দেখা হল বলা বোধহয় উচিত হবে না, ব্যাশামই প্রধান আকর্ষণ যে জন্য ক্যানবেরা আসতে চেয়েছিলাম। ক্যানবেরায় আমার একদিন বাইরে বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বেড়ানো পরিত্যাগ করে সমস্ত দিন ব্যাশামের বাড়িতে কাটালাম।

অস্ট্রেলিয়ায় মোটামুটি ঠাণ্ডা পেয়েছিলাম তবে বেশি নয়, ইংলণ্ডে নভেম্বরের

প্রথম দিকে যেমন শীত পড়ে। ফিরবার সময় উত্তরে ডারউইন হয়ে এলাম। সেখানে বেশ গরম। আমাদের গরম জামাকাপড় পরে অস্বস্তি হতে লাগল। ডারউইনে দেখলাম এয়ারপোর্টে যাঁরা আসছেন তাঁরা অনেকে হাফশার্ট পরেছেন। ফিরবার সময় হংকংয়ে এয়ারপোর্ট থেকে ঝড় দেখলাম। তারপরে চোখে পড়ল কলকাতার রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামের মতো হংকংয়ের আকাশেও জ্যাম হয়েছে। প্লেন ছাড়তে কয়েক ঘণ্টা দেরি হল।

আস্তে আস্তে বিশ্বভারতীর নতুন উপাচার্য নিয়োগের ব্যবস্থা হতে লাগল। তখন ওখানকার নিয়ম ছিল যে সংসদ (কোর্ট) প্রথমে তিনটি নাম প্রস্তাব করবেন। তাঁদের পছন্দমতো নাম তিনটি সাজানো হয়। নামগুলি যেভাবে থাকে তা দেখে পছন্দের তারতম্য বোঝা যায়। এই নাম তিনটি বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির কাছে যাবে। যদি কর্মসমিতি কোনো পরিবর্তন না করে সেই ক্রমানুসারে নাম তিনটি পাঠান তাহলে প্রথম যাঁর নাম তাঁকে উপাচার্য নিয়োগ করা হবে। যদি সেই তিনটি নামের জায়গা অদলবদল হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আচার্য তাঁর ইচ্ছানুসারে তিনজনের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা উপাচার্য নিয়োগ করতে পারেন। খবরের কাগজে পড়তে লাগলাম আমার নাম সংসদ থেকে কর্মসমিতিতে গিয়েছে এবং সেখানেও কোনো অদল-বদল হয়নি। বুঝতে পারলাম আমার যাদবপুরের দিন শেষ হয়ে এল। এই খবর কাগজে পড়ে আমাকে দু'একজন শান্তিনিকেতন যেতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে যে রকম অশান্ত অবস্থা তাতে আমার না যাওয়াই উচিত। আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে, যে অধ্যাপকরা অশান্তি করছেন তাঁদের সবাইকে তাড়াতাড়ি উচ্চপদ দিলেই শান্তি ফিরে আসবে। এই উপদেশ গ্রহণ করতে এবং আপাত শান্তির জন্য এই দাম দেবার কথা আমার মনে হয়নি।

১৯৭১ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে যখন শান্তিনিকেতন যাওয়া স্থির হয়ে গিয়েছে সে সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এলেন। রাজভবনে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কলেজের অধ্যাপক ও স্কুলের শিক্ষকদের ডেকেছিলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য। সবসুদ্ধ পঞ্চাশ-ষাট জন ছিলেন। আমরা যখন গেলাম তখনও শ্রীমতী গান্ধী অন্যত্র এক সভায় ব্যস্ত ছিলেন। কাজেই কিছুক্ষণ বসতে হল। তখন রাজ্যপাল ধাওয়ান সাহেব। দেরি হচ্ছে দেখে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এলেন। ফল শুভ হল না। তখন কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে মাও-সে-তুং-এর জয়ধ্বনি। প্রসঙ্গক্রমে একজন শিক্ষক রাজ্যপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেয়ালে দেয়ালে যে সমস্ত মাও-সে-তুং-এর বাণী লেখা হচ্ছে সে সম্পর্কে আপনার কী মত?' রাজ্যপাল বললেন, 'এ তো স্বাধীন দেশ—যে যা ইচ্ছা লিখতে পারে।' এই জবাবে যাঁরা আমন্ত্রিত ছিলেন তাঁরা একসঙ্গে আপত্তি করতে লাগলেন। কথা ঘোরাবার জন্য রাজ্যপাল বললেন, 'ছাত্র অবস্থায় অক্সফোর্ডে পলিটিক্স ক্লাবের মেম্বার ছিলাম। তখন সেখানে করেছিলাম··· ।' কী করেছিলেন আমরা শুনতে পেলাম না। তখন সবাই একসঙ্গে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। এক বৃদ্ধ শিক্ষক দাঁড়িয়ে উঠে রাগে

কাঁপতে কাঁপতে রাজ্যপালকে কী বলতে লাগলেন, তাও শুনতে পেলাম না। সম্ভবত এইসব গোলমালের খবর প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিল। তিনি সভায় এলেন। গোলমাল শান্ত হয়ে গেল। যখন আলোচনা শেষ হবার সময় হয়েছে তখন উপাচার্য অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য আমাকে দেখিয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে বললেন, ইনি বিশ্বভারতীর নতুন উপাচার্যের পদে যাচ্ছেন। আমার যাবার দিন তখন পর্যন্ত ঠিক করিনি। সেকথা শুনে শ্রীমতী গান্ধী আমাকে বললেন যত তাড়াতাড়ি পারি শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমার কাজের ভার নেওয়া উচিত। তিন সপ্তাহের মধ্যে কলকাতার পাট চুকিয়ে শান্তিনিকেতন রওনা হলাম। একথা বলতেই হবে যে, যাদবপুরের সঙ্গে আমার মনের যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারুর কারুর সঙ্গে বন্ধুত্বও স্থাপিত হয়েছিল বলতে পারি। ছেড়ে দেবার আগে মনে কিছু দ্বিধা ছিল। কিন্তু ছেড়ে দেব বলবার সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বিধা যে এত তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাবে ভাবিনি। পরের পাঁচ বছর কীভাবে কাটবে সে সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আশা করেছিলাম কিছু কিছু লেখাপড়ার কাজ করতে পারব। তবে একথাও বুঝেছিলাম যে, পরের পাঁচ বছর যে কাজ করতে হবে, সে সহজ হবে না। আগেকার জগৎ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কোনো আশা করাই আমার ঠিক হয়নি। যাবার কয়েকদিন আগে একটি রাজনৈতিক দলের একজন ছাত্র আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'স্যার, আপনি চললেন, আমরাও কিন্তু যাচ্ছি।' এর ফল যে কতদূর মারাত্মক হতে পারে সেকথা তখন বুঝিনি।

আগস্ট মাসের শেষে সকালের বারাউনি প্যাসেঞ্জারে আমার মেয়ে ঈশানীকে নিয়ে শান্তিনিকেতন রওনা হলাম। সঙ্গে আমার দু'জন বন্ধু, শোভন বসু ও অমলেন্দু দে ছিলেন, তাঁরা নতুন জায়গায় গুছিয়ে বসতে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। কলকাতায় তখনও বর্ষা শেষ হয়নি। থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। বোলপুর স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন সেখানের আকাশে মেঘ প্রায় সরে গিয়েছে, কিন্তু রাস্তাঘাট, প্ল্যাটফর্ম ভিজে। স্টেশনে আমাদের নিতে বিশ্বভারতীর কোষাধ্যক্ষ আমার পুরনো বন্ধু জাস্টিস মাসুদ, কর্মসচিব অমিয়কুমার সেন, পুরনো ছাত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন। আমার সংসার বড় নয়। ছেলে অভিজিৎ বিদেশে। সঙ্গে মেয়ে ঈশানী, দু'জন পুরাতন ভৃত্য মোহনলাল দাস ও সন্তোষকুমার সাউ, এবং ঈশানীর ছেলেবেলার আয়া বিষ্ণুর মা। মোহনলাল আমার সঙ্গে অন্তত ত্রিশ বছর আছে। আমার ছেলেমেয়েরা যখন খুব ছোট তখন থেকে তাদের দেখাশোনা করছে। প্রকৃতপক্ষে সে আমার বাঙালি 'জিভ্‌স', প্রায় অভিভাবক। সন্তোষ আরও পুরনো। শান্তিনিকেতনে পৌঁছে সন্তোষ বলেছিল, এ যে বনগাঁয়ে এলাম। বিষ্ণুর মা'র বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। সেখান থেকে উৎখাত হয়ে কৃষ্ণনগরের কাছে একটি গ্রামে থাকত। সে বলেছিল, যে বনজঙ্গল, এখানে থাকতে পারবুনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কেউ ছেড়ে যাবার কথা ভাবেনি, নকশাল হাঙ্গামার সময়েও নয়। মোহনলাল অবশ্য সমস্ত জিনিসটাই দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখেছিল।

ভেবেছিলাম বেলা বারোটার আগে পৌঁছচ্ছি কাজেই সেইদিনই কাজে যোগ

দিতে পারব। শান্তিনিকেতনে কেউ কেউ অন্যরকম ভেবে রেখেছিলেন। খুব আশ্চর্য লাগল যখন অনেকে বারেবারে বলতে লাগলেন সেদিন আমার কাজে যোগ দেবার দরকার নেই, পরের দিন করলেই হবে। সমস্ত দিন বাড়িতে বসে রইলাম। উপাচার্যের জন্য বাড়ি তখনও স্থির করা হয়নি। আমার আগেকার উপাচার্য অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য অধ্যাপকদের জন্য নির্দিষ্ট একটি বাড়ি বেছে নিয়েছিলেন। প্রথম উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় এ সমস্যা ছিল না। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সময়েও নয়। এরপরে কেউ কেউ অল্প কয়েকদিনের জন্য উপাচার্য হয়েছিলেন, যেমন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, ক্ষিতিমোহন সেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু আওয়াগড়ের বাড়িতে থাকতেন। আওয়াগড়ের রাজা বড়লোক ছিলেন না, কিন্তু বিশ্বভারতীতে তাঁর অনেক দান আছে। এই বাড়িটি তিনি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছিলেন। এই বাড়িতে প্রথম উপাচার্য ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তারপরে সুধীরঞ্জন দাস। কালিদাস ভট্টাচার্য মশায় এই বাড়িতে থাকতে চাননি। বরং এই বাড়িটি পার্টিশন করে অধ্যাপক এবং আপিসে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। সামনেও কয়েকটি ফ্ল্যাট বাড়িও বানান হয়েছিল। আমার এই ব্যবস্থা ভাল মনে হয়নি। বিশ্বভারতীতে থাকবার জায়গার অসুবিধা কিন্তু তাই বলে অন্য ব্যবস্থার কথা না ভেবে আওয়াগড়ের দানের দিকে হাত বাড়ানো অনুচিত মনে হয়েছিল।

আমি ওখানে পৌঁছবার প্রায় মাসখানেক আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কাজে দু'দিনের জন্য শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম। আমি যে কালিদাসবাবুর জায়গায় আসছি সেকথা তখন ওখানে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। রতনকুঠিতে সবচেয়ে ভাল ঘরই আমাকে দেওয়া হল। সন্ধ্যার পর কয়েকটি ছাত্র আমার সঙ্গে দেখা করে তাদের দুঃখ ও অসুবিধার কথা বোঝাতে চেষ্টা করল। দু'একজন স্থানীয় লোক বললেন আওয়াগড়ের বাড়ি থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে সেটি আবার উপাচার্য-গৃহ করা হোক। কিন্তু কয়েকটি পরিবারকে গৃহচ্যুত করা উচিত বলে মনে হয়নি। আমার এক বন্ধু উপদেশ দিয়েছিলেন যে, অন্য কোনো ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন উত্তরায়ণের একপ্রান্তে থাকি। এই উপদেশও আমার পছন্দ হয়নি। উত্তরায়ণে বসবাস করব সেকথা ভাবতেই আমার কী রকম অস্বস্তি লাগত। অবশেষে সুরাহা হল। পূর্বপল্লীতে কলকাতার একজন ব্যবসায়ী একটি দোতলা বাড়ি করেছিলেন। তাঁদের বাড়ির কারুর নামে বাড়ির নামকরণ হয়েছিল। যাঁর বাড়ি তিনি ধনী ব্যবসায়ী। মাঝে মাঝে কয়েকদিনের জন্য কলকাতা থেকে বন্ধুবান্ধব এনে পল্লীবাস করতেন। বাড়ির নাম যাই হোক, কেউ কেউ বাড়িটিকে আড়ালে 'বিয়ার গার্ডেন' বলে উল্লেখ করত। বিশ্বভারতী এই বাড়িটি কিছুদিন আগে কিনে নিয়েছিল। নীচের তলা এবং উপর তলায় বিশ্বভারতীর কর্মচারীরা থাকতেন। কিছুদিন এই বাড়িটি এন· সি· সি-র আপিসও ছিল। খালি বাড়ি শুনলাম ঐ একটি। এই বাড়ির অসুবিধা এই যে, কোনো বসবার ঘর ছিল না। নীচের তলায় একটিমাত্র ঘর। সেটি খুব বড় নয়, অতিথি কেউ এলে তাঁর এখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হতে পারে। আর একটি ঘর অন্ধকার ও বাসোপযোগী নয়। উপাচার্যের কাছে কেউ কখনও দেখা করতে আসবেন না

এ কখনও হতে পারে না। নীচে বড় বারান্দার একদিকে দেয়াল তুলে আমি এখানে বসবার ঘর তৈরি করেছিলাম। পুরনো বাড়ি, অনেক জায়গা দেয়ালে নোনা লেগেছে। সেটিকে ঢাকা দেবার জন্য পাটির আবরণ দেওয়া হয়েছিল। নতুন করে কিছু আসবাবও করা হয়েছিল। বিশ্বরূপ বসু এবং আরো কেউ কেউ আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। বাগান পরিষ্কার করে তাতে নানারকম গাছ লাগিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল বাগানে বসবার জন্য একটি কাঠের বেঞ্চি তৈরি করাব। সে হয়ে ওঠেনি। যাঁকে বেঞ্চি তৈরি করতে বলেছিলাম তিনি একটু হেসে বললেন, 'আমি তৈরি করে দেব, কিন্তু আপনি কি বসবার ফুরসত পাবেন?' এরকম ভবিষ্যৎদৃষ্টিসম্পন্ন লোক বেশি দেখা যায় না।

প্রথম দিন একরকম ভাবে কেটে গেল। গেস্ট হাউস থেকে আমাদের খাবার এল। পরদিন সকালে কালিদাস ভট্টাচার্য মশায়ের কাছ থেকে চার্জ বুঝে নেবার কথা। ভোরবেলা কালিদাসবাবুর সঙ্গে বৈতালিকে গেলাম। আগেই স্কুলের ছাত্রদের বলা হয়েছিল নতুন উপাচার্য আসবেন। বৈতালিকের পরেই ক্লাস আরম্ভ হয়। তার মধ্যেই স্কুলের কয়েকটি ছাত্র আমার কাছে এল। কালিদাসবাবু তাদের বললেন, 'এই যে তোমাদের নতুন দাদা।' কালিদাসবাবু ঠিক অর্থেই বলেছিলেন, কিন্তু এই কথা শুনে আমার 'শ্রীকান্তে'র নতুন দাদা এবং 'ঠুনঠুন পেয়ালা'র কথা মনে হল। সকলেই জানেন শান্তিনিকেতনে শিক্ষকদের 'দাদা' বলে ডাকার রীতি আছে। এই রীতি আমার যে খুব পছন্দসই তা নয়। বিশ্বভারতী যখন ছোট ছিল তখন এই ডাক মানাত। রথীদা বা প্রতিমাবৌদি শুনলে খারাপ লাগে না। কিন্তু তার পরের সব উপাচার্যকে 'দাদা' বা তাঁর পত্নীকে 'বৌদি' বলে ডাকা আমার কাছে বেমানান মনে হয়। কল্পনা করা যাক, উপাচার্য সত্যেন বসুকে পাঠভবন কিংবা শিক্ষাসত্রের ছাত্ররা 'দাদা' বলে ডাকছে।

অনেকে বাইরে থেকে চাকরি করতে আসেন, বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয় নেই। ইন্টারভিউয়ের সময় কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেন, এখানে কী রকম টিউশানি পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা যে ছাত্রদের আদর্শ 'দাদা' হবেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। ত্রিশ বছর আগে যাঁরা শিক্ষকতা করতেন তাঁদের দাদা বললে ছাত্রের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ঠিক বোঝা যেত। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে আমি দেখেছি। কিন্তু এখন কি সে কথা বলা চলে? বিশ্বভারতীর শিক্ষকরা কি সবাই মনে করেন তাঁরা এক পরিবারভুক্ত, যেমন চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে ছিল?

বৈতালিকের পর রতনকুঠিতে গিয়ে কালিদাসবাবু ও আমি দুটি কাগজে সই করলাম। রেজিস্ট্রার অমিয়কুমার সেন ও আরও কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন। সই করবার পর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মিষ্টান্ন বিতরণ করা হল। তারপর আমি ও অমিয়বাবু আপিসে চলে গেলাম। যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করবেন তাঁদের সঙ্গে অমিয়বাবু আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন—আমার একান্ত সচিব শম্ভু মজুমদার, আমার আপিসের সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, আমার পিওন অসিত দাস, গাড়ির চালক অলক চক্রবর্তী। পাঁচ বছর সুখে-দুঃখে তাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছি, কখনও এঁদের কাজে কোনো ত্রুটি দেখিনি। উপাচার্যের এই সৌভাগ্য

সর্বত্র হয় না।

আগেই বলেছি পূর্বে কয়েকবার শান্তিনিকেতন এসেছি। প্রথমবার অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে বেড়াতে এসেছিলাম তিনদিনের জন্য। তারপর বিশ্বভারতীর পরীক্ষার কাজে কয়েকবার আসা যাওয়া করেছি। কিন্তু সাধারণত যাকে শান্তিনিকেতনের লোক বলে আমি তা নই। কিন্তু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যাঁরা বহুদিন জড়িত, তাঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বহুদিনের। একথা বললে হয়তো অন্যায় হবে না যে, যাঁদের প্রকৃত শান্তিনিকেতনের লোক বলা উচিত তাঁদের এক বড় অংশ শান্তিনিকেতনে থাকেন না। শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দির বাইরেও একটা বড় শান্তিনিকেতন আছে। তাঁরা কেউ কেউ উৎসবে আসেন, কেউ কেউ বিশেষ আসেন না। তাহলেও মনেপ্রাণে তাঁরা শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা। শান্তিনিকেতনে আমার পুরনো বন্ধু কেউ কেউ থাকতেন। যেমন, কল্যাণ দত্ত। ইনি তাড়াতাড়ি কাজ থেকে অবসর নিয়ে ওখানেই বসবাস করছেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী উমার অকৃপণ আতিথ্যের কথা সারা জীবন মনে থাকবে। আর একজন বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার বয়স যখন অল্প, রংপুরে থাকতাম, তখন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে আবার দেখা হল। ছেলেবেলায় যে বন্ধুত্ব ছিল সে এখনও অটুট আছে। একথা খুব কম লোক সম্বন্ধে বলা চলে। তাঁর স্ত্রী গৃহকর্ম ও বাগানের কাজে নিপুণা। এমন কম সন্ধ্যা গিয়েছে যে আমি কিছুক্ষণ ওঁদের সঙ্গে কাটাইনি। হালে আমার কোনো কোনো বন্ধু ওখানে বাড়ি করে আছেন। তাঁরা মাঝে মাঝে এলে দেখা হত। তাছাড়া পুলিনবিহারী সেনের কথা অবশ্যই বলব, কিংবা ওরিয়েন্ট লংম্যানের এক সময়ের বড়কর্তা জ্যোতিষরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা কানাই সামন্ত। আমার কিছু কিছু পুরনো ছাত্র বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করতেন। কাজেই অসহায় ছিলাম না। •

প্রথম প্রথম একজন পূর্বতন উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাস সম্বন্ধে কিছু ক্রুদ্ধ সমালোচনা শুনেছিলাম। কারুর কারুর ধারণা হয়েছিল যে, শান্তিনিকেতনের আশ্রমের আবহাওয়াকে তিনি বিনষ্ট করেছেন। এমন কোনো উপাচার্য থাকতে পারেন না যাঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য শোনা যায় না। যাঁদের পূর্বে শিক্ষাদানের সঙ্গে সম্পর্ক কম ছিল তাঁদের অনেক ক্ষেত্রে সহকর্মীদের উপদেশ নিয়ে চলতে হয়। নিন্দা ও প্রশংসা সবই ভাগ করে নেওয়া উচিত। সুধীরঞ্জনের সময় বিজলী আলোর প্রবর্তন হয়েছিল শান্তিনিকেতনের রাস্তায়, কলের জলের ব্যবস্থা এবং পিচ দেওয়া রাস্তা। যাঁরা আশ্রমিক জীবনের জন্য হাহাকার করেছেন, তাঁদের কাউকে বলতে শুনিনি, 'দাও ফিরে সে অরণ্য', আমরা খড়ের বাড়িতে থাকব। আগেকার দিনের মতো, প্রদীপের আলোয় পড়ব রাত্রে, শান্তিনিকেতনে আগে যেরকম লাল ধুলোর রাস্তা থাকত তাই থাকবে। অধ্যাপকেরা যাঁরা ওখানে বাড়ি করেছেন তাঁদের বাড়ি দেখলে মনে হবে না যে পুরনো শান্তিনিকেতনের প্রতি তাঁদের হৃদয়ের কোনো টান আছে। আমি যখন কাজে যোগ দিলাম তখন নতুন সায়েন্স বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। লাইব্রেরির কাজ প্রায় শেষ এবং সদর দপ্তরের কাজ, যেখানে উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও ফিনান্স অফিসারের দপ্তর, কয়েক বছর আগে শেষ হয়েছে। আপিসের বাড়িটি কাজের তুলনায় ছোট। তার কারণ

বোধহয় আগে এত অল্প জায়গায় আপিস করতে হত যে, এই বাড়িকে খুব বড় মনে করা স্বাভাবিক।

সুধীরঞ্জন দাসের সময় যাঁদের উপাচার্যের বিরোধিতা করবার ইচ্ছা হত তাঁরা মাথা তুলতে পারতেন না। কালিদাসবাবু ভালমানুষ, নরম লোক, কাজেই তিনি বিব্রত হতেন। যে উত্তাপ অধ্যাপকগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছিল, আমি গিয়েই তা টের পেলাম। অক্টোবর নভেম্বর মাসে নকশাল আন্দোলন আস্তে আস্তে বীরভূমে, বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের চারদিকে, ছড়িয়ে পড়ল। পুরনো দিন ও আবহাওয়া বদলে যাচ্ছিল। আগে শোনা যেত যে, স্টেশনে নেমে রিকশায় জিনিসপত্র চাপিয়ে ঠিকানা জানিয়ে দিলে যথাস্থানে পৌঁছে যেত, কিছু খোয়া যেত না। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁরা রাত্রে দরজা জানালায় খিল দেবার প্রয়োজন মনে করতেন না। মেগাসথেনিসের আদর্শ ভারতবর্ষের ছবির মতো। আমি যখন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে প্রথম গিয়েছি তখন মাছ পাওয়া যেত না। খাবারের কষ্ট ছিল, কিন্তু সাধারণ লোকেদের ভদ্রতা, বিনয় ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না।

১৯৭১ সালের ছবি এ রকম নয়। সবাই জানেন এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব ৭ই পৌষ। ৭ই পৌষের মেলা তিনদিন ধরে চলে, অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়। শান্তিনিকেতনের কর্মীরা এই মেলাটির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। পুজোর ছুটির পর থেকেই মেলার ব্যবস্থাপনার কাজ আস্তে আস্তে শুরু হতে থাকে। মেলার সপ্তাহ তিনেক আগে কর্মীদের নিয়ে একটি সভা হয়। সেখানে কর্মীরা তো বটেই ছাত্রসমিতির সদস্যরাও থাকেন। এই সভায় এসে প্রথম ধাক্কা খেলাম। অনেক স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্য না পেলে এই রকম কাজ সম্ভব নয়। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ছাত্ররা থাকেন, অধ্যাপকরাও থাকেন, এবং অন্যান্য কর্মীরাও থাকেন। উপাচার্যেরও স্বেচ্ছাসেবক হওয়া উচিত, অন্তত আমি তাই মনে করতাম। এই সভায় যখন স্বেচ্ছাসেবকদের নেবার কথা উঠল তখন একজন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ছাত্ররা যদি স্বেচ্ছাসেবক হয় তাহলে তাদের নিরাপত্তার জন্য কে দায়ী হবে। তখন চারদিকে রাজনৈতিক গোলমাল। কোনো দল এসে যদি মেলা ভেঙে দিতে চায়, তাহলে তাদের কে আটকাবে? ছাত্রদের এক্ষেত্রে প্রহরার কাজ করতে বলা উচিত হবে না, কারণ তাদের শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা আছে। আমার সন্দেহ হল যাঁরা একথা বলছিলেন তাঁরা ছাত্র-বন্ধু নন, বিশ্বভারতীরও বন্ধু নন। তাঁরা যে কারণেই হোক মেলা যাতে না বসতে পারে তার চেষ্টা করছেন। আমি বলেছিলাম যে যতরকম সাবধানতা নেওয়া যেতে পারে আমরা নেব কিন্তু কে কার জীবনের জন্য দায়ী হতে পারে। দু'একজন বললেন পুলিশ আসা উচিত হবে না, অথচ পুলিশের সাহায্য ছাড়া কোথাও এরকম জিনিস করা সম্ভব নয়। তখন কলকাতায় সশস্ত্র পুলিশ নানা জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাহারা দিচ্ছে। তাদের বন্দুক তাদের শরীরের সঙ্গে শিকল দিয়ে আটকানো। একজন উৎসাহী ব্যক্তি বললেন যে, ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে পুলিশ তুলে নেওয়া হয়েছে। আমি তার দু'তিন দিন আগে কলকাতা থেকে ফিরেছি। দেখে গিয়েছি যে, ন্যাশনাল লাইব্রেরির

অবস্থা প্রায় দুর্গের মতো। বিশেষ করে ঢুকবার রাস্তায় বহু পুলিশ তাদের শরীরের সঙ্গে বন্দুক বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে হত বিপদ এলে শৃঙ্খলের নাগপাশ কাটিয়ে বন্দুক ছুঁড়তে পারবে কিনা। আমি কলকাতায় কী দেখেছি সে কথা বললাম, মনে হল না কোনো কাজ হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল যে, বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে এবং কর্মীরা মেলা হোক এটা চান। যাই হোক, মেলাকে আটকানো গেল না। মেলার আয়োজন হতে লাগল। মেলার দু'একদিন আগেই অস্বস্তিকর খবর পেতে লাগলাম। বেশি রাত্রে টেলিফোনে খবর এল যে, শ্রীনিকেতনের স্কুলে কারা আগুন দিয়েছে। গিয়ে দেখি পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে এবং আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। যে দিকে গ্রন্থাগার এবং ল্যাবরেটরি সে দিকে আগুন লাগানো হয়েছে। আগুন তখন প্রায় নিভে গিয়েছে এবং ইতস্তত কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে। প্রতি বছরই দেখেছি মেলায় সামান্য কিছু গোলযোগ হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দলাদলি কিংবা কোনো দোকানের সামনে ক্রুদ্ধ কয়েকজন ছাত্র। এবারেও সেসব হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

৭ই পৌষের মেলা আরম্ভ হয় প্রত্যূষে। তখন শীতকাল, ভাল করে সূর্যোদয় হয়নি। কয়েকটি গান ও তারপর উপাসনা হয়। শান্তিনিকেতনে যাবার আগে আমাকে একজন বলেছিলেন, 'আপনি যাচ্ছেন তো ওখানে। অনেক বড় গোলমাল আছে। তার চেয়ে বড় কঠিন কাজ হচ্ছে, মন্দিরের উপাসনায় আচার্যের কাজ করা। সেটি ভেবে দেখেছেন ?' ভয় যে আমার মনে একেবারে ছিল না তা নয়। প্রথমবার উৎসবের আগে নানারকম অপ্রীতিকর ঘটনা হবার সম্ভাবনা ছিল সেকথা আগে বলেছি, কিন্তু গান ইত্যাদি ভাল করে তালিম দেওয়া হয়েছিল। আমি কী বলব কিংবা বলব না, সে সম্বন্ধে ভাল করে প্রস্তুত হয়েছিলাম। উৎসব নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। পরবর্তী কয়েক বৎসর উৎসবের ব্যবস্থা শিথিল হতে দিইনি। আচার্য হবার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই জানি, কিন্তু যা করেছি সে কর্তব্যবোধে করেছি।

মেলার শেষ দিন পর্যন্ত উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না। শুনেছিলাম ভয়ে বেশি লোক মেলায় আসবে না। দেখলাম ভিড় উপচে পড়ছে। মেলার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কাজ বন্ধ। তখন দুপুরে বাড়িতে এসে দোতলার বারান্দায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতাম। সেখান থেকে মেলা দেখা যেত না কিন্তু মেলার কলগুঞ্জন আমার বাড়ি থেকে শোনা যেত। সন্ধ্যার পর আলো জ্বলে উঠলে লোকের ভিড় বাড়ত এবং আগে যা গুঞ্জন মনে হত এখন তা প্রায় কোলাহলে গিয়ে দাঁড়াত। মেলার সবগুলি লাউডস্পিকার সমান জোরে হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু বিকাল থেকে কয়েকটি বেশি স্পষ্ট শোনা যেত। যেমন, 'মরণ-ফাঁদ আট আনা', তার সঙ্গে মোটর সাইকেলের শব্দ দর্শকের উত্তেজনা বাড়াবার জন্য। আর খুব বেশি এইরকম উক্তি শোনা যেত—'অমুক তুমি যেখানেই থাকো এখনি মেলার আপিসে এসো।' কিংবা 'অমুকের পিসিমা আপনি শিগগির মেলার আপিসে আসুন। আপনাদের পুঁটি এখানে আছে, কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল।' এই যে নানা কণ্ঠের বিচিত্র সম্মেলন, শুনতে খারাপ লাগত না। অন্য এক বছর একবার রাত দশটায় টেলিফোনে খবর পেলাম মেলায় মারামারি হচ্ছে। যথেষ্ট

শীতের বস্ত্র নিয়ে বেরোইনি, তার ফলে কয়েকদিন নিউমোনিয়ায় ভুগেছিলাম।

শান্তিনিকেতনের মেলার একমাস পরে শ্রীনিকেতনে একটি মেলা হয়। এটি একটু অন্য ধরনের। এখনকার ভাষায় গ্রামীণ মেলা। মেলাটি অপেক্ষাকৃত ছোট, তাহলেও এর একটি নিজস্ব আকর্ষণ আছে। সুরুলের কুঠিবাড়ির তলায় মেলা বসে। কয়েকটি স্টল, কিছু বিনোদনের ব্যবস্থা। একবার সার্কাসও আনা হয়েছিল মনে হচ্ছে। তাছাড়া শরীর চর্চা, খেলাধুলা ইত্যাদিও হয়। এই মেলা এবং তার সংগঠন দেখে আমি অনেক জিনিস শিখতে পেরেছি। প্রকৃতপক্ষে শিখবার উপাদান সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

মেলা শেষ হয়ে গেলেও দুশ্চিন্তার অবসান হল না। শ্রীনিকেতন থেকে গোলমালের খবর পেতে লাগলাম। এক রাত্রে বিনয়ভবনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। লাইব্রেরির খুব ক্ষতি হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল বিনয়ভবনের পর কলাভবন ও রবীন্দ্রভবনও আক্রান্ত হতে পারে। এরকম অদ্ভুত জিনিস কেন হবে তার কোনো উত্তর ছিল না। বরং আমি যে বাধা দেবার চেষ্টা করছি, এই-টাই কেউ কেউ আমার নির্বুদ্ধিতা মনে করতেন। কলাভবন ও রবীন্দ্রভবন নিয়ে ভাবছি দেখে একথা শুনতে হয়েছিল যে, যাক না পুড়ে, আপনার কী ক্ষতি ? কী ক্ষতি তর্ক করে বোঝাবার নয়। এরকম ভয় ও অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রবীন্দ্রভবন সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। রবীন্দ্রভবনে তখন উপাচার্য একমাত্র ট্রাস্টি। আইনত তিনি কারুর অধীন নন। কাজেই এই ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রভবন যদি পুড়ে যায় তাহলে কবির সমস্ত পাণ্ডুলিপি, হাজার হাজার চিঠি, যার সবগুলি এখনও ভাল করে পড়া হয়নি এবং কবির আঁকা অসংখ্য ছবি, তার কী হবে এই ভাবনাই আমাকে শান্তি দিচ্ছিল না। এইজন্য যে কাজ করেছিলাম, তা শুনলে আমার তখন মাথা কাটা যেত, লজ্জায় মাথা হেঁট হবার নয়, অন্য অর্থেই বলছি। রবীন্দ্রনাথের কিছু পাণ্ডুলিপি শাড়ির বাক্সে বোঝাই হয়ে দিল্লি যেত, সেখানে তার ফটো নেবার পর সেগুলি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসত। শান্তিনিকেতনের কয়েকজন অধ্যাপক অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। পরে যখন উৎপাত কমে গেল, তখন আর কাগজপত্র ছবি তুলবার জন্য দিল্লিতে পাঠানো হয়নি।

আমি নিজে পূর্বে কোনো উৎসবের সময় শান্তিনিকেতনে আসিনি। কাজেই সব উৎসব আমার কাছে নতুন করে ধরা দিয়েছিল। দেখলে বোঝা যায়, যখন এখানে আনন্দের উপকরণ দুর্লভ ছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ কীভাবে সমস্ত ঋতুতে ছাত্রছাত্রী ও আবাসিকদের জন্য একটি আনন্দের উপাদান ধরে দিয়েছিলেন। বসন্ত উৎসব যখন প্রথম দেখলাম তখন খুব চমক লাগল। মনে হল, এ রকম সুন্দর জিনিস আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু খোলা জায়গায় এখন এই উৎসবের অনেক বাধা দেখা দিয়েছে। বাইরের লোককে আসতে দেব না, এ সম্ভব নয়। কিন্তু এক শ্রেণীর দুষ্ট লোককে কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় বলা কঠিন। আমার সময়েও কিছু অসুবিধা ছিল। এখনকার অসুবিধা আরও বেশি হয়েছে।

৭ই পৌষের উপাসনাকে ছেড়ে দিলে শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন সবচেয়ে বড় উৎসব। আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের সমাবর্তন হয় না। এবং

ছেলেমেয়েদেরও এত স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দও কখন দেখিনি। আচার্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সকালে এসে পৌঁছতেন এবং বিকালের দিকে পানাগড় রওনা হয়ে যেতেন। বেশিক্ষণ থাকতেন না, কিন্তু তার জন্য বহুদিনের প্রস্তুতি দরকার। একবার তিনি সমাবর্তনের আগের দিন রাত্রে এসেছিলেন। পানাগড় থেকে মোটরে এলেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে আমাকে পানাগড়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করার কথা। আমাদের অসুবিধা হবে মনে করে তিনি টেলিফোনে আমাকে যেতে নিষেধ করেছিলেন। রাত্রে উত্তরায়ণে ছিলেন। পরদিন সকালে সমাবর্তন।

একবার এই উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট আবু সৈয়দ চৌধুরী সপত্নীক উপস্থিত ছিলেন।

প্রায় দু'বছর ধরে শান্তিনিকেতনে যে ছায়া নেমেছিল তার বিস্তারিত কাহিনী এখানে দেবার প্রয়োজন নেই। তবে কয়েকটি কথা বলা দরকার। ইতিমধ্যেই কলকাতার কাগজ ও অন্যান্য কাগজে শান্তিনিকেতনের অশান্তির কথা বের হতে আরম্ভ করেছে। যাঁরা এসব রিপোর্ট দিতেন তাঁরা সব জিনিস পরিষ্কার করে জানতেন না, জানবার কথাও নয়। কলকাতার সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে শান্তিনিকেতনে লোক এসেছেন এবং আমার সঙ্গে কথাও বলেছেন। আস্তে আস্তে অন্য প্রদেশের কাগজের পক্ষ থেকেও খবর সংগ্রহ করতে রিপোর্টাররা আসতে আরম্ভ করলেন। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দিল্লি ও বোম্বাই থেকে প্রকাশিত একটি নামকরা দৈনিক সংবাদপত্র থেকে একজন সাংবাদিক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন কয়েকদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বাতাসের শব্দ ও বৃষ্টির শব্দ কী রকম শোনায় সে যাঁরা শোনেননি বুঝতে পারবেন না। 'ডাকে বায়ু হা হা স্বরে', এই চরণ থেকে কী রকম ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে সেকথা আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম। কলকাতায় যতই ঝড় বৃষ্টি হোক সেখানে এরকম আর্ত হা হা স্বর শুনতে পাওয়া যায় না। এই রকম সন্ধ্যায় সেই সাংবাদিক আমার বাড়িতে এলেন। তিনি বাঙালি, কিন্তু পূর্বে কখনও শান্তিনিকেতনে আসেননি। সেদিন সকালেই কলকাতা থেকে এসেছেন। সমস্ত দিন অক্লান্ত বর্ষণের জন্য ভাল করে শান্তিনিকেতন দেখতে পারেননি। কিন্তু তিনি যতটুকু দেখেছিলেন তাতেই ভয় পেয়েছিলেন। খানিকক্ষণ কথা বলার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়ির চারদিকে কী আছে ? বোধহয় শুনেছিলেন আমি পুলিশ ও সি· আর· পি· পরিবৃত হয়ে থাকি। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনার পর তিনি আমাকে একটা দিক দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওদিকে কী আছে ?' সেদিকটা রেললাইন। নিচু রেললাইনের গর্ত, ওপাশে ধূ ধূ প্রান্তর। অন্ধকারে কোথাও আলোর রেখা নেই। তাঁর প্রশ্ন শুনে আমি দোতলার দরজা খুলে তাঁকে বারান্দায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। তিনি বারান্দা পর্যন্ত গেলেন না। বারান্দায় এক পা রেখে তিনি একবার সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের দিকে তাকালেন। তারপরেই তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে এলেন। বেশিক্ষণ বসলেন না। তাঁর সঙ্গে গাড়ি ছিল। কয়েকদিন পরে তাঁর কাগজে প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র পড়লাম। খুব গুছিয়ে লেখা, কিন্তু ভীতিকর। পড়ে আমারই

কী রকম মনে হতে লাগল।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। আমার দপ্তরে ধীরেশ দেবনাথ নামে একজন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। একদিন দুপুরে কোনো বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বসে কাজ করেছিলাম। কিছু কাগজপত্র ছিল, যা বুঝবার জন্য তাঁর সাহায্য দরকার হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরবার অল্পক্ষণ পরে টেলিফোন এল দেবনাথের বাড়িতে কারা আক্রমণ করেছে। তাঁর অবস্থা খারাপ, আপনি চলে আসুন। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় আবার ফোন এল যে দেবনাথ বেঁচে নেই। আমি বোধহয় তাঁর মৃত্যুর দশ-বারো মিনিটের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। দেখলাম পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং কিছু অধ্যাপক ইতস্তত দাঁড়িয়ে। তখন শীতকালের সন্ধ্যা। ঘটনাটি আমার কাছে একটু অদ্ভুত মনে হয়েছে। তখন যে কাহিনী শুনেছিলাম বলছি। ভয়ে তখন সন্ধ্যার পর লোকে ঘর থেকে বেরোতেন না। দরজা বন্ধ করে রাখতেন। অচেনা কেউ ডাকলে ঘর থেকে বেরোতেন না। দেবনাথকে কয়েকটি ছেলে এসে ডাকাডাকি করেছে। তারা নাকি বলেছে তাদের টেলিফোন করবার দরকার। কাছেই একটি টেলিফোন বুথ আছে। দেবনাথ সেই দিকে দেখিয়ে দিলেন। এর পরে দলটি ফিরে এল। ফিরে এসে একজন আবার দেবনাথকে ডাকতে লাগল। ডাক শুনে দেবনাথ জানালা খুললেন, নিশ্চয় চেনা কেউ ছিল। তিনি তাকে বললেন, 'ও তুমি।' বলে দরজা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ছেলে ঢুকে দেবনাথকে ছোরা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। সেই ঘরে তাঁর স্ত্রীও ছিলেন। তাদের কাজ শেষ করে সেই ছেলেরা সাইকেলে চেপে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। একটি কথা বলা দরকার। অ্যান্ড্রুজ পল্লীতে অনেক ঘরে ,অধ্যাপক থাকেন। বাড়িগুলি ঘেঁষাঘেষি। এক বাড়িতে চেঁচিয়ে বললে পাশের বাড়ি থেকে শোনা যেত। যাঁরা এইসব বাড়িতে থাকতেন তাঁদের কারুর কারুর বাড়িতে বন্দুকও ছিল। কিন্তু চেঁচামেচি শুনে কেউ বের হননি। পুলিশ না আসা পর্যন্ত বোধহয় কেউ দরজা খোলেননি। অ্যান্ড্রুজ পল্লীর উল্‌টো দিকে একটা মাঠের পিছনে বিনয়ভবন। সেখানে চায়ের দোকানে তিনজন ছাত্র বসে ছিল। তাদের মনে হল কোথাও চেঁচামেচি হচ্ছে। তারা সাইকেলে করে অ্যান্ড্রুজ পল্লীর সামনে এসে দেখল জন চার ছেলে সাইকেল করে চলে যাচ্ছে এবং নিজেরাই 'ডাকাত পড়েছে' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে যাচ্ছে। বিনয়ভবনের ছাত্র তিনটি দেবনাথের ঘরে ঢুকে বুঝতে পারল কী ব্যাপার! দেবনাথকে কারা মেরেছিল? তারা কি নকশাল, না অন্য কেউ? তখন শুনেছিলাম এটি পুরোপুরি একটি নকশালি কাজ। কারণ যেভাবে দেবনাথের গায়ে ছোরার আঘাত ছিল সে নাকি নকশালরাই পারে, অর্থাৎ স্বাক্ষর দেখে কে স্বাক্ষর করেছে তার পরিচয়। দু'এক বছর পরে শুনেছি দেবনাথের শত্রুর অভাব ছিল না। তবে আমি জানি না সেই সব কারণ থাকলেই কাউকে ছোরা দিয়ে আঘাত করা যায় কি না।

কখনও কখনও শোনা যেত রাস্তায় কাটামুণ্ডু পড়ে আছে। একদিন আমার চোখেও পড়েছিল, বোলপুরের রাস্তা যেখানে শান্তিনিকেতনে এসে দু'ভাগ হয়ে গেছে সেখানে একটি বড় কাপড়ের দোকানের পাশে সকালবেলা রাস্তার ধারে

একটি কাটামুণ্ডু কারা রেখে গিয়েছে। হয়তো অন্য জায়গায় খুন হয়েছে এবং সম্ভবত ভয় দেখাবার জন্য মুণ্ডুটি এখানে এনে ফেলে রাখা হয়েছে। এর যা ফল হবার হয়েছিল। ভয় অনেকটা কুয়াশার মতো, শীতের রাত্রে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে, সকালবেলা দেখা যায় সবদিক ঢাকা পড়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে কারুর কারুর কাছে চিঠি আসতে লাগল যে অমুক দিন তোমাকে খুন করা হবে। এরকম চিঠি আমি বহু পেয়েছি। প্রথম পেয়েছিলাম ১৯৭২ সালে পয়লা জানুয়ারি তারিখে, নতুন বর্ষের শুভেচ্ছার মতো। তারপর মাঝে মাঝে আসত। একবার ভেবেছিলাম অনেক চিঠি যখন জমেছে তখন একটা প্রদর্শনী করলে কেমন হয়, সে আর হয়ে ওঠেনি। এই সব চিঠি যাঁরা পেতেন, তাঁরা কেউ কেউ মনে করতেন শেষের ভয়ঙ্কর দিন ঘনিয়ে এসেছে। একদিন দুপুরবেলা, সেটি ছুটির দিন, বিশ্বভারতীর উঁচু দিকের এক কর্মী খুব ভীত অবস্থায় আমার বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। ছুটির দিন দুপুরে কখনও কখনও আমি আপিসের কাজ করতাম। সেদিনও তাই চলছিল। দপ্তরের কেউ কেউ ফাইল নিয়ে বসেছিলেন। সেই ভদ্রলোক চিঠি হাতে করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকে বললেন, তিনি আর শান্তিনিকেতনে চাকরি করবেন না, এখনই কলকাতায় ফিরে যাবেন। তাঁকে অনেক বোঝানো হল, কিন্তু আমরা বেঁচে আছি দেখেও তিনি আশ্বস্ত হলেন না। পরদিন আমাদের কিছু না জানিয়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন। তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। আপিসের যা নিয়ম অর্থাৎ রিলিজ নিয়ে যাওয়ার কথা তাঁর মনে হল না। শুনেছি এই নিয়ে তাঁর কলকাতার হেড-আপিসের সঙ্গে কাজ করতে অসুবিধা হয়েছিল। এর দু'তিন দিন পরে কলকাতায় বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির সভা হয়েছিল। সেখানে একটি বিষয়ে তাঁর হাজির হওয়ার দরকার ছিল। সেজন্য তাঁকে ডাকতে লোক পাঠানো হল এবং প্রহরা ও গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তখনও ভয় থেকে মুক্তি পাননি, আসতে অস্বীকার করলেন।

এই ঘটনাটি বলবার কারণ এই যে, শান্তিনিকেতনে লোকের মনে ভয় কীরকম বাসা বেঁধেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে। মাস্টারমশায়রা অনেকে লিখে জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা বাজারে যেতে ভয় পান ; কাজেই তাঁদের সবার সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরীর দরকার ; কিন্তু সেই প্রহরীরা কখনই পুলিশ হতে পারবে না। একসময় ছিল যখন জমিদাররা কিছু কিছু সশস্ত্র বরকন্দাজ রাখতেন, কিন্তু সে সব তো এখন ইতিহাসের বিষয়। এখন অত সশস্ত্র প্রহরী কোথায় পাওয়া যাবে ? বিকাল চারটের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস খালি হয়ে যেত। কর্মীরা সন্ধ্যা হবার আগে বাড়ি পৌঁছতে চাইতেন। অনেকে দূরে গ্রাম থেকে সাইকেলে আসতেন। আমি তাঁদের দোষ দিই না। সন্ধ্যার সময় আমি টর্চ হাতে বেড়াতে বেরোতাম। কখনও কোনো বাড়ি থেকে আমার কাজের লোককে ডেকে বলে দেওয়া হত, তোমার সাহেব যেন ওরকম না বেরোন। জনহীন মাঠে সন্ধ্যার মুখে আমার আর-একজনের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। তাঁর নাম রণজিৎকুমার রায়। তিনি শান্তিনিকেতনের এই ভয়ের স্রোতকে অনেকটা প্রতিহত করেছিলেন। সেকথায় পরে আসব। তার পূর্বে কয়েকটি ঘটনা বলা দরকার। শান্তিনিকেতন

স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে কয়েকটি রাইফেল চুরি হল, তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না। লোকে বলতে লাগল যারা একাজ করেছে তারা রাইফেল হাতে করে হাসপাতালের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গিয়েছিল। অনেকে দেখেছে এবং লোকে বলত রাইফেল চুরি করা যারা দেখেছিল তারা ইচ্ছা করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। আরও কয়েকটি ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। তার মধ্যে একটি খুব মারাত্মক। এই ঘটনা দেখবার পরে পুলিশের উপর বিশ্বাস রাখা কঠিন হয়ে উঠেছিল।

শ্রীনিকেতনে প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার একটি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যাপার। আমরা তাঁদের ব্যবস্থা করে দিতাম এইমাত্র। কয়েকজন শিক্ষক কয়েক সপ্তাহ সেখানে এসে থাকতেন এবং ট্রেনিংয়ের পর ফিরে যেতেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্বন্ধে কাগজে অনেক কথা দেখা যায়, কিন্তু একটি খবর আমি জানতাম না যে, এই পরীক্ষায় পাস করতে পারলে তাঁদের মাইনে বাড়ে। বেতনবৃদ্ধির পরিমাণ এক টাকা। এক টাকা মাইনে বাড়বে এই আশায় অন্তত পনের-কুড়ি জন শিক্ষক মাসখানেক প্রবাসে থেকে পরীক্ষা দিয়ে চলে যেতেন। তাঁদের সঙ্গে গিয়ে আমি একাধিকবার দেখা করেছি, তখন অবশ্য আমি এক টাকার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা জানতাম না। তখন শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনে বেশ অশান্তি চলছে। শ্রীনিকেতন থেকে আসা-যাওয়ার সময় দেখেছি তিনচার জন পুলিশ বারান্দায় বসে পাহারা দিচ্ছে, তাদের রাইফেল পিছনের দেয়ালে ঠেকানো। কখনও কখনও শুনেছি ট্রানজিস্টার বাজছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গেও যে তাদের ভাব নেই তা নয়। আমার কাছে এ ব্যবস্থা ভাল ঠেকত না, কিন্তু এরা সরকারের লোক, এদের উপর আমার কোনো এক্তিয়ার ছিল না। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার আপিস থেকে বের হব, তখন আপিস খালি হয়ে গিয়েছে, সবাই বাড়ি চলে গিয়েছেন এমন সময় একজন অল্পবয়স্ক শিক্ষক সাইকেল চেপে এসে খুব ব্যস্তভাবে বললেন, 'আপনি একবার থানায় চলুন, ভয়ানক ব্যাপার হয়েছে।' তিনি যা বললেন তার মর্ম এই—শ্রীনিকেতনে সেই বাড়ির বারান্দা থেকে কয়েকটি রাইফেল কারা যেন কেড়ে নিয়ে গিয়েছে, পুলিশরা বাধা দিতে গিয়ে আহত। ফলে থানা থেকে একদল পুলিশ এসে যে-কয়েকজন প্রাথমিক শিক্ষককে পেয়েছে তাদের থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং সেখানে হাজতে পুরে তাদের প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয়েছে। এই কাহিনীর প্রথম অংশ আমি বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু বয়স্ক শিক্ষকদের থানায় নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করবার কথা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। সেই রাত্রে কিছু করা গেল না। পরদিন সকালে সিকিউরিটির মণ্টুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গেলাম। তখন থানার কর্তা ছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। রিটায়ার করবার সময় হয়ে এসেছে। রিটায়ার করবার আগে তাঁকে কিছুদিনের জন্য ডি· এস· পি-র পদ দেওয়া হয়েছিল। কয়েকদিন আগে তিনি আমার সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। সব কর্মচারীরাই এরকম সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতেন। ইতিপূর্বে আমি বোলপুর থানায় আসিনি। দেখে মনে হল এই থানা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে তৈরি। কয়েকজন কয়েদি ইচ্ছা করলেই গারদ

ভেঙে পালিয়ে যেতে পারে। এত জীর্ণ ও প্রাচীন বাড়ি যে থানার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এ আমি কখনও ভাবিনি। বছরখানেক পরে এই বাড়ি ভেঙে ফেলে নতুন বাড়ি হয়েছিল। থানার দ্বার উন্মোচন হয় কিনা জানি না কিন্তু সেদিন সেরকম উৎসব কিছু হয়েছিল। আমি উপস্থিত থেকে প্রদীপও জ্বেলেছিলাম মনে আছে। এবার কাহিনীর প্রথম দিকে ফিরে যাওয়া যাক। দেখলাম আমার পূর্বপরিচিত ডি· এস· পি· ভদ্রলোক টেবিলে কাগজপত্র নিয়ে কাজ করছেন। আমি আগের দিন সন্ধ্যাবেলা যা শুনেছি সব তাঁকে খুলে বললাম এবং জানালাম হাজতে যে সব শিক্ষকরা আছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। শুনেছি সেইসব ভদ্রলোকদের খুব মারধর করা হয়েছে। এই শুনে ডি· এস· পি· জিভ কেটে বললেন, 'ছি ছি, আপনি ভুল শুনেছেন। এখন কি ওসব হয়? ওসব অধর্মের কাজ পুলিশ করে না।' দেখা করতে চাইলে তিনি বললেন তাঁদের খুব ভোরে সিউড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানকার আদালতে হাজির করা হবে। এরপর আমার থানায় আর কিছু করবার ছিল না। কিন্তু থানা থেকে বেরিয়েই আমার মনে হল আদালতে যদি উকিল দিতে হয় কিংবা জামিনের ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে কে করবে? এই কথা মনে হওয়াতে মণ্টুবাবুকে বললাম, বোধহয় সিউড়ি ঘুরে আসা উচিত। অন্তত আটক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করা দরকার। সিউড়ি ওখান থেকে মোটরে এক ঘণ্টার পথ। যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন কোর্টে লোকজন আসামী ফরিয়াদি উকিল মোক্তার সবাই উপস্থিত। কিন্তু হাকিম তখন আসেননি। মণ্টুবাবু চেষ্টা করলেন কোনো উকিলকে দিয়ে আসামীদের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবার। যখন এইসব কথা হচ্ছিল তখন একজন লোক এসে দাঁড়ালেন। পরে বুঝলাম দালাল শ্রেণীর। তিনি মণ্টুবাবুকে বোঝাতে লাগলেন, চেষ্টা করা যেতে পারে, তবে হাকিমের অনুমতি পাওয়া খুব কঠিন। এর মধ্যে যা উহ্য ছিল, সেটা হচ্ছে বোধহয় তার হাত দিয়ে কিছু টাকা খরচ করা দরকার। আদালতের আঙিনায় এইসব কথা হচ্ছে এবং সাধারণত যেমন হয় কিছু লোকও জমে গিয়েছে। এমন সময় পিছন থেকে একজন লোক বললেন, 'ওদের দেখতে চান তো, সে এমন কী বড় কথা। হাকিম দরকার হবে না, এই দিকে আসুন।' বাড়িটার পিছন দিকে গিয়ে দেখি লোহার গরাদ দেওয়া বারান্দা, কলকাতার চিড়িয়াখানায় বাঘেদের যেমন করে রাখা হয়। অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে মাস্টারমশায়দের রাখা হয়েছে। বোলপুরের ডি· এস· পি· জিভ কেটে আমাকে বলেছিলেন মারধরের কথা তো তাঁরা ভাবতেই পারেন না। আমি তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সমস্ত শরীরে এতটুকু জায়গা নেই যেখানে আঘাতের চিহ্ন নেই, এবং সবাইকে নাকে এবং কানে তুলো গুঁজে প্লাগ করে দেওয়া হয়েছে যাতে রক্ত না বেরতে পারে। এর মধ্যে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছিলেন, সাতদিন পরে তাঁর মেয়ের বিয়ে হবার কথা। শুনেছিলাম বিয়ের চিঠি পর্যন্ত ডাকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যে আসন্ন মেয়ের বিয়ের সময় পুলিশের রাইফেল ছিনিয়ে নেবার বীরত্ব দেখাবেন, একথা বিশ্বাস করা আমার কঠিন হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনার পরে ওখানকার পুলিশ প্রশাসন বদলে গেল। যাঁরা পরে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তাঁরা সজ্জন এবং ভদ্রলোক। পুলিশ যাঁদের

বিপজ্জনক লোক বলে ধরেছিল তাঁদের আর কোনো কষ্ট পেতে হয়নি, তাঁরা ছাড়া পেয়ে গেলেন। এঁদের সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি, কেবল একজন ছাড়া। যে অল্পবয়স্ক শিক্ষকটি আমাকে খবর দিয়েছিলেন তিনি এইসব ঘটনা চুকে যাবার পর একদিন আপিসে এসেছিলেন। তিনি বারে বারে বলতে লাগলেন, তাঁদের মতো লোকেদের জন্য কেউ কোথাও কিছু করে না। কেবল বিশ্বভারতীর কর্তারা এর ব্যতিক্রম। তিনি আর একটি কথা বলেছিলেন। সেটি লেখা উচিত হবে কিনা জানি না। সেটি এই—তাঁদের হেডমাস্টারমশায়ও তাঁদের কথায় বিশ্বাস করে তাঁদের জন্য একাজ করতেন না, কিন্তু বিশ্বভারতী যথেষ্ট করেছেন।

এত জিনিস বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আরও দু'একটি কথা বলতে হবে। নাহলে বিশ্বভারতীর কৃষ্ণপক্ষের পরিচয় সম্পূর্ণ দেওয়া যাবে না। একদিন আমার বাড়ি আক্রান্ত হল। তখন শ্রীনিকেতনের কাছে এবং শান্তিনিকেতনে পুলিশ পিকেট বসেছে। তার একটি পিকেট লক্ষ্য করেছি শ্রীনিকেতনের কাছে। একটি যুবকের দল হাতে বোমা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল। অবিলম্বে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হল। তখন একদল ছাত্র জমায়েত হয়ে আমার বাড়ির দিকে আসবার চেষ্টা করে। তখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-য়ের তলায় পুলিশ পাহারা ছিল। মণ্টুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন আমি তাদের সঙ্গে দেখা করব কিনা। আমি কখনও ছেলেদের সঙ্গে দেখা করব না, একথা বলিনি। যারা এসেছিল, একটা বড় দল ষাট-সত্তর জন হবে, সবাই ছাত্র কিনা বলা কঠিন। তাদের বক্তব্য, কয়েকজন ছাত্রকে সেদিন পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গিয়েছে, তাদের তখনই ছাড়িয়ে আনতে হবে। থানায় গিয়ে ছাড়িয়ে আনার দাবি তখন অনেক জায়গায় করা হত। পুলিশ কেন ধরেছিল একথা জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল যে, তারা খাবার কিনতে গিয়েছিল। তাদের হাতে খাবারের ঠোঙা। পুলিশের বক্তব্য ছিল তাদের হাতে আর যাই থাক সেটা খাবারের ঠোঙা নয়। তারা ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করছিল, আমি সেটা হতে দিইনি, বাগানে তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারা জোর করে ঢুকলে অবশ্য কিছু করতে পারতাম না। তারা প্রায় ঘণ্টা চারেক তর্জন গর্জন করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের দল আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল। বাকি রাত নির্বিঘ্নে ঘুমোলাম। তাদের মধ্যে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে আমার কন্যা আমার জন্য শঙ্কা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু দলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ানোর একটি বিশেষ কারণ ছিল। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, ছোরার আঘাত কিংবা পিস্তলের গুলি থেকে বাঁচবার কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু দলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে বোমা ছোঁড়বার অসুবিধা হয়। আমার মনে করবার কারণ ছিল যে, তাদের সঙ্গে বোমা আছে। পরদিন সকালে আর কোনো গোলমাল হয়নি।

কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছিল যে, কয়েকটি জিনিস, লোকে যাই বলুক, করা দরকার। প্রথম হচ্ছে রবীন্দ্রভবন ও কলাভবন রক্ষার জন্য ভাল ব্যবস্থা। শ্রীনিকেতন ও বিনয়ভবনের গ্রন্থাগারের যে হাল হয়েছিল, রবীন্দ্রভবন ও কলাভবনের সে হাল কখনই হতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এইসব ব্যবস্থা

করতে সময় লাগে। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন নিজেদের বাহুবলের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। কলাভবনের ছেলেদের রাত জেগে পাহারা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সকলেই বুঝতে পারবেন এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল চলতে পারে না। কলাভবনে যখন ঠিক হল শিক্ষক ও ছাত্ররা রাত জেগে পাহারা দেবেন, তখন এই ভেবে খুশি হয়েছিলাম যে, একটি ভবন অন্তত তারা নিজেরাই বিপদ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। প্রথম রাত্রে যখন থেকে অধ্যাপক ও ছাত্ররা পাহারা দিতে আরম্ভ করলেন তখন অনেক রাত্রে দেখতে গিয়েছিলাম। কলাভবনের সেই রূপ যাঁরা কখনও দেখেননি তাঁরা বুঝবেন না। ছাত্র এবং অধ্যাপকরা যে যা পেরেছেন যেমন, লাঠি, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্র সংগ্রহ করে পাহারায় হাজির হয়েছেন। দু'চারজনের অস্ত্র এত ভারী যে, মনে হল সেগুলো তাঁদের ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তবে উৎসুক জনতা ও পাহারাদারের অভাব ছিল না। যখন রাত আরও গভীর হল তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিকিউরিটির কর্তা অজিত মুখোপাধ্যায় বললেন, একবার শ্রীনিকেতন থেকে ঘুরে আসি। সাইকেল ছাড়া আর কোনো বাহন ছিল না। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি একা যাবেন ? কারণ তখন ঐসব রাস্তায় যা কিছু ঘটতে পারত। আমার কথা শুনে অজিতবাবু বললেন, 'আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে।' তাঁর নিজের একটি রিভলভার ছিল। শান্তিনিকেতনে সিকিউরিটি ডিপার্টমেণ্টে ঐ একমাত্র আগ্নেয়াস্ত্র। তিনি আমার কথা শুনে পকেট থেকে রিভলবারটি বার করে শূন্যে একবার ছুঁড়ে লুফে নিয়ে সাইকেলে উঠে পড়লেন। আমার মনে হল শিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন 'ষোড়শী' অভিনয় করতেন, তখন এক দৃশ্যে তিনি ঐভাবে স্টেজ থেকে বেরিয়ে যেতেন।

এতদিন সব উপদ্রবই রাত্রে হত। কিন্তু একদিন সকালে আমি বের হব বলে তৈরি হচ্ছি, তখন আটটা বেজে গিয়েছে, এমন সময় টেলিফোন এল কয়েকজন যুবক পাঠভবন আক্রমণ করেছে, তাদের হাতে পাইপগান। আমার বাড়ি থেকে পাঠভবন হেঁটে যেতে অন্তত কুড়ি মিনিট লাগে। আমি টেলিফোন করে বললাম তাড়াতাড়ি গাড়ি পাঠিয়ে দিতে। গাড়ি আসতে দেরি হতে লাগল এবং আমি অধৈর্য হয়ে বারে বারে টেলিফোন করতে লাগলাম। পরে শুনতে পেলাম তখন যিনি কর্মসচিব ছিলেন, অমিয়কুমার সেন, তিনি ইচ্ছা করেই গাড়ি পাঠাতে দেরি করেছিলেন, যাতে আমি গোলমালের মধ্যে না গিয়ে পড়ি। আমি যখন গিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন পাইপগানওয়ালারা বেরিয়ে গিয়েছে। কোনো প্রাণহানি হয়নি কিংবা ক্ষতি হয়নি। কিছু চাঞ্চল্য অবশ্যই হয়েছিল। মণ্টুবাবু খালি হাতে সেই যুবকদের পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন। মাস্টারমশায়রা শুনেছি কেউ কেউ সাময়িকভাবে অন্তর্ধান করেছিলেন। এও শুনেছি তাঁরা পুলিশ ডাকতে গিয়েছিলেন। পাঠভবনের ছাত্ররা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি নাটক লিখেছিল। তার চরিত্ররা সবাই পরিচিত। সেটি কোথাও অভিনীত হতে পারেনি। ছেলেরা বলেছিল অভিনয় করতে গেলে সেন্সার অর্থাৎ উপাচার্য আপত্তি করবেন। পাঠভবন কিন্তু এই ঘটনায় বন্ধ হয়নি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল এবং ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেল।

পাঠভবনের ঘটনার পর আমার মনে হতে লাগল যে, এতদিন সন্ধ্যার পর আমাদের কোনো নিরাপত্তা থাকত না, কিন্তু এখন দিনের বেলায়ও সেই অবস্থা। এরকম চললে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। অনেক রাত্রে শুতে যাবার সময় মনে হত, হয়তো ক্রুদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্ন দেখব। যেন আমাকে বলছেন, 'শান্তিনিকেতন তুই রক্ষা করতে পারলি না।' স্বপ্ন সাধারণত দেখি না, কিন্তু এই ভয় আমাকে তাড়না করে ফিরছিল। শান্তিনিকেতনে যখন কোনো দুর্বিপাক হত, তখন বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সেকথা জানিয়ে রাখতাম। আমার মনে হয়েছিল যে, উপাচার্য হিসাবে এটি আমার কর্তব্য। আরও একটি কারণ ছিল। আমি দেখেছি এই সব ঘটনা পরবর্তীকালে নানারকম ভাবে বিকৃত হয়ে সরকারের কাছে পৌঁছয়। কাজেই প্রথম থেকে প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে রাখা উচিত। পাঠভবনের ঘটনার পর আমি আচার্যাকে একটি বিস্তারিত চিঠি লিখলাম। সে চিঠিতে আমি বলেছিলাম যে, যে ধরনের ঘটনা দিনের পর দিন ঘটছিল তাতে বিশ্বভারতীর কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠছিল। এই সব গোলমালের জন্য একদিনও বিশ্বভারতীর কাজ বন্ধ হয়নি। আমি পুরোপুরি কী কী ঘটনা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়ে আচার্যাকে জানালাম প্রশাসন শক্ত না হলে বিশ্বভারতীর কাজ চালানো সম্ভব নয়। অল্পদিনের মধ্যে হয়তো কাজ চালানো বন্ধ করে দিতে হতে পারে। আচার্যার কাছ থেকে জবাব আসতে দেরি হল না। তিনি জানালেন, আমি যেন দিল্লি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। দিল্লিতে আমার অন্য কাজও ছিল।

যথা সময়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে উপস্থিত হলাম। আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, শ্রীমতী গান্ধীর কাছে যে-সব চিঠি লিখতাম তা তিনি যত্ন করে পড়তেন এবং সমাধান কী হতে পারে ভেবে রাখতেন। কাজেই আলোচনার সুবিধা হত। আলোচনার প্রথমেই শ্রীমতী গান্ধী আমাকে বললেন, 'চিঠি পড়েছি। কিন্তু পুলিশ যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে তার সঙ্গে আপনার চিঠির মিল নেই।' আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'মিল থাকলে আমার এখানে আসবার কোনো দরকার হত না।' তিনি বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আরও কিছু ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং কী কী করলে বিশ্বভারতী সুস্থ হতে পারে তা নিয়ে অল্প আলোচনা হল। তারপর বললেন, 'আপনি একবার অমুকের সঙ্গে দেখা করে আসুন। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছে। ফিরে যাবার আগে আবার আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।' যে মন্ত্রীমশায়ের কাছে গেলাম, তিনি আমাকে বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে আপনি যা চিঠি লিখেছেন সব আমি পড়েছি। ভবিষ্যতে আপনি কি আমাকেও ঐরকম চিঠি লিখবেন ?' আমি বললাম, 'তা সম্ভব হবে না। আমি তো প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিইনি, আচার্যাকে চিঠি দিয়েছি। প্রয়োজন হলে তাঁকে লিখতে তো হবেই।' শান্তিনিকেতন ফিরে আসবার আগে আচার্যার সঙ্গে আবার দেখা হল। তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি যান, অল্পদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।' অল্পদিন যে এত অল্পদিন তা আমি বুঝতে পারিনি। বোধহয় পনের দিনের মধ্যে বোলপুর-শান্তিনিকেতনের চেহারা বদলে গেল। নতুন ম্যাজিস্ট্রেট এলেন বীরভূমে। নতুন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও এলেন। থানার চেহারা অন্যরকম।

তাছাড়া পুলিশের আর একজন নতুন কর্মচারী। এইসব পরিবর্তনের ফলে বিশ্বভারতীতে জীবনযাত্রা নির্ঝঞ্ঝাট এবং লেখাপড়ার সুযোগ হল।

প্রশাসনে পরিবর্তন না হলে জীবনযাত্রা কখনই স্বাভাবিক হতে পারত না। কিন্তু তার সঙ্গে আর একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলা দরকার। আমার বাড়ির খুব কাছে শ্রীরণজিৎকুমার রায় থাকতেন। দোতলার বারান্দা থেকে তাঁর বাড়ির সামনের দিক চোখে পড়ত। তিনি পুরনো যুগের সিভিলিয়ান। বেশ কিছুদিন আগে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে পূর্বে সামান্য পরিচয় ছিল ; আমি শান্তিনিকেতনে আসার পর সেই পরিচয় গাঢ় হল। শুনেছি তাঁর স্ত্রী শকুন্তলা দেবী একসময় বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগ রাখতেন। তাঁর সঙ্গে যখন রণজিৎবাবুর বিয়ে হল, তখন এই নিয়ে একটু গুঞ্জন হয়েছিল। রণজিৎবাবু নাকি তাঁর কোনো উপরওয়ালাকে বলেছিলেন, 'আমি সরকারের চাকর, তাই বলে আমার স্ত্রীও সরকারের চাকর নন।' এই গল্প সত্য কিনা জানি না, কিন্তু রণজিৎবাবুকে যাঁরা জানেন তাঁদের মনে হবে সত্য হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। গল্পটি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে আশ্চর্যরকম খাপ খেয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর তাঁদের বাড়ি গিয়ে বসতাম, তাঁরাও মাঝে মাঝে আসতেন। বিশ্বভারতীর এলাকায় ১৯৭১ সাল শেষ হবার আগেই মনে হত সন্ধ্যার পরে জীবন স্তব্ধ হয়ে গেছে। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভিতর থাকতেন তাঁরাও সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে জানালা বন্ধ করে দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যার আগে আমি হাঁটতে বের হতাম। শীতকালে ফিরবার সময় অন্ধকার হয়ে যেত। সদর দপ্তরের কাছে এসে দেখতাম আর একজন লোক বেড়িয়ে ফিরছেন। তিনি রণজিৎ রায়। এক চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। সেদিক দিয়ে হেঁটে গেলে আমাকে চিনতে পারতেন না। কখনও কখনও ফিরবার পথে আমার বাড়িতে বসে অল্পক্ষণ গল্প করে যেতেন। একা একা তিনি অন্ধকার রাত্রে ঘুরে বেড়ান এটা আমার ভাল লাগত না। রণজিৎবাবুর একসময় ভাল শিকারী বলে খ্যাতি ছিল। তাঁর কয়েকটি শিকারের গল্প ছাপা হয়েছে। বাঙালি পাঠকদের কাছে তিনি একেবারে অপরিচিত নন। তাঁকে একদিন বললাম, 'আপনি সন্ধ্যার পর এরকম ঘুরে বেড়ান এতে আমার একটু অস্বস্তি বোধ হয়। সঙ্গে কোনো অস্ত্র নিয়ে বেরোলে ভাল হয়।' তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'এখন তো আর শিকার করি না। বন্দুকটন্দুক যা ছিল সবই বিলিয়ে দিয়েছি।' আর একটু বসে 'খাবার সময় হয়েছে' বলে উঠে গেলেন। বোধহয় পরদিনই বেড়িয়ে ফিরবার পথে আমার ঘরে এসে বসলেন। দু'এক মিনিট পরে পকেট থেকে একটি জিনিস বের করে আমার টেবিলের উপর রাখলেন। আমি বললাম, 'এই তো আপনার রিভলভার রয়েছে দেখছি।' রণজিৎবাবু মনে হল আমার অজ্ঞতা দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। বললেন, 'আপনি কীরকম লোক মশায়, রিভলভার আর পিস্তলে তফাত বোঝেন না। এটা তো পিস্তল।' কী করে বুঝব ? আমার কাছে তো সবই সমান। যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা লিখেছি বটে কিন্তু সে অনেককালের কথা। তখন এধরনের অস্ত্র ছিল না। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, যে অস্ত্রটি রণজিৎবাবু পকেট থেকে বের করে টেবিলের

উপর রেখেছেন, তার গায়ে কিছু কারুকার্য করা। রণজিৎবাবু বললেন যে, তাঁর নিজের অস্ত্র কিছু নেই, এটি তাঁর স্ত্রীর। তাঁর কাছেই পড়ে ছিল। তিনি পিস্তল দেখাতে এনেছেন। পিস্তলটি ফরাসি দেশে প্রস্তুত। মেয়েদের হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে সহজেই পুরে নেওয়া যায়। রণজিৎবাবুকে বললাম, 'আপনি এটা নিয়ে বের হলেই পারেন।' রণজিৎবাবু বুঝিয়ে বললেন কিছু অসুবিধাও আছে। এর গুলি ফ্রান্স থেকে আনতে হয়, দেশে কিনতে পাওয়া খুব কঠিন। তাছাড়া গুলি করবার সময় মাঝে-মাঝে আটকে যায়। যাঁরা ক্যামেরা ব্যবহার করেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন। যাই হোক, রণজিৎবাবু হয়তো মনে করেছিলেন নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। এই পিস্তলটি কয়েকদিন পরে রণজিৎবাবুর প্রাণরক্ষার কারণ হয়েছিল।

কিছুদিন থেকে শান্তিনিকেতনে বাড়ি থেকে বন্দুক চুরি হচ্ছিল। ছিনতাইও হত। পুলিশ থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল যে, যাঁরা মনে করেন বাড়িতে অস্ত্র রাখা নিরাপদ নয়, তাঁরা যেন আগে থেকে জানিয়ে অস্ত্রগুলি থানায় জমা দিয়ে আসেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, যাঁরা থানাকে জানাতেন অস্ত্রগুলি অমুক দিনে জমা দেবেন, তাঁরা সবসময় থানায় গিয়ে পৌঁছতে পারতেন না। মাঝপথেই তাঁদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হত। আমার বাড়ির কাছেই এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। বিশ্বভারতীর একজন পুরনো কর্মী বাড়িতে কোনো হাঙ্গামা হতে পারে এই ভয়ে তাঁর রিভলভার থানায় জমা দিতে যাচ্ছিলেন। আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল। পূর্বপল্লীর রাস্তায় তিনটি যুবক তাঁকে সাইকেল থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে তাঁর অস্ত্রটি কেড়ে নিয়ে চলে যায়। শীতকাল শেষ হতে তখনও বাকি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কাজে কলকাতায় এসেছিলাম। সাধারণত শান্তিনিকেতন যেতে হলে কলকাতা থেকে দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে যেতাম। শান্তিনিকেতন পৌঁছত বিকাল চারটে নাগাদ। হাওড়া স্টেশনে যাবার জন্য আমি প্রস্তুত। জিনিসপত্র গাড়িতে উঠেছে, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় টেলিফোন বাজল। আমার মেয়ে ঈশানী শান্তিনিকেতন থেকে ফোন করেছে। যে টেলিফোন ধরেছিল তাকে শুধু বলেছে, বাবা যেন সাবধানে আসেন। শুনেই আমার মনে হলে শান্তিনিকেতনে আমার দপ্তরে কোনো গণ্ডগোল হয়নি তো। আবার উপরে উঠে শান্তিনিকেতনে আমার আপিসে 'লাইটনিং কল্' করলাম। ওদিক থেকে যিনি টেলিফোন ধরলেন তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, আমাদের আপিসে কিছু হয়নি। এই বলে টেলিফোন ছেড়ে দিলেন। তখন আর সময় ছিল না। আমাদের আপিসে কিছু হয়নি এর মানে কি আর-কোথাও হয়েছে? নিজেকে এই প্রশ্ন করতে করতে বিকালে শান্তিনিকেতনে পৌঁছলাম।

প্রশ্নের উত্তর পেতে দেরি হল না। শান্তিনিকেতনের একটি গুণ দেখেছি, যদি কোনো দুঃসংবাদ থাকে তাহলে তা জানাবার জন্য স্টেশনে লোকের অভাব হয় না। স্টেশনেই জানতে পারলাম সেদিন সকালে এগারোটা নাগাদ রণজিৎবাবুর বাড়িতে তিনজন যুবক হামলা করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পিস্তলটি হস্তগত করা। তখন বেলা হয়েছে, রণজিৎবাবু সামনের বারান্দায় বসে ছিলেন। যুবক তিনজন এসে বেশি ভূমিকা না করে তাঁর পিস্তলটি চাইল। রণজিৎবাবু

নিশ্চয়ই একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন পিস্তল তাঁর কাছে নেই, থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এই শুনে ছেলেরা জানাল তাঁর পিস্তলের নম্বর এত, সেটা থানায় জমা পড়েনি। তখন আর ছলনার কোনো দরকার ছিল না। কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর শকুন্তলা দেবী একটি ঘরে আলমারি এবং ড্রয়ার ঘেঁটে বললেন সেখানে পিস্তল নেই। তখন দু'জন ছেলে ছোরা দেখিয়ে শকুন্তলা দেবীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। একটি ছেলের হাতে রিভলভার ছিল, সে রণজিৎবাবুকে অন্য ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে কিছুক্ষণ এটা ওটা খোঁজবার ভান করবার পর রণজিৎবাবু হঠাৎ ফিরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর হাতে পিস্তল। পিস্তল যে কোথায় ছিল সেটা উনি এবং শকুন্তলা দেবী দু'জনেই ভাল জানতেন। সময় পাবার জন্য একটু অভিনয়ের দরকার ছিল। শকুন্তলা দেবী কয়েকদিন পরে আমাকে গল্প করেছেন, প্রায় একসঙ্গে দুটি গুলির আওয়াজ শুনলাম। যে যুবক দুটি শকুন্তলা দেবীকে আটকে রেখেছিল, আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্তর্ধান হল। 'আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না পাশের ঘর থেকে। এক মুহূর্তের জন্য আমার সাংঘাতিক ভয় হল। গুলির শব্দ থেকে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, কে আগে গুলি ছুঁড়েছে। পরের মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম কী হয়েছে। রণজিৎবাবু যে ঘরে ছিলেন, সে ঘরের সঙ্গে বাথরুম দিয়ে কে যেন ছুটে পালাল।' শকুন্তলা দেবী গিয়ে দেখলেন যে, মেঝেতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। ইতিমধ্যে অন্য যুবক দুটি, যারা শকুন্তলা দেবীকে আটকে রেখেছিল, সামনের রেললাইন পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রথম গুলির শব্দটি রণজিৎবাবুর পিস্তল থেকে হয়েছে। যুবকটির গুলি রণজিৎবাবুর গায়ে লাগেনি। যে যুবকটির গায়ে পিস্তলের গুলি লেগেছিল, সে রণজিৎবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার বাড়ির দিকে ছুটে চলে এল। আমার বাড়ির দক্ষিণে একটি খালি বাড়ি, তার হাতায় অনেক পেয়ারা গাছ। পাড়ার ছেলেরা কখনও কখনও পেয়ারা পাড়তে আসত। ছেলেটি এসে সেই পেয়ারাবাগানে ঢুকল। তখন তার আর হাঁটবার শক্তি ছিল না। তখন আমার বাড়িতে কুবের সিং বলে একটি পাহারার লোক ছিল। তার মনে হল পাশের বাড়ির বাগানে পেয়ারা চুরি হচ্ছে। সে 'কোন হ্যায় রে' হাঁক দিয়ে গিয়ে দেখল একটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। কুবের সিং ভাবল যখন এরকম খুন জখম হয়েছে, তখন একজন হাকিম জাতীয় লোককে খবর দেওয়া দরকার। আমার বাড়ির সবচেয়ে কাছের হাকিম রণজিৎকুমার রায়। কুবের সিং ছুটে গিয়ে তাঁকে সেলাম করে বলল, 'হুজুর, বাগানের মধ্যে একটা মুর্দা পড়ে আছে।' রণজিৎবাবু জীবনে এধরনের অনেক সরকারি সংবাদ পেয়েছেন। এই সংবাদটি শুনে তাঁর কী রকম মনে হল জানি না। একসঙ্গে আসামি ও হাকিম হওয়া বোধহয় তাঁর ভাগ্যে এই প্রথম। আমি বিকালে শান্তিনিকেতন পৌঁছে দেখলাম রণজিৎবাবুর বাড়ির সামনে তখনও কৌতূহলী লোকের ভিড়। এবং কিছু পুলিশের লোক। রণজিৎবাবু তখন ভিতরে ছিলেন, আমি তাঁকে আর বিরক্ত করলাম না। শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে একমিনিট কথা বলে বাড়ি চলে এলাম। পরদিন কলকাতার পুলিশের কাছ থেকে আমার কাছে একটি প্যাকেট এসে পৌঁছল। আগেই আমাকে জানানো হয়েছিল প্যাকেটটি যেন আমি

রণজিৎবাবুকে পৌঁছে দিই। প্যাকেটে রণজিৎবাবুর পিস্তলের জন্য কিছু গুলি। রণজিৎবাবুর অবশ্য এর পরে পিস্তল ছোঁড়বার কোনো দরকার হয়নি। এই ঘটনার পরে তাঁর বাড়ির বাগানে একটি পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছিল।

যে যুবকের মৃতদেহ কুবের সিং দেখেছিল পরে জানা গেল সে অনেকের কাছে পরিচিত। তার এক আত্মীয়া বিশ্বভারতীর একজন প্রধান কর্মচারীর বাড়িতে কাজ করতেন। তখন লোকের এত ভয় যে, কয়েকদিন পর্যন্ত মৃতদেহ সনাক্ত করতে কেউ এলেন না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ছে। আমার বাড়ির সামনের হস্টেলে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জন ছাত্র থাকত। এই ঘটনার সময় তারা স্নান করতে যাবার আগে বারান্দায় রোদ পোহাচ্ছিল। পিস্তলের আওয়াজ ও গোলমাল শুনে সবাই যে যার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তখন যে ধরনের আবহাওয়া চারদিকে তাতে ছেলেদের হয়তো বেশি দোষ দেওয়া উচিত হবে না। কিন্তু একথাও মনে হয়েছিল যে, চল্লিশ বছর আগে এই রকম ঘটনা ঘটলে ছেলেদের প্রতিক্রিয়া কি ঠিক এই রকম হত ?

এ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর কথা যা লিখেছি তাতে মনে হতে পারে যে, আমি সেখানে খুব দুঃখে ছিলাম। খুব দুঃখে হয়তো ছিলাম না, কিন্তু অশান্তিতে ছিলাম। কৃষ্ণপক্ষের শেষ একসময় হতেই হয়। অবশেষে, অর্থাৎ আমি কাজের ভার নেবার বছর দুয়েক পরে, শুক্লপক্ষের আভাস পাওয়া গেল। একথা ভাবলে ভুল হবে যে, তখন যে কাজে হাত দিয়েছি সেই কাজই সফল হয়েছে। সে বোধহয় কোথাও হয় না। তবে পরিশ্রম করলে কিছু ফল পাওয়া যায়। প্রথমে আমার দুর্ভাবনা ছিল যে, শান্তিনিকেতনকে বিপদমুক্ত রাখতে পারব না। রাত্রে খুব ক্লান্ত হয়ে শুতে যাবার সময় মনে হত কাল সকালে আর বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা খুলতে পারব না। আচার্যার দপ্তর থেকে চিঠি এল যে বিশ্বভারতীর প্রশাসনের পরিবর্তন সম্বন্ধে ভাবা হচ্ছে। পূর্বে যে ব্যবস্থা ছিল তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব ছিল না। কাজ চালাতে গেলে যে ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া আছে তাও সর্বত্র উপাচার্য ব্যবহার করতে পারতেন না। যে সভায় অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক উপস্থিত থাকতেন, সেখানে যে মতের দল ভারী সেই দল অনুসারে সাধারণত কাজ হয়। কখনও কখনও এমনও হয়েছে যে, যে-পরিবর্তন বিশ্বভারতীর সংবিধান বিরোধী তাও ভোটে পাস করিয়ে নেওয়া যেত। আমার কাছে একবার দিল্লি থেকে চিঠি এল যে, অমুক অমুক জিনিস যে পাস হয়েছে তা খুব বে-আইনি ; উপাচার্য বাধা দিতে পারতেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম বাধা দেবার কোনো ক্ষমতা উপাচার্যকে দেওয়া হয়নি। আমি কেবল বুঝিয়ে বলতে পারি, তার বেশি কিছু অধিকার আমার নেই। এর পরে দিল্লিতে আমার ডাক পড়ল। বোধহয় দু'দিন আচার্যার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছেও কাজ ছিল। ফিরে আসবার অল্পদিন পরেই একদিন সকালে রেডিওতে শুনলাম বিশ্বভারতীর প্রশাসনের কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার ফলে উপাচার্যের কাজের সুবিধা হতে পারে। উপাচার্য নিজে যে বিশেষ কোনো নতুন ক্ষমতা পেয়েছিলেন

তা নয়, কিন্তু কমিটিগুলির সদস্যদের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কর্মসমিতিতে কারা থাকবেন তাও দিল্লি থেকে বলে দেওয়া হয়েছে। অনেক সদস্য মনোনীত। যাঁরা বাদ পড়েছিলেন স্বভাবতই তাঁরা সন্তুষ্ট হননি। কিন্তু ছোট কমিটির সঙ্গে কাজ করা অনেক সহজ। সবাই সব বিষয়ে কথা বললে এবং বাধা দেবার চেষ্টা করলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। বিশ্বভারতীর স্বার্থ এবং কোনো অধ্যাপক বা কর্মচারীর স্বার্থ সব সময় এক হতে পারে না। সেক্ষেত্রে উপাচার্যকে শক্ত হতেই হয়। তবে কোনো কোনো ব্যাপারে মতভেদ যে হত না তা নয়। দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমি আসবার পূর্বে যখন অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য উপাচার্য ছিলেন তখন দুটি বাড়ি তৈরির কথা হয়েছিল। আমি গিয়ে দেখলাম বিজ্ঞানভবন তৈরি হয়ে গিয়েছে। দেখলাম আগেকার কলাভবনের বাড়ি সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত হয়েছে। পরে সেখানে দোতলায় একটি নতুন ছবির গ্যালারি করতে পেরেছিলাম। ঠিক হয়েছিল এই গ্যালারিতে রবীন্দ্রনাথ , অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর ছবি রাখা হবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নতুন অংশের শিলান্যাস করেছিলেন। আমি চলে আসবার সময় তার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আশা করি এখন এর সদ্ব্যবহার হচ্ছে। বিদ্যাভবনের (ফ্যাকাল্টি অব আর্টস) নিজস্ব কোনো নতুন বাড়ি হয়নি। বিদ্যাভবনের পুরনো বাড়িতেও যথেষ্ট জায়গা ছিল না। কোনো কোনো ক্লাস প্রাচীন শান্তিনিকেতন বাড়িতে হত। আমি নিজেও সেখানে কিছুদিন ক্লাস নিয়েছি। কালিদাসবাবুর সময় আর একটি বাড়ির প্ল্যান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছ থেকে অনুমোদন করে নিয়ে আসা হয়েছিল। মেলার মাঠের কাছে সদর দপ্তর থেকে বেশি দূরে নয়। এই বাড়ির প্ল্যান আমার খুব পছন্দ হয়নি, মনে হয়েছিল এই প্ল্যানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য বাড়িগুলি খাপ খাবে না। আরও অনেক বাড়ি, যেমন গ্রন্থাগার এবং বিজ্ঞানভবন সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না। আমার আগের উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জানিয়েছিল, হয় এই প্ল্যান অথবা বিজ্ঞানভবনের প্ল্যান, এই দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে। প্ল্যানটি আমার ভাল লাগেনি এই কারণে যে, ঘরগুলি খুব ছোট। কোনো কোনো ঘরে আট-দশ জনের বেশি বসবার উপায় ছিল না। কলাভবনের তখনকার অধ্যক্ষ শ্রীদিনকর কৌশিকের সঙ্গে বসে দু'একটি ঘরের আয়তন অল্প বাড়াতে পেরেছিলাম। কিন্তু সেও যথেষ্ট নয় বলে আমার মনে হত। সবাই জানেন একবার বাড়ির প্ল্যান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছ থেকে অনুমোদিত হয়ে এলে এবং টাকার সংস্থান হয়ে গেলে আর কোনো বিশেষ পরিবর্তন হয় না। বাড়িটি শেষ হয়েছে এবং ইতিহাস বিভাগ এবং অন্য কোনো কোনো বিভাগ সেখানে ক্লাস করছে। এই বাড়ি নিয়ে তখন সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। কোনো অধ্যাপক খবরের কাগজে চিঠি লিখে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, নতুন বাড়ি এত দূরে করা হচ্ছে যে, সেখানে গিয়ে ক্লাস করতে শিক্ষক এবং ছাত্রদের খুব অসুবিধা হবে। তাঁরা বলেছিলেন, 'মাইল্স্ ফ্রম নোহোয়্যার'। একথা ঠিক নয়। এই প্রতিবাদের রহস্য আমি কখনও বুঝতে পারিনি। ছেলেমেয়েদের হস্টেল থেকে এই বাড়ি দূরে

নয়। তাহলে কাদের অসুবিধা? অধ্যাপকদের? তাঁরা তো অনেকেই অ্যান্ড্রুজপল্লী থেকে বিদ্যাভবনে কিংবা পাঠভবনে ক্লাস নিতে আসেন। তাঁরা তো সেখানে আসতে কখনও প্রতিবাদ করেননি। বিশ্বভারতীর অধ্যাপকরা প্রায় সবাই নিয়মিত সাইকেল ব্যবহার করেন। সে সব কথা এখানে তুলতে চাই না। এই বাড়িতে প্রথমে ইতিহাস বিভাগের ক্লাস আরম্ভ হয়েছিল। তারপরে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বিভাগ ও ভূগোল বিভাগও স্থান অধিকার করেছে।

বাড়িটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের সময় অধ্যাপকদের এক ভাগ উপস্থিত ছিলেন না। সুনীতিবাবু একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সেটি নবগৃহে ঢুকবার পথে দেয়ালে উৎকীর্ণ করে রাখা হয়। আমার সময় একাজ করা সম্ভব হয়নি। শ্লোকটি উপাচার্যের দপ্তরে আলমারির মধ্যে রাখা হয়েছিল। বোধহয় সেখানে খুঁজলে পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রভবনকে ভাল করে গুছিয়ে তুলতে এবং সেখানে একটি গবেষণামন্দির গড়ে তুলবার সময় যথেষ্ট বাধা এসেছিল। তাহলেও বিশ্বভারতীর আর কোনো কাজ করে এত আনন্দ পাইনি। রবীন্দ্রভবনের অস্তিত্ব আগেও ছিল। রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন উত্তরায়ণে বসতেন এবং ছাত্রদের গবেষণার কাজে সাহায্য করতেন। একথা বললে ভুল হবে না যে, তখন ভবনের সংগ্রহ অনেক অল্প ছিল এবং গবেষণার এত সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। ১৯৭১ সালে অশান্ত পরিস্থিতির জন্য রবীন্দ্রভবন কিছুকাল, আন্দাজ এক বছর, বন্ধ করে রাখা হয়। পরে যখন রবীন্দ্রভবনের দরজা উন্মোচিত হল তখন ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন করা হয়েছে। রথীন্দ্রনাথের উইল নিয়ে কয়েক বছর কলকাতা হাইকোর্টে যে মামলা চলেছিল তার মিটমাট হয়ে গেল। আদালতের নির্দেশে উপাচার্য রবীন্দ্রভবনের ট্রাস্টি নিযুক্ত হন। তাঁকে হাইকোর্টের কতকগুলি নির্দেশ মেনে চলতে হত। এক বছর পরে তিনি হাইকোর্টের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করবেন, এই রকম ঠিক হয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীর উইল অনুসারে কতকগুলি নির্দেশ পালন করতে হত। এক বছরের মধ্যে উইলের যে শর্তগুলি আমাব পালন করবার কথা ছিল তা করা হল। অনেকেই জানেন যে, রবীন্দ্রভবন গঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বই বিক্রির টাকায়। অবশ্য পূর্বে যে সব গ্রন্থস্বত্ব তিনি বিশ্বভারতীকে দান করেছিলেন সেগুলি ছাড়া। রবীন্দ্রভবন গড়তে আমি যে টাকা পেয়েছিলাম সে প্রকৃতপক্ষে রথীন্দ্রনাথের টাকা। সেও প্রধানত কবির বই বিক্রির টাকা থেকে। এই আয় থেকে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর উইল দুটির শর্তগুলি পালন করেও রবীন্দ্রভবনের প্রসারণ ও রবীন্দ্রভবনের অন্যান্য কাজ করা সম্ভব হয়েছিল। এখন রবীন্দ্রভবনে গবেষণা করবার জন্য ফেলোশিপের অর্থবরাদ্দ আছে। এই প্রসঙ্গে অশোক কুমার সরকারের বদান্যতা স্মরণ করা কর্তব্য। এখানে যে ফটোগ্রাফির বিভাগ, 'জেরক্স' ইত্যাদির ব্যবস্থা, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এবং রবীন্দ্রনাথের লেখা উপন্যাস ও ছোট গল্প নিয়ে যেসব সিনেমার ছবি তৈরি হয়েছে, তার অনেকগুলিই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। পুরনো শান্তিনিকেতন সম্বন্ধেও যে সব ছায়াছবি তৈরি হয়েছিল তাও সংগৃহীত

হয়েছে। এই বিভাগটি নতুন করে তৈরি হবার পর অনেক গবেষকের সাহায্য হয়েছে, এই কথা ভাবলে আনন্দ হয়।

রবীন্দ্রভবন যখন নতুন করে গড়বার কথা হচ্ছিল, তখন আমাদের কারুর কারুর মনে হয়েছিল যে, ট্রাস্টের কাজ ভাল করে চালাতে গেলে সাহায্য করবার জন্য একজন বিচক্ষণ লোক থাকা দরকার। তিনি ট্রাস্টের সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করবেন। এই পদের জন্য কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ করা হল। আরও দু'একটি নাম আমার কাছে প্রস্তাব করা হয়েছিল। কানাইলালবাবু একসময় বিশ্বভারতীর হিসাব বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। আমি তাঁকে দু'একবার দেখেছি কিন্তু পরিচয় ছিল একথা বলা বোধহয় ঠিক হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে বসবাস করছিলেন। পরে দেখলাম তাঁকে নির্বাচন করে ভুল করিনি।

আর একজন রবীন্দ্রভবনের কাজে আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন, তিনি ডঃ মানসী দাশগুপ্ত। শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্বে কলকাতার একটি বড় মহিলা কলেজে অধ্যক্ষা ছিলেন। তিনি যে পদে ছিলেন তাকে বলা হয় 'স্পেশাল অফিসার'। কী করে এই নতুন পদ সৃষ্টি হল তার একটি ছোট ইতিহাস আছে। শান্তিনিকেতনের অশান্ত পরিস্থিতি যখন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে, তখন কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন যে, এইবার রবীন্দ্রভবনের দরজা নতুন করে আবার খোলা দরকার। তখনও ট্রাস্টের সব টাকা আমার হাতে আসেনি। কাজেই ইতস্তত করছিলাম। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাজে দিল্লি গিয়েছিলাম। তখন শান্তিনিকেতনের ব্যাপার নিয়ে আচার্যার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আগেও রবীন্দ্রভবন সম্পর্কে একটু আলোচনা হয়েছিল। সেদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রবীন্দ্রভবনে পাণ্ডুলিপি চিত্রসংগ্রহ ইত্যাদির ভার কাকে কীভাবে দেওয়া যাবে আমি কিছু ভেবেছি কিনা। আমি বিব্রতভাবে বললাম যে আমার পক্ষে এ সব কাজ করবার জন্য বেশি টাকা দিয়ে কাউকে আসতে বলা সম্ভব নয়। সেইজন্য একজন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিয়োগ করা দরকার হবে মনে হচ্ছে। শ্রীমতী গান্ধী বললেন, 'এই ধরনের কাজ কোনো সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে দিয়ে আপনি করাতে পারবেন না। এই কাজ জানেন এমন যোগ্য লোক নেওয়া উচিত। টাকার কথা এখন ভাববার দরকার নেই।' পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দপ্তরে গিয়েছি। সেখানে অন্য কাজের মধ্যে আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করা হল, আমি রবীন্দ্রভবনের জন্য যোগ্য লোক নিতে চাই কি না, টাকার জন্য আমাকে চিন্তা করতে হবে না। এই পদে ডঃ মানসী দাশগুপ্ত এসেছিলেন। কাজে যোগ দেবার পূর্বে নির্বাচন কমিটি তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছিল। স্বীকার করতে হবে, আমার মনে দ্বিধা ছিল। তখন বিশ্বভারতীর যে রকম অবস্থা তাতে কোনো মহিলা এই কাজ করতে পারবেন কি না আমার সন্দেহ ছিল। আমার ভয় যে অমূলক কিছুদিন পরে বুঝতে পেরেছিলাম। ডঃ মানসী দাশগুপ্ত কাজে যোগ দিয়ে দৃঢ়হস্তে বল্গা ধারণ করেছিলেন। তাঁর এবং কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্য না পেলে রবীন্দ্রভবনের প্রসারণ এবং বর্তমান রূপ সম্ভব হত না।

উত্তরায়ণের সৌষ্ঠবরক্ষায় দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।

শ্রীনিকেতনের কথা এবার বলতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন তিনি এর কাছ থেকে অনেক আশা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স খুব বেশি হয়নি। বিশ্বভারতীর কাছাকাছি গ্রামগুলির কী উন্নতি করা যায়, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। যৌবনকালে যখন পূর্ববঙ্গে জমিদারি দেখতে বেরোতেন, তখনও এ বিষয়ে তাঁর মন আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু খুব বেশিদিন ধরে এক জায়গায় পরীক্ষা করার সুযোগ পাননি। মৃত্যুর প্রায় পনের বছর আগে এই কাজে হাত দিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনের কোনো কোনো ছাত্র ও অধ্যাপক আমার কাছে মাঝে মাঝে আক্ষেপ করেছেন যে, বিশ্বভারতীতে তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা হয়েছে। এই নালিশের মধ্যে কতটা সত্য তার বিচার এখানে করছি না। শরীরের এক অংশ যখন দুর্বলতা অনুভব করে, তখন তার একাধিক কারণ থাকতে পারে। একটি কারণ হতে পারে সেই অঙ্গকে যথেষ্ট চালনা না করা। বিশ্বভারতীতে কাজ করতে গিয়ে সেই কথা আমার অনেকবার মনে হয়েছে। শান্তিনিকেতনে তবু কিছু ভিড় থাকে, কিন্তু শ্রীনিকেতনের পরিবেশ, প্রথমে গিয়ে মনে হয়েছে, খুব শান্ত। হয়তো এই নির্জনতার ফলে নকশাল আন্দোলনের সময় শ্রীনিকেতন ভীতিজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুরুলের কুঠিবাড়ি কী করে বিশ্বভারতীর হাতে এল সেকথা অনেকে জানেন। বাড়িটি রবীন্দ্রনাথ একটি ঝোঁকের মাথায় কিনেছিলেন। পরে তাঁর মনে হয়েছে, কাজটি হয়তো একটু বেহিসাবি হল। বন্ধু অ্যান্ড্রুজ সাহেবকে চিঠি লিখে তাঁর এ বিষয়ে কী মনে হয় জানতে চেয়েছিলেন। অ্যান্ড্রুজ সাহেব তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'সেল্ ইট।' কবি সাধারণত অ্যান্ড্রুজ সাহেবের কথা শুনে চলতেন। এক্ষেত্রে তা করেননি। সুরুলের বাড়িটি পুরনো ধরনের, আয়তনে বেশ বড়। বাড়ির তেতলায় রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল বাস করেছিলেন। এখন গেলে মনে হবে তেতলা পর্যন্ত সিঁড়ির ধাপ অসমান, অনেক সেকেলে বাড়ির মতো এক ধাপ থেকে আর এক ধাপের উচ্চতা বেশি। আমাদের মতো লোকের উঠতে কষ্ট হয়। এই সুরুল গ্রামে তিনি তাঁর নিজের কল্পনার গ্রামের সঙ্গে, কৃষি যাদের উপজীবিকা সেই সব পরিবারের ছেলেদের উপযোগী একটি বিদ্যালয়, গ্রামের সব রকম সংস্কারের কাজ, তাঁতের কাজ, চামড়ার কাজ, গালার কাজ এই সব শিখিয়ে গ্রামের লোকেদের স্বনির্ভর করতে চেয়েছিলেন। এত রকম কাজের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের একা তা জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। এল্মহার্স্ট সাহেবের বদান্যতা ছাড়া এই কাজ সম্ভব হত না।

এক সময় অবশ্য শ্রীনিকেতনের হাতের কাজের যথেষ্ট সুনাম ছিল। যাঁদের এখন পরিণত বয়স তাঁদের মনে থাকতে পারে ধর্মতলা স্ট্রিটে শ্রীনিকেতনের একটি নিজস্ব দোকান ছিল। ছাত্রবয়সে আমাদের মধ্যে রসিকতা করে বলা হত, ধর্মতলা স্ট্রিটের দোকানেই হোক বা শ্রীনিকেতনেই হোক এক ডিজাইনের চারটি পর্দা কিংবা বিছানার ঢাকনি পাওয়া যায় না। আমি যখন বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দিলাম, তখন যত তাড়াতাড়ি পারি শ্রীনিকেতন দেখতে গিয়েছিলাম।

দেখে মনে হল এখনকার শ্রীনিকেতন কুড়ি বছর আগেকার শ্রীনিকেতনের বিবর্ণ ম্লান ছবি। কারুর কারুর মধ্যে দেখেছি কাজকর্মে বিশেষ অনীহা। তাঁতের ঘর প্রায় নিস্তব্ধ, ছাদ থেকে ঝুল। আমি তখনকার এক ভদ্রলোককে বলেছিলাম, নিস্তব্ধ তাঁতের ঘর দেখতে বড় খারাপ লাগে। একটা কিছু করলে হয়। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'ঢুকবার দরজা বন্ধ করে রেখে দেব, তাহলে কিছু চোখে পড়বে না।' আমি অন্য উত্তর পাব আশা করেছিলাম। অথচ শ্রীনিকেতনে যে যোগ্য লোকের অভাব ছিল তা নয়। ধুতি ও শাড়ি যেখানে বিক্রি হয় সেখানে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ লোক দেখেছি। গ্রামের মহিলাদের হাতের কাজ শেখাবার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে একজন মহিলা যেতেন বাটিক ও অন্যান্য কাজ শেখাবার জন্য। তাঁর নিপুণতা লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না। অথচ সব জড়িয়ে শ্রীনিকেতনকে তেমন ভাবে গড়া সম্ভব হয়নি। শিক্ষাসত্র নামে যে বিদ্যালয়টি এখানে আছে সেটি উন্নত করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। হয়তো সামান্য ফল হয়েছিল। শ্রীনিকেতনের একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে চারপাশের গ্রামের সংস্কার। সে-কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন অবশ্য আশেপাশের গ্রামে কিছু চিকিৎসাকেন্দ্র ছিল। তার খরচ চালাবার জন্য শ্রীনিকেতনে কলকাতা থেকে যাত্রা এনেছি। টিকিট করে দেখতে হত। এই টাকায় চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির উপকার হয়েছে।

গ্রামের কাজে শ্রীনিকেতনকে খুব উৎসাহিত করতে পেরেছিলাম তা নয়। তবে অন্য অল্প কিছু করা সম্ভব হয়েছে। কী করে হল বলছি। এক সময় কলকাতায় ব্যারিস্টার স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ সেনকে অনেকে চিনতেন। তাঁর লেখা লজিকের বই ছেলেবেলায় আমরা পড়েছি। তিনি তাঁর নিজের সঞ্চিত কিছু টাকা দিয়ে একটি ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন। দু'জন ট্রাস্টি আগেই গত হয়েছিলেন। একমাত্র ট্রাস্টি তখন জীবিত ছিলেন অধ্যাপক ভূপতিমোহন সেন। অঙ্কশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি কয়েক বছর প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আমরা তাঁকে শিক্ষক হিসাবে দেখেছি। তাঁর চিঠি পেয়ে আলিপুরের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। অনেক দিন পরে দেখা হল। তিনি তখন খুব অসুস্থ, আমাকে জানালেন যে, ট্রাস্টের টাকা তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্যের হাতে দিতে চান। উপাচার্য তাঁর যেভাবে ইচ্ছা সে টাকা খরচ করতে পারেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, টাকা কীভাবে ব্যয় করা হবে এ বিষয়ে আমাকে কোনো উপদেশ দেবেন কিনা। তিনি বললেন যে, তাঁর কিছু বলবার নেই, কোনো শর্ত থাকবে না। আমি বললাম, 'তবু, আপনার তো একটা ইচ্ছা আছে, সেটি আমাকে বলুন।' তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন 'তোমার যা ইচ্ছা করো। তবে আমার কথা যদি শোনো তবে লেখাপড়ার কাজে এ টাকা খরচ কোরো না।' আমি বললাম, 'সে কী স্যার, আপনি শেষে একথা বললেন!' তিনি একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কেন বলব না? দেখছ না লেখাপড়া শিখতে গিয়ে ছেলেরা কি রকম বাঁদর তৈরি হচ্ছে।' এইখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, আমার তখনও পর্যন্ত ইচ্ছা ছিল এই টাকা দিয়ে পাঠভবনের কিছু করলে ভাল হয়। আমি পাঠভবনের জন্য আলাদা

একটি গ্রন্থাগার তৈরি করেছিলাম। ভেবেছিলাম এই টাকার সুদ থেকে পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রের ছেলেমেয়েদের বই কেনবার ব্যবস্থা করব।

ট্রাস্টের টাকা অন্য কাজে খরচ করেছিলাম। শান্তিনিকেতন থেকে মাইল চারেক দূরে একটি ছোট গ্রাম আছে, নূরপুর। দেশ ভাগ হবার পর এখানে পূর্ববঙ্গের লোকেদের একটি কলোনি গড়ে উঠেছিল। সুধীরঞ্জন দাশ প্রথমে এই গ্রামের কাজে হাত দেন। শ্রীনিকেতন থেকে গ্রামের লোকেদের ব্যাগ বোনানো শেখানো হয়েছিল। গ্রামের সকলেরই জীবিকা ছিল ব্যাগ বোনা। বিক্রি করবার অসুবিধা ছিল না। ব্যবসায়ীরা এসে কিনে নিয়ে যেত। গ্রামের লোকেরা অন্য সব গ্রামে যে রকম হয় সেই রকমই। তারা একটি ছোট প্রাইমারি স্কুল খুলেছিল। লোকেদের অবস্থা খুব একটা সচ্ছল ছিল না। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ মহাজন ছিল শুনেছি। তারা গ্রামের দুঃস্থ লোকেদের বেশি সুদে টাকা ধার দিত। ব্যাগের চাহিদা এক সময় কমে যেতে পারে, সেজন্য শ্রীনিকেতনের সাহায্যে সতরঞ্চি বোনা শেখানোর কাজ আরম্ভ হয়েছিল। আশা করেছিলাম যে, এই কাজ আরম্ভ করলে গ্রামের অবস্থার উন্নতি হতে পারে। উন্নতি হয়েছে কিনা জানি না। নূরপুরের অসুবিধা ছিল জলকষ্ট। কয়েক বছর আগে সরকার থেকে একটি ইঁদারা করে দেওয়া হয়েছিল। তখন দেখেছিলাম সেই ইঁদারাটি কাত হয়ে পড়েছে। বোধহয় ঠিকাদারের কাজ তদারকি করবার লোক ছিল না। আই· বি· সেন ট্রাস্টের কল্যাণে একটি নতুন ইঁদারা তৈরি করা সম্ভব হল। আই· বি· সেন ট্রাস্টের টাকা অন্য কাজেও আমার সহায় হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের কয়েক মাইল দূরে উত্তরে পারুলডাঙা গ্রাম। গ্রামটি বেশ বড়। একটি স্কুল আছে, তার হলদে রঙের বড় বাড়ি শান্তিনিকেতন থেকে দেখা যায়। পারুলডাঙা পর্যন্ত গাড়ি চলে, তারপর খানিকটা হেঁটে সীতাপুর গ্রামে পৌঁছতে হয়। সেখানে যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম তা আমার চিরকাল মনে থাকবে। গ্রামের যখন কাছে এসেছি তখন দেখলাম গ্রাম থেকে পিল পিল করে লোক বেরিয়ে আসছে। প্রায় প্রত্যেকের হাতে কোনো না কোনো বাদ্যযন্ত্র। সেইসব বাদ্যযন্ত্র আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য তারস্বরে ধ্বনিত হচ্ছে। তখন বুঝিনি যে, গ্রামটি গুপি গায়েন ও বাঘা বায়েনের গ্রাম। অর্থাৎ বাজনাই এদের জীবিকা। আমি এরকম গ্রাম আর কখনও দেখিনি। গ্রামে জলকষ্ট। পাশের গ্রামে একটি টিউবওয়েল আছে, এদের কিছুই নেই। এতে তাদের সম্মানেও আঘাত পড়েছে। গ্রামবাসীরা, তাদের মধ্যে কয়েকজন খুব বৃদ্ধ ছিলেন, আবেদন করলেন যে, তাদেরও একটি টিউবওয়েল করে দেওয়া হোক। গ্রামে টিউবওয়েল বসানো সম্বন্ধে আমার একটু অনীহা আছে। তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। তাছাড়া জনরব এই যে, অনেক সময় ঠিকাদাররা টিউবওয়েলের অংশবিশেষ অন্যত্র বেচে দেন। তখনও আই· বি· সেন ট্রাস্টের টাকা আমার হাতে আসেনি। তাহলেও যিনি গ্রামবৃদ্ধ, আমি তাঁকে বললাম, তাড়াতাড়ি পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেব। তাড়াতাড়িও হয়েছিল। কিন্তু যখন ইঁদারা আরম্ভ করা হল তখন তিনি বেঁচে নেই। তাঁর ছেলে ছিলেন, তাঁরও অনেক বয়স হয়েছে। তিনি অবশ্য ইঁদারা দেখেছেন। নূরপুর গ্রামে আমি কয়েকবার গিয়েছি কিন্তু এখানে আর যাওয়া

হয়নি।

আর একটি গ্রামের কথা বলি, এর নাম পারুই। এটি কিছু দূরে, সিউড়ির রাস্তায় অনেকটা গিয়ে বাঁ দিকে যেতে হয়। সে রাস্তায় গাড়ি চলে না। চলবার মতো রাস্তা নেই। বড় বড় পাথর, বালি এবং ছোট ঝোপ। হেঁটে যাবার পক্ষে দূরত্ব বেশি। কাজেই বাকি পথ জিপে যেতে হয়। গ্রামটির কথা অনেক কারণে মনে থাকবে। এখানেও কয়েকবার এসেছি। গ্রামটিতে একটি স্কুল আছে এবং একটি ছোট কালীমন্দির। এই গ্রামে এসে আমার সব সময় ভাল লেগেছে। আশ্চর্য মনে হয়েছে এইজন্য যে, এই গ্রামের লোকেরা কখনও আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে নি। এদের স্কুলবাড়ি যেখানে, সেটা গ্রাম থেকে উঁচু জায়গায়। যখন ক্লাস বসে তখন অনেকটা নিচু জায়গা থেকে কলসি করে জল বয়ে আনতে হয়। বিশ্বভারতী থেকে গ্রামের জন্য সামান্য কিছু করা যেতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করেছি, যেমন, একটি ইঁদারা কি আর কিছু ? তাঁরা কিন্তু রাজি হননি। স্কুলের জলের কথা বলেছিলাম। তাঁরা বললেন, 'খুব তো কষ্ট হচ্ছে না। যখন স্কুল বসে আমরা নিজেরাই কয়েক কলসি জল উপরে নিয়ে যাই।' শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসবার আগে এই গ্রামে আবার এসেছিলাম। দেখলাম গ্রামবাসীরা আমার বিদায় সংবর্ধনার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সভা শেষ হবার সময় তাঁরা আমাকে দুটি উপহার দিয়েছিলেন, একখণ্ড জগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত গীতা ও একটি লাঠি। গ্রামের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, 'আপনি তো এখন অবসর নিচ্ছেন, গীতা আপনার অবসর সময়ে পড়বার জন্য, এবং শরীরের বল কমে আসছে বলে লাঠিটিও কাজে লাগবে।' শরীরে শক্তি কমে আসছে, কিন্তু এখনও কাজ থেকে অবসর নেবার সময় পাইনি।

কাহিনী শেষ হয়ে আসছে। দাঁড়ি টানবার আগে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব। বিষয়টি রুচিকর নয়, তাহলেও বলা উচিত। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে সবসময় বন্ধুত্ব থাকে না। কেউ কারুকে কেন পছন্দ করেন কিংবা করেন না, তারও কোনো কারণ নির্দেশ করা কঠিন। ঘটনাটির সূত্রপাত বিজ্ঞানভবনে। পরে অন্য জায়গায়ও ছড়িয়ে পড়েছিল। উপাচার্যদের সকলেই কোনো না কোনো সময় ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। ছাত্র এবং শিক্ষকদের মতের সঙ্গে না মিললে তিনি যদি তাঁর বিশ্বাসে দৃঢ় থাকেন তাহলে তাঁর কখনও কখনও নানারকম ব্যক্তিগত অসুবিধা ঘটতে পারে। আর যদি মত না মিললেও ছাত্র এবং শিক্ষকদের সব আবদার নির্বিচারে মেনে নেওয়া যায়, তার ফল কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা গিয়েছে। অসন্তোষ নানা কারণে হতে পারে। যেমন, পরীক্ষার তারিখ, ছাত্রদের হস্টেলের খাবারের মান, ঠিক সময়ে প্রাপ্য টাকা দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আপত্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পুলিশের প্রবেশ, অথবা দু'এক জায়গায় দেখেছি শুধু অশান্তি করার জন্য অশান্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা অনেক সময় লক্ষ্য করেছেন যে, ছাত্রদের ইচ্ছা বলে যা চালানো হয়, সবসময় তা বেশি সংখ্যক ছাত্রের ইচ্ছা নয়, তার পিছনে কিছু কিছু বাইরের লোকের উস্কানি থাকে। বিজ্ঞানভবনের ব্যাপারটি ঠিক এই ধরনের মোড় নেবে, আগে থেকে তা বোঝা যায়নি। একজন অধ্যাপক

আমাকে বললেন তাঁর বিভাগে একজন শিক্ষকের মাথার গোলমাল হয়েছে। তিনি বাসের সামনে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। সাক্ষীসাবুদ আনা হল, তাতে ব্যাপারটা কী হয়েছিল পরিষ্কার বোঝা গেল না। এর কয়েকদিন পরে 'মাথা খারাপ' শিক্ষক বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। একা নন, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ছিলেন। ভদ্রলোকের হাতে একটি বাংলা উপন্যাস। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হল। ইচ্ছা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তুলতে দিইনি। একটা কথা আমার প্রথম থেকে মনে হচ্ছিল যে, ইনি সাপের বিষ নিয়ে গবেষণা করতেন। মাথা প্রকৃতপক্ষে খারাপ হলে তার ফল মর্মান্তিক হতে পারত। শান্তিনিকেতনে থাকতে প্রায়ই শুনতাম অমুকের সঙ্গে অমুকের 'ভুল বোঝাবুঝি' হয়েছে। আমি ভাবলাম এও বোধহয় সেইরকম ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারটি অনেকদূর গড়াল। বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিতে লাগল। তাদের মধ্যে একাধিক দল। যখন মনে হল দু'একদিনের মধ্যে একটা বড় রকমের গণ্ডগোল বাধতে পারে তখন সেই বিভাগের প্রধানকে ডেকে পাঠালাম। ইচ্ছা করেই আমার আপিসে ডাকিনি। বিদ্যাভবনের একটি ঘরে তাঁকে আসতে বলা হল। আমার সঙ্গে দু'তিনজন অধ্যাপক ছিলেন। তখনও পর্যন্ত আশা করেছিলাম একটা মিটমাট সম্ভব হবে। অধ্যাপকমশায় এলেন না। একজন অধ্যাপক আমাদের দূত হয়ে তাঁর বাড়িতে গেলেন। এসে বললেন, সে-বাড়িতে অনেক জনসমাগম হয়েছে। দ্বিতীয়বারও দূত গিয়ে ফিরে এল। এর দু'একদিন আগে এই অধ্যাপকটি বিকালে হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত। এসে বললেন, তাঁর বাড়ি ফিরতে ভয় হচ্ছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আপিসের সামনে ছেলেরা ঘোরাফেরা করছে। কুবের সিং তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এল।

বোধহয় তার পরের দিন অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং। সেখানে খবর পেলাম যে, একশ্রেণীর ছাত্রদের দাবি না মানলে আমাকে বাড়ি ফিরতে দেওয়া হবে না, আমি ঘেরাও হব। দাবি হচ্ছে, সেই বিভাগের প্রধানকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে। সকলেই জানেন সরকারি চাকরি থেকে কাউকে বরখাস্ত করা প্রায় অসম্ভব। আর একটি দলের ইচ্ছা যে, ওঁকে রাখতেই হবে। আরও ছেলেরা ছিল, যারা কী করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছিল না। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মিটিংয়ের পর আমি আমার আপিসের ঘরে চলে গেলাম। আমাকে বলা হল আমি ঘেরাও হয়েছি। আমি ঘরে বসে কাজ করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ছাত্ররা বাইরে বসে। আমার ঘরে মাস্টারমশায়রা নানা কাজে আসতে লাগলেন, কখনও খোঁজ নিতে। তাঁরা কোনো বাধা পাননি। কিছুক্ষণ পরে ছেলেরা কয়েকজন এল আমার খাবার তাদের হস্টেল থেকে পাঠিয়ে দেবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে। আমি বললাম, তার দরকার হবে না। আমার খাবার আমি বাড়ি থেকে আনিয়ে নেব। খাবার ব্যবস্থা না হয় হল, কিন্তু স্নানের কী হবে? বুঝতে পেরেছিলাম যে এ ঘেরাও এক রাত্রে মিটবে না। এক রাত্রের ঘেরাও আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। স্নানের অসুবিধা যাতে না হয়, তার জন্য পরদিন সকালে এঞ্জিনিয়ারকে ডেকে পাঠালাম। আমার ঘরের পাশে একটি খুব ছোট ঘর ছিল। সেখানে পুরনো কাগজ গাদা করে রাখা হত। লক্ষ্য করেছিলাম সে

ঘরে একটি নর্দমা আছে। এঞ্জিনিয়ার এসে জলের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন। সেই বাথরুম কয়েকদিন ব্যবহার করেছিলাম। আশা করি আমার পরে যাঁরা এসেছেন তাঁরা উপকৃত হয়েছেন।

পরদিন খবরের কাগজে ঘেরাওয়ের কথা বেরিয়ে গেল। আমি কিছুক্ষণ আপিসের কাজ করতাম। বাড়ি থেকে দু'বেলা খাবার আসত। একটি ছোট সুটকেসে কাপড়চোপড় আনিয়ে নিয়েছিলাম। কাজেই খুব খারাপ ছিলাম না। প্রথম দিনই সন্ধ্যার সময় খবর পাওয়া গিয়েছিল, ঘেরাও হবার পর বারান্দায় দুটি গোলাকার সন্দেহজনক জিনিস পাওয়া গিয়েছে। সে দুটি তৎক্ষণাৎ জলের বালতিতে রেখে দেওয়া হল, পরে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাগজে ঘেরাও হবার খবর বেরোবার পর কলকাতার 'যুগান্তর'-এ খবর বেরোল যে, উপাচার্য অসুস্থ বোধ করছেন এবং তাঁর পা ফুলে গিয়েছে। খবরটি সত্য নয়, কিন্তু এর ফলে বাইরে থেকে নানারকম টেলিফোন আসতে লাগল। বোধহয় আমাদের রেক্টর, গভর্নর ডায়াস সাহেব নিজে খোঁজখবর করেছিলেন। তার ফলে বহু রাজপুরুষ সিউড়ি এবং কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দু'একজন বললেন, এই কটা ছেলের জন্য আপনি ঘরে বসে আছেন, আমি বারান্দা পরিষ্কার করে দিচ্ছি, আপনি বাড়ি চলে যান।' তাঁদের সাহায্য ছাড়াই আমি হয়তো বাড়ি চলে যেতে পারতাম, কিন্তু তাহলে জিনিসটা অন্যরকম হয়ে দাঁড়াত। এদিকে যথারীতি ক্লাস হতে লাগল। ছেলেদের একটি অভিনয় হবার কথা ছিল, সেটিও শুনলাম হয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই চাপা উত্তেজনা। প্রথম দিন সন্ধ্যার পরে যখন এই খবর জানাজানি হয়ে গেল, অমিতাভ চৌধুরী তখন কোনো সভা উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তিনি দেখলেন বিশ্বভারতীর তখনকার রেজিস্ট্রার সান্ধ্যভ্রমণে বেরোচ্ছেন। অমিতাভবাবু আমাকে বলেছেন, এই দৃশ্য দেখে তাঁর ক্রোধ উপস্থিত হল এবং রেজিস্ট্রারের এক্ষেত্রে কী করা কর্তব্য উপদেশ দিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা কী রকম, সরকারি মহল থেকে সে সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয় হচ্ছিল। অমিতাভবাবু রেজিস্ট্রারের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। আমি বেশি আশ্চর্য হয়েছিলাম হাসপাতালের সি· এম· ও-র আচরণ দেখে। সেখান থেকে কোনো খোঁজখবর করা দরকার বলে তাঁরা মনে করেননি। আমি তাঁকে টেলিফোন করে বললাম, 'দিল্লি এবং কলকাতার কেউ কেউ জানতে চাইছেন আমার স্বাস্থ্য কী রকম। আবার খোঁজ করলে আমাকে বলতে হবে কোনো ডাক্তার আমাকে দেখেননি।' পরদিন সকালে। সি· এম· ও·, একজন নার্স এবং আর একজন ওষুধপত্র নিয়ে আমার ঘরে এলেন। সি· এম· ও· ব্লাড প্রেসার ইত্যাদি পরীক্ষা করলেন। পাস করে গেলাম। তৃতীয়দিন আমাকে রাজপুরুষরা বারে বারে বলতে লাগলেন, 'আপনি বাড়ি চলে যান, আমরা শান্তিরক্ষার ভার নেব।' ইতিমধ্যে একজন রাজপুরুষ, তিনি পুলিশ নন, আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে, সরকারি আদেশে অনেক প্রশাসক শান্তিনিকেতনে এসে জড়ো হয়েছেন। কয়েকদিন হয়ে গেল এখনও যদি কিছু না করা যায় তাহলে কী কৈফিয়ত দেবেন। যে সব ছেলে উৎসাহ করে এরকম কাণ্ড ঘটাতে চেয়েছিল, তারা সমস্ত ঘটনা যে এরকম মোড়

নেবে বুঝতে পারেনি। অবশ্য আমরা কেউই পারিনি। প্রশাসকদের মধ্যে একজন আমাকে বললেন, ছেলেদের একজন কর্মকর্তা তাঁকে অনুরোধ করেছেন যে, এমন একটা ফরমুলা ভাবা উচিত যা উপাচার্য এবং ছাত্ররা দু'পক্ষই গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ সাপ মরবে কিন্তু লাঠি অক্ষত থাকবে। দরকার হলে ভোরবেলায় আমি বাড়ি চলে যেতে পারি, ছেলেরা কিছু বলবে না। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'ছেলেরা দপ্তর থেকে চলে গেলেই আমি যাব। তার আগে আমার মনে হচ্ছে আমার এখানেই থাকা উচিত হবে।' পরে দু'পক্ষের কিছু কথাবার্তা হয়েছিল কিনা আমি জানি না। বোধহয় চতুর্থ দিন সকালে উঠে দেখলাম ছেলেরা কোথাও কেউ নেই। কখনও যে অশান্তি হয়েছিল, সেকথা বোঝাই যাচ্ছে না। আমি বাড়ি চলে এলাম। এবং সেদিন দুপুরে কলকাতা রওনা হলাম। আগে ঠিক ছিল যে, কলকাতায় কর্মসমিতির জরুরি বৈঠক বসবে। সরকারি খবর কী ছিল জানি না। আমার গাড়ির সঙ্গে দুটো পুলিশের জিপ আমাকে পাহারা দিতে দিতে বীরভূমের সীমা পর্যন্ত এল। একটি জিপ সেখান থেকে বোলপুর ফিরে গেল। অন্যটি কলকাতায় আমার বাড়ি পর্যন্ত এল। তাদের নাকি হুকুম ছিল বাড়ির সামনে থাকবে। কলকাতায় যখন পৌঁছলাম, বিকাল হয়ে গিয়েছে। লালবাজারের সঙ্গে কথা বলে সশস্ত্র পুলিশসহ জিপটিকে লালবাজারে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কয়েকদিন পরে কর্মসমিতির জরুরি বৈঠক বসল। সভার জন্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস তাদের দোতলার একটি ঘর ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। অশান্তির চেষ্টা যে হয়নি, তা নয়। বোলপুর থেকে অনেক ছাত্র কিংবা ছাত্র নয় এইরকম যুবক আগে থেকে অ্যাকাডেমির বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিল। অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ জন হবে। ইতিমধ্যে এই খবর কলকাতার সব সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল এবং একদল পুলিশ এবং পুলিশের কয়েকজন বড় কর্মচারী নীচে পাহারা দিচ্ছিলেন। যে বিভাগীয় প্রধানকে নিয়ে গোলমাল, তিনি লিখে দিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় বিভাগীয় প্রধানের কাজে অবসর নিচ্ছেন, কিন্তু অধ্যাপক হিসাবে থাকবেন। কর্মসমিতি তখন মনে করেছিল এই ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকার হবে।

ঘেরাওয়ের ব্যাপারটা একটু বেশি করে বলা হল। তার কারণ আছে। এত পুলিশ এবং প্রশাসকের সাহায্য সত্ত্বেও আমি যে ঘরের মধ্যে কয়েকদিন বসে ছিলাম, এইজন্য কলকাতায় রাজ্যপাল ডায়াস সাহেব আমাকে পরিহাসমিশ্রিত ভর্ৎসনা করেছিলেন। তখনও পর্যন্ত বোধহয় এতদিন পর্যন্ত ঘেরাও হয়ে থাকার আর কোনো রেকর্ড ছিল না। পরে কলকাতার একটি ডাক্তারি কলেজের একটি ঘটনা আমার রেকর্ডকে ভেঙে ফেলে। ঘেরাওয়ের সময় কয়েকটি জিনিস চোখে পড়েছিল। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা নিশ্চয় ছিল, কিন্তু স্বাভাবিক কাজকর্ম, যেমন, আপিসের কাজ, ক্লাস, ছাত্রদের অভিনয় ইত্যাদি বন্ধ হয়নি। ছেলেদের মধ্যে একাধিক ভাগ লক্ষ্য করেছি। যারা ঘেরাওয়ের ব্যাপারে প্রথমে উৎসাহী ছিল, তাদের মনের মধ্যে বোধহয় যথেষ্ট জোর ছিল না। রাত্রে একটি জানালার ধারে আমি শুয়ে থাকতাম। ছেলেদের একজন দলপতি আমাকে দ্বিতীয় দিনে এসে

বলল, নানারকম লোক চারদিকে আনাগোনা করছে। জানালার কাছে না শোয়াই ভাল। এই বলে আমার কৌচটি সেখান থেকে সরিয়ে দেয়ালের দিকে রেখে দিল। আমার ঘরে রাত্রে দু'একজন মাস্টারমশায় শুয়ে থাকতেন। আমরা অনেকবার একসঙ্গে চা খেতাম। একজন ছাত্র বলল, অমুক মাস্টারমশায়কে আপনার ঘরে থাকতে দেবেন না। ওঁরও মনে কী আছে বলা যায় না। যতদূর বুঝতে পেরেছি, তাঁর মনে সেরকম কিছু ছিল না। যে কয়েকদিন আটক ছিলাম, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার একান্তসচিব শম্ভু মজুমদার উপস্থিত থাকতেন এবং সন্ধ্যার পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত আমার আপিসের সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় পাহারা দিতেন। আপিসের পিওন অসিত দিনে এবং রাত্রে বাড়ি যায়নি, সবাইকে চা করে খাইয়েছে। সে বোধহয় তিন রাত্রি একেবারে ঘুমোয়নি।

১৯৭৫ সালে আগস্ট মাসে আমার কার্যকাল শেষ হয়ে এল। আমার পরে যাঁর আসবার কথা, তিনি সেপ্টেম্বর মাসের আগে আসতে পারবেন না জানিয়েছেন। কাজেই আমাকে আরও একমাস বেশি থাকতে হয়েছিল। চলে আসবার আগে এমন একটি ঘটনা ঘটল, যা ভোলা কঠিন। অনেকেই জানেন স্কুলের ছাত্রদের মাঝে মাঝে আশ্রমের চারদিকে বেড়াতে নিয়ে যাবার রীতি আছে। এজন্য উপাচার্য কিংবা আর কারুকে জানানোর দরকার হয় না। আগস্ট মাসে একদিন বিকালে আপিসে বসে আছি, কাজ তখনও শেষ হয়নি। এক ভদ্রলোক এসে বসে ছিলেন। তাঁর কাজ হয়ে যাবার পর তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি কি শুনেছেন পাঠভবনের একটি ছোট ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' আমার খুব আশ্চর্য লাগল। অসংখ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে আমাকে টেলিফোন করা হয়, অথচ এ-বিষয়ে আমাকে জানানো হল না। শোনা মাত্র আমি ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্টে চলে গেলাম। তখনও সন্ধ্যা হয়নি। ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্টে তখন মন্টু ঘোষ, পাঠভবনের শিক্ষক পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং বোধহয় অজিত মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। তাঁদের কাছে যে খবর পেলাম, তাতে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেল। সকালবেলা ছোট ছেলেদের ক্যানালের ধারে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সঙ্গে কয়েকজন মাস্টারমশায় ছিলেন। তারা ফিরে আসবার পর স্নানের সময় দেখা গেল সংখ্যায় একজন কম। যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ফেরেনি। তার নাম সম্রাট গুপ্ত। স্কুলের সব ছেলেমেয়ে চিনে রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু এই ছেলেটিকে আমি চিনতাম। তার কারণ প্রতি বুধবার মন্দিরে উপাসনার সময় সে আমার ঠিক সামনে বসত। আমাকে কয়েকজন বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, সে বোধহয় একটা বাসে উঠে কোথাও চলে গিয়েছে। আমার এই ব্যাখ্যা অবিশ্বাস্য বলে মনে হল। প্রথমত, বাসে চড়ে পালাতে পারে, একথা সম্রাট গুপ্তকে দিনের পর দিন দেখে মনে হয়নি। দ্বিতীয় কারণ শুনেছিলাম সম্রাট গুপ্তের জামা একজন শিক্ষক কিংবা শিক্ষয়িত্রীর হাতে ছিল। তাহলে ছেলেটি কি জামা খুলে রেখে খালি গায়ে বাসে উঠেছে! কয়েকটি ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। সব প্রশ্নই সম্রাট বাসে উঠেছিল কিনা সে প্রসঙ্গে। সবই হয়েছে, কিন্তু উপাচার্যকে খবর

দেওয়া দরকার মনে হয়নি। আর একটি জিনিস আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছিল যে, সে জলে ভেসে যেতে পারে, একথা কেউ ভাবতে চাইছে না। আমি যখন কথা তুললাম, তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ বলতে লাগলেন, এত রাত্রে খবর দিয়ে কী হবে ? তাহলেও আমি জোর করাতে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের এস· ডি· ও-কে খবর দেওয়া হল। তিনি বললেন চেষ্টা করে দেখবেন, তবে রাত্রে অসুবিধা হবে। অনেকক্ষণ ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের আপিসে বসে রইলাম। সেই রাত্রে কোনো খবর এল না। পরদিন সকালে যত তাড়াতাড়ি হয় আবার ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের আপিসে গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে খবর এল যে একটি ছেলের মৃতদেহ খালের জলে পাওয়া গিয়েছে, অনেক দূরে ভেসে গেছে। মৃতদেহটি শান্তিনিকেতনে পাঠানো হচ্ছে। আমি অল্প পরে হাসপাতালের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সম্রাট গুপ্তর বাবা বাইরে থাকতেন। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তখনও ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট কী খবর দিয়েছে জানতেন না। তিনি আমাকে বারে বারে বলতে লাগলেন, বিশ্বভারতী তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে আনবার সবরকম চেষ্টা করেছে। আর কোনো প্রতিষ্ঠান বোধহয় এর অর্ধেকও করত না। ইতিমধ্যে দেখলাম বড় রাস্তা থেকে একটা জিপ এছে হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে গেল। সম্রাটের বাবা হাসপাতালের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কাজেই তিনি কিছু দেখতে পাননি। সম্রাট গুপ্তর মৃত্যুর মতো করুণ ঘটনা বিশ্বভারতীতে কদাচিৎ ঘটেছে।

দিল্লি থেকে টেলিগ্রাম এল যে, বিশ্বভারতীর বাইরের কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তিকে দিয়ে সন্ধান করে দেখা হোক প্রকৃত ঘটনা কী হয়েছিল। তার পূর্বেই যাকে বলে জুডিসিয়াল এনকোয়ারি, তার ব্যবস্থা করেছিলাম। জেলাজজ শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক তখন সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। ভাল বিচারক বলে তাঁর সুনাম ছিল। তাঁকে অনুরোধ করা হল তিনি যেন শান্তিনিকেতনে এসে কিছুদিন থেকে ব্যাপারটি ভাল করে অনুসন্ধান করে একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক দুটি শর্তে রাজি হলেন। প্রথম শর্ত, তাঁর শান্তিনিকেতনে আসতে কিছুদিন দেরি হবে। দ্বিতীয় শর্ত, বিশ্বভারতীর কাছ থেকে এই কাজের জন্য তিনি কোনো অর্থ গ্রহণ করবেন না। বিশ্বভারতী কেবল তাঁর আসা-যাওয়া ও থাকবার ব্যবস্থা করবে। এই শর্তে বিশ্বভারতীরও আপত্তি করবার কোনো কারণ ছিল না। এর অল্পদিন পরেই আমি অবসর নিয়ে চলে এলাম। যখন তদন্ত হচ্ছিল, তখন আমি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছি। শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক যে রায় দিয়েছিলেন সেটি আমি দেখিনি। শুনেছি তিনি তিন-চার জনকে কমবেশি দোষী সাব্যস্ত করেছেন। বিশ্বভারতী এই ক'জনকে লঘু দণ্ড দিয়েছিল। কয়েক মাস যেতে না যেতেই কর্মসমিতি তাদের জন্য লঘুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করেছিল। সম্রাট গুপ্তর বাবা আদালতে গেলে কী হত বলা যায় না।

১৯৭৫ সালের জুন মাসে দিল্লিতে সংসদের সভা হয়। আচার্যা শ্রীমতী গান্ধী সভার কাজ পরিচালনা করেছিলেন। এই সভায় আমি আগস্ট মাসে অবসর নেব

সেই কথা জানিয়ে দেওয়া হয় এবং আমার পরবর্তী উপাচার্য হিসাবে ডঃ সুরজিৎ সিংহের নাম গ্রহণ করা হয়। সভা শেষ হয়ে যাবার পরে শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ট্যাণ্ডন আমাকে বললেন যে, প্রধানমন্ত্রী জানতে চান তাঁকে আমার কিছু বলবার আছে কিনা। আমি বললাম, 'কী বলব, এই তো দেখা হল।' ট্যাণ্ডন বুঝিয়ে বললেন, 'আপনার কি ভবিষ্যতের কোনো প্ল্যান আছে?' আমি বললাম, 'না, কিছু নেই।' তিনি বললেন, 'প্রধানমন্ত্রী বোধহয় সেই কথা জানতে চেয়েছেন।' আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল মুদ্রারাক্ষস নাটকের শেষ দৃশ্যে চাণক্য কাজ থেকে অবসর নেবার সময় বলেছিলেন যে, দু'একটি ছাত্র, পুঁথি এবং এক মরাই ধান, এই যথেষ্ট। আমি সেইরকম কথা বিষ্ণুনারায়ণ ট্যাণ্ডনকে বলেছিলাম।

ট্যাণ্ডন আবার প্রধানমন্ত্রীর ঘর থেকে ঘুরে এসে বললেন, 'আমি তো তাঁকে এই কথা বললাম। উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'ওন্‌লি দ্যাট মাচ!'

বলেছিলাম আগস্ট মাসে কলকাতা ফিরে যাব, কিন্তু তা হয়ে উঠল না। সুরজিৎ সিংহ জানালেন, তিনি একমাস দেরি করে কাজে যোগ দেবেন। কাজেই আরও একমাস আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হল। আসবার ঠিক আগে সুরজিৎবাবু এসে পৌঁচেছেন, কিন্তু তখনও কাজে যোগ দেননি, এমন সময় সিংহসদনে ছাত্র এবং শিক্ষকরা আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দেবার আয়োজন করেছেন। প্রথমে মনে হয়েছিল হয়তো এই সভায় আমি উপস্থিত থাকতে পারব না। কারণ আমার বাড়িতে সেই সময় দর্শন বিভাগের ছাত্ররা ধর্না দিয়েছিল। যারা এসেছিল তারা সবাই দর্শন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী কি না কিংবা অন্তরাল থেকে কেউ তাদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন কি না এ সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন না করাই ভাল। যাই হোক, একসময় মেঘ কেটে গেল। পরীক্ষা ঠিক সময়েই হয়েছিল। তবে বিকালে যখন সভায় গেলাম, তখন আমি ক্লান্ত, এবং সভাস্থল অলঙ্কৃত করবার মেজাজও আমার তখন ছিল না। একটি বিষয়ে মনে আছে যে, ওখানকার প্রবীণ অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাস সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দনের উত্তরে মৌখিক ভাষণ দিয়েছিলাম। আমার যতদূর মনে আছে, এই ধরনের কথা বলেছিলাম যে, বিশ্বভারতীতে নতুন কিছু করতে গেলেই শোনা যায় তালভঙ্গ হচ্ছে। অথচ যিনি এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কখনও এই আশ্রমকে শৃঙ্খলের বন্ধনে বেঁধে রাখতে চাননি। যখন দরকার হয়েছে, তখন অকুণ্ঠিতচিত্তে পরিবর্তন করেছেন। আমরা অনেক সময় তাঁর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। এই আশ্রমে যখন এসেছিলাম তখন অনুভব করেছিলাম নানা কারণে আশ্রমের আবহাওয়া বিক্ষুব্ধ। যে প্রদীপ আলো দেবে, সেই প্রদীপে কলঙ্করেখা পড়েছে। নতুন দীপ জ্বালব এ ক্ষমতার অভিমান আমার ছিল না। আমি সেই পুরনো প্রদীপটিকে মার্জনা করে পরিষ্কার রাখতে চেয়েছি। আমার পরে যিনি আসবেন তাঁর কাজ হবে সেই প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে বিপদ থেকে রক্ষা করে বাঁচিয়ে রাখা।

শান্তিনিকেতন থেকে আবার কলকাতা। এবার মনে হচ্ছিল কিছুদিন বিশ্রাম নেব। লেখাপড়া নয়, অন্য কাজও নয়। এই রকম সুখের স্বপ্ন যখন দেখছি তখন

১২৫ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এ· এল· ডায়াসের কাছ থেকে দেখা করবার আমন্ত্রণ পেলাম। ডায়াস সাহেবের সঙ্গে আমার পূর্বে অল্প পরিচয় ছিল বলেছি। পদাধিকার বলে বিশ্বভারতীর রেক্টর ছিলেন। আচার্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন সমাবর্তন উৎসবে শান্তিনিকেতনে আসতেন, তখন রাজ্যপালও উপস্থিত থাকতেন। আমাকে কেন ডেকেছেন ঠিক বুঝতে পারিনি। তখন কয়েকটি সরকারি কমিটি গড়া হচ্ছিল। আমার মনে হল বোধহয় সেইজন্য। দেখা করে বুঝতে পারলাম সরকারের উদ্দেশ্য অন্যরকম।

অনেকের মনে থাকতে পারে যে কিছুকাল থেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নানারকম অপ্রীতিকর খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল। সেগুলি উৎসাহ পাবার মতো নয়। ছাত্ররা উপাচার্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবার পথ অবরোধ করেছিল। দু'এক কথার পর ডায়াস সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আমি অবিলম্বে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করতে পারি কি না। এই প্রস্তাবের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। একটু ইতস্তত করে বললাম, আমার কিছুদিন বিশ্রামের দরকার ছিল। আগে ইচ্ছা ছিল মাসদুয়েক অন্তত বিশ্রাম করব। ডায়াস সাহেব শুনে বললেন, কতদিন বিশ্রাম করবেন ? বেশি দেরি করা উচিত হবে না। দু'মাসের কথা বলতে পারলাম না। বললাম, অন্তত দু'তিন সপ্তাহ। তিনি বললেন, আচ্ছা। এর পরে একটি ফাইল বার করে আমার বায়ো-ডাটা পড়তে লাগলেন। বুঝতে পারলাম আচার্য মন ঠিক করে ফেলেছেন।

পনের দিনও কাটল না। দিন দশেক পরে একদিন সকাল দশটা সাড়ে দশটার সময় শিক্ষাবিভাগের একজন ডেপুটি সেক্রেটারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী বাড়িতে এসে বললেন, আপনাকে এখনই কাজে যোগ দিতে হবে। তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রওনা হলাম। আমি যে রবীন্দ্রভারতীর ভার নেব, সে কথা তখনও খবরের কাগজে বের হয়নি। কিন্তু খবর যে একেবারে অজানা ছিল, তা মনে হয় না। গাড়ি থেকে নামতে না নামতে দু'জন যুবক ছুটে এসে আমার গলায় একটি মালা পরিয়ে দিলেন। তাঁরা ওখানে কাজ করেন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে উপাচার্যর ঘরে পৌঁছলাম। এই ঘর আমার বহুদিনের চেনা। একসময় বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের আপিস ছিল, অধ্যক্ষ এই ঘরে বসতেন। তখন এই দপ্তরে অনেকবার এসেছি।

বহুদিন ব্যবহার করা হয়নি। ঘরের মেঝেতে, টেবিলের উপরে, চেয়ারে ধুলোর আস্তরণ। সেইখানে কাগজপত্র সই করলাম। আর-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের জন্য প্রবেশ করলাম। বিশ্ববিদ্যালয় যে অসুস্থ সেকথা বুঝতে কারুর দেরি হবার কথা নয়। অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মী সবাই বিভিন্ন কারণে বিক্ষুব্ধ। নতুন উপাচার্য হয়ে যিনি আসবেন তাঁর পক্ষে এ অবস্থা সুখের নয়। গ্রন্থাগারের অবস্থা সম্বন্ধে ভাল কিছু বলা কঠিন। দেখলাম কয়েক বছর আগে এক ভদ্রমহিলার কাছ থেকে তাঁর স্বামীর গ্রন্থসংগ্রহ থেকে অনেক বই নেওয়া হয়েছে কিন্তু দাম দেবার কথা চিন্তা করা হয়নি, টাকা বাকি পড়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি গাড়ি, সেগুলি কারা কলকাতার বাইরে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। গাড়ি

উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু তার সংস্কার দরকার। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির যে প্রাঙ্গণে পারিবারিক উপাসনা হত, সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের খেলবার জায়গা। জোড়াসাঁকোর বাড়ির পিছন দিকের অংশ রামভবন। এখানে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আসতেন বলে মনে হয় না। রামভবনের মতো নোংরা ও পঙ্কিল পরিবেশ এপাড়াতেও বোধহয় পাওয়া কঠিন। ছেলেদের ক্যান্টিন বলে একটি খাবার জায়গা আছে। তার সম্বন্ধে যত কম বলা যায় তত ভাল। আমি কাজে হাত দেবার বছরখানেক আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্যরা এসে এই অবস্থা দেখে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। এই বাড়ির যে এই অবস্থা হবে একথা দ্বারকানাথ ঠাকুর কখনও কল্পনা করতে পারেননি। জোড়াসাঁকোর বাড়ির পিছনে রামভবনে ছোট ছোট ঘর। ক্লাসের রেজিস্টার অনুসারে যত ছাত্র-ছাত্রী একঘরে বসে পাঠ নেবার কথা, তার অর্ধেকেরও সে ঘরে বসবার জায়গা হবে না। দিনের বেলা ছাড়া রাত্রেও এম· এ· ক্লাস করা হয়। তাছাড়া বি· এ· ক্লাস হয়।

চার বছরে এখানে কী কী কাজ করা সম্ভব হয়েছিল তার ফর্দ দেব না। কয়েকটি বিষয়ের কথা কেবল উল্লেখ করছি। প্রথমেই মনে হল এত ছাত্র এখানে পড়াবার কথা চিন্তা করা হাস্যকর। চারুকলা বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগগুলি স্থানান্তরিত করা উচিত হবে। সরকারের এই প্রস্তাবে উৎসাহ ছিল। তখনকার শিক্ষাসচিব আমাকে নতুন জায়গা দেখাতে নিয়ে গেলেন। দুটি জায়গার কথা ভেবে দেখা হয়েছিল। একটি শহরের মধ্যে বালিগঞ্জ পাড়ায়। পাড়া যতই ভাল হোক, এখানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার অসুবিধা ছিল। তার চেয়ে বি টি রোডের ধারে এমারেল্ড বাওয়ার (মরকতকুঞ্জ) আমার পছন্দ হয়েছিল। অনেকটা জায়গা। এমারেল্ড বাওয়ার বাড়িটি মেরামত করে গ্রন্থাগারের কাজে লাগাব চিন্তা করেছিলাম। জোড়াসাঁকো থেকে বেশি দূরে নয়। অনেক জায়গা নিয়ে বড় ক্যাম্পাস তৈরি করা যাবে মনে হয়েছিল। মরকতকুঞ্জের একটি দোতলা বড় বাড়ি খুব জীর্ণ, কিন্তু সারিয়ে নিলে ব্যবহারের অযোগ্য হবে না। চওড়া সিঁড়ি এবং দোতলায় বড় হল, বোধহয় একসময় নাচঘর হিসাবেও ব্যবহার হয়েছে। হলটিকে সহজেই রিডিং রুম করা যায়। গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্য দোতলা এবং একতলায় অনেক ঘর। ভাল করে সংস্কার করা হলে এটিকে একটি আদর্শ গ্রন্থাগার-বাড়িতে পরিণত করা যেত। আমার সময় এ জিনিস হয়নি। সরকারের হয়তো ইচ্ছার অভাব ছিল না, কিন্তু অর্থের অভাব ছিল। সঙ্গীত, চিত্রকলা, অভিনয় প্রভৃতি বিভাগ ছাড়া অন্য সব বিভাগ মরকতকুঞ্জে সরিয়ে নেওয়া হল। অধ্যাপকরা কেউ কেউ খুব আপত্তি করেছিলেন। একজন প্রবীণ অধ্যাপক বলেছিলেন, তাঁদের আসা যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। এরকম সংবাদও ছিল যে, ছাত্রদের দিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হবে। শেষ পর্যন্ত সেরকম কিছু হল না। স্থানান্তর করতে যতদিন লাগবে মনে করেছিলাম তার আগেই কাজ শেষ হয়ে গেল। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো কর্মী এবং অধ্যাপক আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। প্রধান গ্রন্থাগারটি মরকতকুঞ্জে নিয়ে যাওয়া হল এবং চারুকলার

ছাত্রদের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য একটি ছোট গ্রন্থাগার জোড়াসাঁকোয় গড়ে তোলা হল। জোড়াসাঁকোর অধ্যাপকদের সহায়তায় সঙ্গীতভবনে একটি ছোট স্টেজ তৈরি করা হয়েছিল যাতে সেই বিভাগের ছাত্ররা একসঙ্গে শব্দ ও আলোর প্রক্ষেপণ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সব ব্যবস্থা শিখতে পারে। নতুন অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা যোগ দেওয়াতে জোড়াসাঁকোর চেহারা ও কাজের অনেক পরিবর্তন হল। সেদিন দেখা গেল যে, জোড়াসাঁকোর বাড়ির পিছনদিকে, যাকে রামভবন বলা হয়, সরকার সেই অংশ খালি করে দিয়েছে। এই অংশে অনেক পুরনো কর্মচারী সপরিবারে অনেক কাল ধরে বসবাস করতেন। কয়েকজন এবং তাঁদের পূর্বপুরুষ ঠাকুর পরিবারের আশ্রিত ছিলেন ; কিন্তু সবাই নয়। শেষের দিকে জোড়াসাঁকোর বাড়ির এক অংশ খালি করে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিভাগ খুলেছিলাম। সেও খুব সহজে হয়নি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখবার কোনো ভাল ব্যবস্থা থাকবে না এটা আমার বরাবরই খারাপ লাগত। এর ফল এখন হয়তো বোঝা যেতে শুরু করেছে। খুব আশ্চর্য যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখবার জন্য কোনো আলাদা বিভাগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গান শিখতে হত আর পাঁচরকম গানের সঙ্গে। নতুন বিভাগ যখন খোলা হল, তখন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। কয়েকজন অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা কাজে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রভারতীতে বোধহয় এই আমার শেষ কাজ। তবে আমি আসবার সময় এঞ্জিনিয়ারদের কিছু কাজ বাকি ছিল।

জোড়াসাঁকোর বাড়ি সংস্কার করার সময় চোখে পড়ল যে, ঠাকুরবাড়িতে কয়েকটি পুরনো বড় আকারের ছবি পড়ে আছে। ইউরোপীয় চিত্রকরদের আঁকা। ছবির সংখ্যা নেহাত কম নয়, কিন্তু এত বেশিও নয় যে, গ্যালারি সাজানো যেতে পারে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কন বিভাগ আছে সেখানে একটি ভাল ছবির গ্যালারিও হওয়া উচিত, এই মনে করে ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণ অংশ যেখানে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকতেন সেই অংশের পুনর্গঠন করা হল। গ্যালারি একদিন তৈরি হবে এই আশায় আমি প্রথম থেকে কিছু কিছু ছবি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করি। এই কথা আমি আগেও বলেছি। সৌভাগ্যক্রমে অবনীন্দ্রনাথের পরিবার থেকে অনেক ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। এর টাকা দেবার সঙ্গতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দাক্ষিণ্যে ও সাহায্যে এই কাজ সম্ভব হয়েছিল। আমি যখন চলে এলাম তখনও গ্যালারি ঘরের দেওয়াল ভাল করে শুকোয়নি এবং ছবি বাঁধানো আরম্ভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত কী রকম হল সে দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে দেখতে আমন্ত্রণ করেনি!

আর একটি কথা বলার আছে। ঠাকুরবাড়ি যে অবস্থায় ছিল সেটা সরকারের পক্ষে কলঙ্কের কথা। পঁচিশে বৈশাখের উৎসব কিংবা বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠানে সে অগৌরব ঢাকা পড়ে না। আর কিছুদিন অনাদরে থাকলে মহর্ষিভবনের অবস্থা দেশের অসংখ্য পতনোন্মুখ জমিদার বাড়ির মতো হয়ে দাঁড়াত। জোড়াসাঁকোর বাড়ির সংস্কারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে

সাহায্য করে দেশকে অপরিসীম গ্লানির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যত কাজ আমার করার দরকার ছিল, সব কাজ তো আমি শেষ করে আসতে পারিনি। কোনো কোনো বিভাগের শিক্ষকরা আমার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁদের জন্য আমার কোনো ক্ষোভ নেই। ভারতবর্ষের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ভাগ্য যে, শিক্ষকরা লেখাপড়ায় যত ব্যস্ত থাকেন, তার চেয়েও ব্যস্ত থাকেন অন্য অনেক কাজে, যার সঙ্গে বীণাপাণির কোনো সম্পর্ক থাকে না। অধ্যাপকরা ছাত্রনেতা হতে চাইলে তাতে কোনো পক্ষেরই উপকার হয় না। ছাত্রদের বিনোদনের জন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকার অভাব হয় না। কিন্তু তাদের পানীয় জল, সুলভ খাদ্যের ব্যবস্থা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা অর্থাভাবে সম্ভব হয় না। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের ভাবতে হয় তাঁদের কাজে কোনো মন্ত্রী কিংবা সরকার রুষ্ট হবেন কি না। এই অবস্থা দেশের শিক্ষার পক্ষে মঙ্গলকর নয়।

১৯৭৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চার বছর কার্যকাল শেষ হয়ে গেল। তারপরে এশিয়াটিক সোসাইটির ভার এসেছে। সে কথা বলবার সময় হয়নি। বিশ্বভারতীতে যখন ছিলাম, তখন কলকাতা থেকে আমার এক বন্ধু লিখেছিলেন, পরিণত বয়সে তোমার নানারকম অভিজ্ঞতা হচ্ছে। এই বয়সে এই অভিজ্ঞতা তোমার কোন্ কাজে লাগবে ? অভিজ্ঞতা নিজের জন্য। অভিজ্ঞতার ফলে অনেক জিনিস হয়তো বোঝা যায় কিন্তু অভিজ্ঞতা সবসময় কাজে লাগানো যায় না।

আর কিছু কি বলবার আছে ! রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রসঙ্গে বলেছেন 'দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ'। দীর্ঘজীবনে অসুবিধাই বেশি, সুবিধাও দু'একটি আছে। অনেকদিন শিক্ষকতা করেছি। খুব কাছে থেকে দেখেছি ভিন্ন প্রজন্মের ছাত্রদের কী কী পরিবর্তন হয়েছে। একশ'র মধ্যে 'ভালর সংখ্যা সাতান্ন', একথা হয়তো বলতে পারব না। কিন্তু একথা ঠিক যে, ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের যা প্রাপ্য সবসময় তা পায় না। এর জন্য কাকে দোষী করব ? স্রোতের জলে গা ভাসিয়ে থাকা চিরকালই নিরাপদ। কিন্তু যাঁরা শিক্ষকতা ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মন সহজে বদলানো যায় না। সব চেষ্টার ফল পাব এমন আশা করা উচিত হবে না। চেষ্টা করলেই যে ফল পাওয়া যায় তাও নয়। তবে কিছু কিছু ফল হয়তো ফলে। তাহলেও বিশ্বাস রাখতে হয় 'ওরে মন হবেই হবে'। এছাড়া এই দীর্ঘ জীবনে এমন কী শিখেছি যা বলতে পারি ?

এখন শেষ দাঁড়ি টানবার সময় হয়েছে। তার আগে দু'একটি ব্যক্তিগত কথা বলব। ডাচেসের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি পঁচিশ বছর নেই। আমার মেয়ে ঈশানীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে আমি বিশ্বভারতীতে থাকার সময়, সোমশঙ্কর ধরের সঙ্গে। তার অল্পদিন পরে আমি বিশ্বভারতী থেকে অবসর গ্রহণ করি। কয়েক দিন পরে অভিজিতেরও বিয়ে হল। আমার পুত্রবধূ অ্যানথিয়া বিদেশিনী। ভারতবর্ষের বাইরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সে এবং আমার পুত্র অধ্যাপনা করে। বিয়ের আগে তার কাছ থেকে এই রকম একটা চিঠি পেলাম—আমরা বিয়ে

করব ঠিক করেছি। এ বিষয়ে আপনি কি কিছু বলবেন ? আমি লিখেছিলাম, আমার অভিমতের কথা উঠছে না। তবে আমার দুটি প্রশ্ন আছে। আমি প্রকৃত ইংরেজি রান্না ভালবাসি। তুমি কি ভাল রাঁধতে জানো ? দ্বিতীয় প্রশ্ন, তোমার কি বই ছাপাবার কোনো অভিজ্ঞতা আছে ? আমার বইয়ের পাণ্ডুলিপি যদি তোমাকে পাঁঠিয়ে দিই, তুমি কি তার প্রেসকপি করে দিতে পারবে ? ভাবী বৌমা উত্তর দিয়েছিলেন, যদি কোনো প্রেসকপি তৈরি করবার থাকে, তাহলে আমাকে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেবেন। দেখবেন কীরকম ভাল প্রেসকপি তৈরি হয়। আর রান্নার কথা ? নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করতে নেই। অভিজিতকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। অভিজিতকে জিজ্ঞাসা করতে হয়নি। পরীক্ষা করে নিজেই প্রমাণ পেয়েছি।

ভাইয়েদের মধ্যে আমরা এখন দু'জন আছি। দু'জন নেই—অমল আর তাপস। আর বোন সতী, সে অনেক দিন নেই। তার মৃত্যু আমার জীবনে প্রথম বড় শোক। কখনও কখনও মনে হয়, অমল থাকলে আমার জীবন বোধহয় একটু অন্যরকম হত। এখন তো একা থাকি। অসুখবিসুখ না হলে এমন কী অসুবিধা ! খোঁজখবর নেবার লোকের তো অভাব নেই। আমার বন্ধুপুত্র সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর গৃহিণী রিক্তা তো আছেনই। তাছাড়া মানব সিংহ ও সুধীর দাস আমার উপর তাঁদের অধিকার ছেড়ে দেবেন মনে হয় না। তাছাড়া আরও অনেকে খুব নিকট। তাঁদের আমি পড়াইনি কিন্তু তবু তাঁদের কাছে আমি 'মাস্টারমশাই'।

বই শেষ করবার আগে ডাচেসের কথা আবার একবার মনে পড়ছে। তিনি তো এ বই দেখে যেতে পারেননি। যদি পাণ্ডুলিপি দেখতেন, তাহলে কী বলতেন কল্পনা করতে ইচ্ছে হয়। মনে মনে খুশি হতেন, কিন্তু সেকথা প্রকাশ করতে চাইতেন না। বলতেন, 'আমাকে নিয়ে এত কী লিখবার দরকার ছিল ? তুমি যে কী করো !'